যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

জন্ম ; ছাত্র-জীবন

১ ২ জুলাই ১৮৪৫ তারিখে রাণাঘাট সবডিবিসনের অন্তর্গত শিমহাট গ্রামে মাতামহের আলয়ে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি আত্মজীবনীতে* লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"আমার মাতামহ শিমহাট নিবাসী মহাকুলীন ৺ভবানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাপসপ্রকৃতি ছিলেন। মা জগদম্বা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ যৌবনেই এ পাপ সংসার হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমার মাতামহী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন, স্থতরাং পতিশোকে অতিশয় কাতরা হইয়া একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যাটি পরলোকগতা হইলে শোকবিহ্বলা হইয়া নিরন্তর অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। মা আমার সেই শোকবিহ্বলা জননীর একমাত্র শান্তিস্থল হইয়াছিলেন। সেই প্রাণসম কন্যাগর্ভে যখন আমার জন্ম হইল—তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে আমি প্রথম কুমার বলিয়া আমার জন্মে আমার পিতৃকুলে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আমার পিতা ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত স্থবর্ণপুর গ্রামের এক জন সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার পিতামহ ৺রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারি পুত্র—গিরিশচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা বিষয়কর্ম্ম করিতেন—কিন্তু আমার

---

* অধ্যাপক শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত অংশ আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

পিতা সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সাধুচরিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিয়া কেহ যাইতে দেন নাই। তিনি গৃহের তত্ত্বাবধান করিয়া যে সময় পাইতেন—তাহা জপতপেই ব্যয় করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা এত দূর প্রবল ছিল যে লোকে তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দেখিত। পিতার সেই দেবমূর্ত্তি আমার হৃদয়-ফলকে চিরদিনের মত অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্রগৌরবে আমি আজও আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যব্রত অনুকরণ করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি। শৈশব হইতেই অলৌকিক কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। যখন কোন অলৌকিক কার্য্য করিবার উদ্যম করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইতাম, তখন নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম— 'হে ভগবন্! তোমার ভক্তকে তুমি কেন এরূপ ছলনা করিতেছ?' ইত্যাদি।

পঞ্চম বৎসর উপনীত হইলে, যথারীতি আমার হাতে খড়ি হইল। আমাদের সুবর্ণপুরের বাটীতে এক পাঠশালা ছিল। শ্রীশ্রীনাথ সরকার সেই পাঠশালার গুরু মহাশয় ছিলেন। তাঁহার তীব্র শাসনাধীনে আমি তিন বৎসর কাল সেই পাঠশালায় অধ্যয়ন করি।

আমার জ্যেষ্ঠতাত পূজ্যপাদ ৺গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বরিশালের সদরআলার সেরেস্তাদার ছিলেন। অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার সহিত বরিশালে গমন করি। অতি দূরদেশে যাইতে আমার মন কাতর হয় নাই, কারণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য শৈশব হইতেই আমার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা জন্মে। তথায় জেলাস্কুলের নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

এক দিন আমাদের বাসায় গায়কমুখে ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার মনে হরিভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অষ্টমবর্ষীয় বালক নির্ভয়চিত্তে এক মহানিশায় প্রবেশ করিয়া একটি বটমূলে বসিয়া হরিধ্যান করিতে লাগিল।...পরে বাটীর লোক অন্বেষণ করিয়া আমাকে বিশেষ-রূপে তিরস্কার করিয়া ধরিয়া গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু আমার সে নেশা জীবনে আর ছুটিল না। সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবার ঝোঁক আমার অদ্যাপিও যায় নাই।"

বরিশালে কঠিন আমাশয় রোগে গুরুতর পীড়িত হওয়ায় যোগেন্দ্রনাথকে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। বারাসতে এক জ্ঞাতি খুড়ার বাসায় থাকিয়া তিনি পুনরায় পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। পরে মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীরসিকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতার বাসায় আসিয়া লং সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রকাশ :—

"সেই সময়ে আমাদের বাসায় রসিকলাল মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ছাত্র থাকিতেন ও সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন। এক দিন তিনি রঘুবংশের 'অজবিলাপ' পড়িতেছিলেন। আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই কিন্তু সেই অমৃত-ভাষিত—সেই সুললিত বিয়োগিনী ছন্দ আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। সেই দিন হইতে সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা আমার অতিশয় প্রবল হইল। আমি ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতে লঙ্‌ সাহেবের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে সংস্কৃত কালেজের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। সে ১৮৫৮ সালের জুন মাস—সিপাহী-বিদ্রোহের বৎসর। তখন সংস্কৃত কালেজ মন্দিরে ভলন্টিয়ার সেনা থাকিত। সুতরাং সংস্কৃত

কালেজ তথা হইতে উঠিয়া বহুবাজার নেড়া গির্জ্জার নিকটে একটি দ্বিতল অট্টালিকায় বসিত। পরম আরাধ্য সর্ব্বজনপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক [অধ্যক্ষ ?] ছিলেন। পাঠনায় প্রগাঢ় অভিনিবিষ্ট ও শান্ত শিষ্ট বলিয়া তিনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজ্যপাদ ৺নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু মহাশয়ের নিকট আমি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করি। তিনি আমার অধ্যবসায়ে এত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে আমাকে আমাদের ক্লাসে মনিটার নিযুক্ত করিলেন। তিনি বেত্রাসনে সমাসীন থাকিতেন—আমি তাঁহার সাক্ষাতে সহাধ্যায়িগণকে পড়াইতাম। সংস্কৃত কালেজের নিম্নশ্রেণীতে তৎকালে বিদ্যাসাগর-প্রণীত উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ পাঠ্য ছিল। ঐ দুই পুস্তক ও বাঙ্গলা চরিতাবলী আমি পড়াইতাম। অধ্যাপক মহাশয় আমার পাঠনায় সবিশেষ প্রীত হইতেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে আমি পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পাইতাম, প্রত্যেক শ্রেণীতেই আমি ডবল প্রমোশন পাইয়া ১৮৬২ সালের জুন মাসে অলঙ্কার ক্লাসে উন্নীত হইলাম। তখন বিখ্যাতনামা কাউয়েল সাহেব প্রিন্‌সিপাল ও পরমারাধ্য পণ্ডিতপ্রবর ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।”

যোগেন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স (২য় বিভাগ), ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ (১ম বিভাগ), ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ (২য় বিভাগ) ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিবাহ

১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৬৩) ছাত্রাবস্থায় যোগেন্দ্রনাথ খড়দহ কুলীনপাড়া-নিবাসী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কৈলাসকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮৬৭ ?) বিপত্নীক হইলে তিনি একটি বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'আত্মচরিতে' এই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা এক বিধবা-বিবাহ দিলাম, তাহার ইতিবৃত্ত এই ;—ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কৃষ্ণনগর-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী একটি যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা ও একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) ঐ মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটির প্রশংসা সর্ব্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটির ভাই তাহার আবার বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম আমার আলাপী কি কোনও ছেলে পাওয়া যায় না, যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ বার দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম—

"যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দশ বার দিন হলো তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটি আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে করবে ত, তাতে আমার মত নেই; তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" যোগেন্দ্র সেদিন বিষণ্ণ অন্তরে ঘরে গেলেন। দুদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবা-বিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্ষ্মী পরস্পরের সহিত পরিচিত হইলেন; এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন। মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎসর হইবে। আমাদের অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে জানিতেন, এবং যত দূর স্মরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রায় দুই তিন জন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যত দূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। (পৃ. ১১৩-১৫)

পরীক্ষার [এল-এ] সময় আসিল……তখন ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষা হইত। বোধ হয় জানুয়ারীর [১৮৬৯ ?] শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমরা মহালক্ষ্মীর পীড়া লইয়া ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা পীড়া হইয়া মহালক্ষ্মী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। তাঁহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন ও ভালবাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিদিন দেখিতে আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাধ্যে যত দূর হয় তাহা করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে কয়েক দিনের পর মহালক্ষ্মীর প্রাণ গেল।" (পৃ. ১২৭)

ইহার কিছু দিন পরেই—খুব সম্ভব ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নির্দ্দেশক্রমে যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কনিষ্ঠা কন্যা মালতীমালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই গর্ভে যোগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণের মধ্যে রিপন কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। যোগেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা—সুধাময়ী দেবী গোয়াড়ী-নিবাসী উকীল শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিত হন। সুধাময়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন—সার্ আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

চাকুরী

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যোগেন্দ্রনাথ কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া…সংস্কৃত কালেজের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইলে তিনি আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করেন।"—'বীরপূজা'।

ইহার পর যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও নিযুক্ত ছিলেন, তাহা অগ্রহায়ণ ১২৮৩ সংখ্যা 'আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যোগেন্দ্রনাথ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন বলিয়া সরকারী চাকুরীতে তাঁহার যোগ্যতানুরূপ উন্নতি হইতে পারে নাই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের *History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal* পুস্তক হইতে তাঁহার রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল :—

হুগলী	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	(অস্থায়ী)	১৫ নবেম্বর ১৮৮০
যশোহর	ঐ	ঐ	২০ মে ১৮৮২
ময়মনসিংহ	ঐ	ঐ	২৯ অক্টোবর ১৮৮৩
দিনাজপুর	ঐ	ঐ	১৭ জুন ১৮৮৬
পাবনা	ঐ	ঐ	৯ জানুয়ারি ১৮৮৯

পাবনা	ডে. ম্যা. ও ডে. ক. (৭ম শ্রেণী)	১৯ জানুয়ারি ১৮৮৯
ঐ	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৯ আগষ্ট ১৮৯০
জলপাইগুড়ি	ঐ	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯১
ঐ	ঐ ৫ম শ্রেণী (অস্থায়ী)	৪ মার্চ ১৮৯৩
গাইবান্ধা, রংপুর	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৩ নবেম্বর ১৮৯৩
রংপুর	ঐ	১২ জুন ১৮৯৪
ঐ	ঐ (৫ম শ্রেণী)	৩ জুলাই ১৮৯৪
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ	৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ হইতে ২মাস ২২ দিন
নদীয়া	ঐ	৩০ নবেম্বর ১৮৯৫
ফরিদপুর	ঐ	২৮ অক্টোবর ১৮৯৬
	(প্রিভিলেজ লীভ :	১৫ আগষ্ট ১৮৯৯ হইতে ৩ মাস)
	ঐ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পরিণত	১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯
যশোহর	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	২৩ নবেম্বর ১৮৯৯
ঐ	ঐ ৫ম শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৩ নবেম্বর ১৯০০
ঐ	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০১
মেদিনীপুর	ঐ	৫ জুন ১৯০২
দ্বারভাঙ্গা	ঐ	১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০২
	(ছুটি : ১৪ জুলাই ১৯০৩ হইতে এক বৎসর)	

সাহিত্য-সেবা

'আর্য্যদর্শন'।—১২৮১ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৪) মাসে যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনে 'আর্য্যদর্শন' নামে একখানি "মাসিক পত্র ও সমালোচন" প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :—

"আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিতেছি, ইহার নাম "আর্য্যদর্শন" রাখিলাম। জ্ঞান ও নীতির

চর্চ্চা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে উপদেশ আমোদ-সহকৃত হইয়া সকলের উপাদেয় হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইব। তন্নিমিত্ত লঘু ও গুরু বিষয়ের সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু আমোদ ও কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা নষ্ট হয়, এ কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাব্য কলা ও উপাখ্যানের জন্যও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে২ নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্ত্তব্যের বিষয় কীর্ত্তন হইবেক, এবং এই উভয়ের সহিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক।

কিন্তু আমরা জানি যে, নিজের ভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা যেরূপ প্রবল, অন্যের মনের কথা শুনিবার ইচ্ছা সচরাচর সেরূপ প্রবল দেখা যায় না। অনেক সময়ে মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা অনিবার্য্য ও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তথাপি বিবেচনা করা উচিত, যে যখন আমরা কোন সুহৃদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করি, তিনি স্থির ভাবে কখন২ সকৌতুক মনেও উহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কেবল প্রণয়ের অনুরোধে নয়। তিনি প্রত্যাশা করেন আমরাও তাঁহার নিজের কথায় তাদৃশ মনোযোগ ও কৌতূহল প্রদর্শন করিব। এইরূপ বাধ্য-বাধকতা থাকাতে আমরা স্বজনের নিকট তাদৃশ সাবধান না হইয়া বরং সময়ে২ বিরক্তিকর হইয়াও পার পাইয়া থাকি।

কিন্তু যখন সমাজের নিকট কোন কথা বলিতে হইবে, তখন যত সম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত। সমাজ শ্রোতা, লেখক বক্তা,

কদাচ এ সম্বন্ধে বিপর্য্যয় ঘটিবেক না। সুতরাং সমাজের নিকট আমরা নিয়তই বাধ্য থাকিব। সমাজ এ হিসাবে আমাদের নিকট কখনই বাধ্য হইবেন না। লেখকের নিকট সমাজের অন্তরূপে বাধ্যতা জন্মে; কিন্তু উহা কাল ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। অতএব আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া যাহাতে পাঠকগণের বিরক্তি বা পণ্ডশ্রম না হয়, তদ্বিষয়ে দায়ী হইতেছি। আমরা এরূপ অঙ্গীকার বা প্রত্যাশা করি না, যে আমাদের উক্তি নিয়তই আমোদকর হইবেক। কিন্তু আমাদের ভরসা এই, আমাদের রচনা, জ্ঞান ও নীতির অনুসরণ করিতে কখন বিমুখ হইবে না। আমরা বাক্যবিন্যাস বিষয়ে ডাক্তারী চিকিৎসার অনুকরণ করিব। আমাদের প্রবন্ধে নানা রস থাকিবে, ইহা কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন কষায় লাগিবে। সময়ে সময়ে মধুর ও সুরভিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা পর্য্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর পথ্য প্রদানে কখন সেকেলে বৈদ্যের ন্যায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী, তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষ সমর্থন বা খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের কার্য্য সমাজকে স্পর্শ করিবে তখন মূকভাব অবলম্বন করিব না। কোন রাজপুরুষের কুৎসা বা গুণানুবাদ কিম্বা রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় চলিত বিষয়ের সমালোচন এ পত্রে স্থান পাইবেক না। কিন্তু রাজনীতির উন্নতি বা অঙ্গহীনতার বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার ন্যায় বর্ত্তমান দৃষ্টান্তও বিবৃত হইবে। কোন সহযোগীর সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, সবিনয়ে, অকপটে ও স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।”

'আর্য্যদর্শন' একখানি সুপরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র ছিল। ইহা একাদশ বর্ষ (১২৯২ সাল) চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ৫ম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ষষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্ণাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত হইলে, সম্ভবতঃ ইহার প্রকাশ এক বৎসর বন্ধ ছিল।

গ্রন্থাবলী।—'আর্য্যদর্শনে' যোগেন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা মুদ্রিত হয়, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থ-সমালোচনা।** সংবৎ ১৯২৮ (২২ অক্টোবর ১৮৭১)। পৃ. ৭৬।

২। **জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত।** ১২৮৪ সাল (১ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ১৮৭।

১২৮১-৮২ সালের 'আর্য্যদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত।

৩। **ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত** (আত্মজীবনবৃত্ত অবলম্বনে)। চৈত্র ১২৮৬ (ইং ১৮৮০)। পৃ. ২৩৯।

ইহা প্রথমে "জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনী ও নব্য ইতালী" নামে 'আর্য্যদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১২৮২, ভাদ্র, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ; ১২৮৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, আশ্বিন, চৈত্র; ১২৮৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৪। **হৃদয়োচ্ছ্বাস** বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি। ১২ মাঘ ১২৮৭ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ১৪৯।

'আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি; প্রবন্ধগুলি :—স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ, আধুনিক ভারত, অতীত ও বর্তমান ভারত, বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও তাহার উপকারিতা, সামাজিক নির্যাতন, ভারতের ভাবী পরিণাম, ভারতে দুর্ভিক্ষ, মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ, ভারত সভা।

৬। **আত্মোৎসর্গ** বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা। ইং ১৮৮৩। পৃ. ১২২।

'আত্মোৎসর্গ' কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাঠ্য পুস্তকরূপে 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' নামে স্বতন্ত্র ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। "প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালায় মহাদেব ও খৃষ্ট ভিন্ন আত্মোৎসর্গের আর সমস্ত মহাত্মারই নাম সঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বিশ্বামিত্র। ২। শাক্যসিংহ। ৩। গুরুগোবিন্দ।
৪। চৈতন্য। ৫। ওয়ালেস। ৬। টেল। ৭। হ্যামডেন।
৮। উইলবারফোর্স। ৯। হাউয়ার্ড। ১০। রোমিলী।
১১। গ্যারিবল্ডী। ১২। ম্যাট্‌সিনি। ১৩। ওয়াসিংটন।

চুঁচুড়া। ৩০ আশ্বিন ১৮৮৩।"—বিজ্ঞাপন।

৭। **সমালোচনা-মালা।** (আর্য্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত ও পরিশোধিত।) ভাদ্র ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ১৯৮।

বিষয়-সূচী :—বিষবৃক্ষ, ভারত-সভা, সুরেন্দ্রনাথের জীবনী, সম্বন্ধ-নির্ণয়, পলাশীর যুদ্ধ, ভারত-উদ্ধার, রাজভক্তি ও রাজোপহার, সমাজ-চিন্তা, অভিনয়-সমালোচনা।

৮। **ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।** অক্টোবর ১৮৮৬। পৃ. ১৫৩।

"আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল বীরচূড়ামণি ওয়ালেস্। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী যেমন আজীবন এক স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতে

জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, ওয়ালেস্‌ও সেইরূপ আশৈশব কেবল একই চিন্তায় ও একই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"—মুখবন্ধ।

৯। **প্রাণোচ্ছ্বাস** বা বিবিধ বিষয়ক কবিতামালা। ১২৯৫ সাল (২৫ মার্চ ১৮৮৯)। পৃ. ৯২।

"বিশ্বপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তিই, কবিত্বের অনন্ত উৎস।...সেই প্রেম ও ভক্তিতে যখন আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, বা সংসারের ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে যখন আমার চিত্ত আলোড়িত হইয়াছে, তখনই আমি এই কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি এই জন্যই এই কবিতামালার নাম 'প্রাণোচ্ছ্বাস' রাখিলাম।...ছন্দোময়ী রচনাতে আমার এই প্রথম উদ্যম।"—মুখবন্ধ।

১০। **শান্তি-পাগল** বা গদ্য-পদ্যময়-ভগবদ্বিষয়ক স্তোত্রমালা। জ্যৈষ্ঠ, ১৮১১ শক (১৯ জুন ১৮৮৯)। পৃ. ৬৮।

১১। **কীর্ত্তি-মন্দির** বা রাজপুত-বীর-কীর্ত্তি। ১২৯৬ সাল (২০ অক্টোবর ১৮৮৯)। পৃ. ২৬২।

টডের রাজস্থান অবলম্বন করিয়া "বাপ্পারাউল্ হইতে অমরসিংহ পর্য্যন্ত মিবারের স্বাধীন রাণাগণের জীবনী মাত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

১২। **গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত**। ১৮১১ শকাব্দা (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০)। পৃ. ৪০৫।

১৩। **"নিষ্কৃতি-লাভ-প্রয়াস" বিফল**। অগ্রহায়ণ ১২৯৬ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০)। পৃ. ৪৪।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' পুস্তকের প্রতিবাদে লিখিত।

১৪। **চিন্তাতরঙ্গিণী**। ১২৯৬ সাল (১৫ মার্চ ১৮৯০)। পৃ. ১৫৬।

স্বচী :—আহ্বান, হিন্দুসমাজসংশয়, স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী, নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধর্ম্ম, বর্ণভেদ, ভারতের জাতীয় ভাষা, অভিযান ও সারস্বত উৎসব, জাতীয় সংস্থান, জাতীয় বিদ্বেষ, জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ, বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

১৫। **প্রহ্লাদ** [উপন্যাসচ্ছলে ধর্ম্মপ্রচার]। ১৩০১ সাল (২০ ডিসেম্বর ১৮৯৪)। পৃ. ৩০।

১৬। **বীরপূজা** (১)। ১০ মার্চ ১৯০০। পৃ. ১১।

স্বচী :—রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু। (১৩০৬ সালের পৌষ-সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রথম প্রকাশিত)।

১৭। **বীরপূজা** (২)। ২২ মে ১৯০০। পৃ. ৪৬।

স্বচী :—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত; প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; কেশবচন্দ্র সেন। (১৩০৬ সালের মাঘ ও চৈত্র-সংখ্যা, ১২৯৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা, ও ১৩০৭ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রথম প্রকাশিত)।

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী। ১৩১৫ সাল (১৭ জুলাই ১৯০৮)। 'হিতবাদী' কার্য্যালয়।

স্বচী :—১। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত, ২। জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী, ৩। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, ৪। চিন্তা-তরঙ্গিণী, ৫। হৃদয়োচ্ছ্বাস, ৬। কীর্ত্তি-মন্দির, ৭। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, ৮। বীরপূজা—(২), ৯। বীরাঙ্গনা,—গ্যারিবল্ডী-পত্নী আনিটা, ১০। প্রাণোচ্ছ্বাস।

যোগেন্দ্রনাথ 'চৌকিদার-দর্পণ', 'আইনসংগ্রহ' প্রভৃতি কয়েকখানি [illegible] পুস্তক এবং 'নব ধারাপাত', 'শিক্ষাসোপান', 'শিশু-পাঠ', 'জ্ঞানসোপান' প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

১২ জুন ১৯০৪ তারিখে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে—১৩০৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময় এদেশে ও বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে ভারত-বাসীদের মধ্যে নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে থাকে। মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুরের চেষ্টায় বহুধাবিচ্ছিন্ন ইতালী একতাবদ্ধ এবং দীর্ঘ কালের পর দাসত্ব-মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবে ক্রীতদাস-মুক্তিকামীরা শেষ-পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হন। সুয়েজ-খাল উন্মুক্ত হওয়ায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঢেউ দ্রুততর বেগে ভারতবর্ষে পৌঁছিতে লাগিল। এই ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানও এই সময়ের ঘটনা। জাতীয় উন্নতি বা স্বাধীনতার ভিত্তি যে স্বাবলম্বন, ইহাই বিশেষ করিয়া হিন্দুমেলায় প্রচারিত হইতে থাকে। সপ্তম দশকের প্রারম্ভে দেশ-বিদেশের এই সব যুগান্তকারী ব্যাপার ভারতীয় যুবকবৃন্দের মনে

বিশেষভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁহারা এই সব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি শিক্ষায় নিজেদের দৈন্যদশা উপলব্ধি করিতে পারিলেন ও স্বজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের এই স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম সাহিত্যের মধ্য দিয়া গদ্যে পদ্যে, প্রবন্ধে নাটকে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচনাবলীর মধ্যে প্রধানতঃ এই স্বদেশ-প্রেমই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থরাজি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

'ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত' ঃ

যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালীই আবার যখন ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায়

জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অল্পায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্বপ্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিত-মালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত; সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন; যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী-শক্তিবলে দুই জন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।—মুখবন্ধ।

'হৃদয়োচ্ছাস' :

কিসের অভাবে ভারতের এ দুর্গতি? কিসের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা—একই উত্তর! স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্তা! **স্বদেশহিতব্রতে জীবনের পূর্ণ আহুতির** ভাবাভাব। ইহার অভাবে ভারতের এ দুর্গতি—ইহার ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি। যাও আমেরিকায় যাও, যাও শ্বেতদ্বীপে যাও, বীরভূমি ফ্রান্সে যাও, যাও জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও জার্ম্মণীতে যাও, যাও মৃতোত্থিত গ্রীসে যাও, যাও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, তাঁহাদিগের স্ব-স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটি কথা বল, দেখিবে,

অচিরাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! দেখিবে, বাল হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, অধিক কি, বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে! জলে, স্থলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে—যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, একমাত্র চিন্তার বিষয়। শয়নে স্বপ্নে, অশনে উপবেশনে, লেখনে কথনে,—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি চিন্তায় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত। সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত অনুর্ব্বর প্রদেশে, হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শিখরে, অসভ্য-দস্যু-সমাচ্ছন্ন মধ্য আসিয়ায়—একটি ইউরোপীয় যে যেখানে আছে, স্বদেশের ও স্বজাতির পরিরক্ষণীয়। একটি ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, একটি ইউরোপীয়ের প্রাণ নাশ কর; দেখিবে, তাহার জাতি ও তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাতলে দিবে—দেখিবে, সেই ক্রোধানলে তোমার জাতি, তোমার দেশ, চির-জীবনের জন্য স্বাধীনতা-হারা হইবে! এক অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধে মুসলমানেরা চির কালের মত ভারত হারাইল। এক মার্গের সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রহ্ম হুলস্থূল! এক সৈনিক-বধে আবিসিনিয়া সমাকুল! এক দূত-বধে আফগানিস্থান ওতপ্লুত! ("স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ")

বিংশতি কোটী ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের

সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন. এমন একটি উপলক্ষ চাই, এমন একটি স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দুমেলা নাম না দিয়া **ভারতমেলা** নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না। ("আধুনিক ভারত")

সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ এক্ষণে এক-প্রকার আংশিক জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে পারেন। অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ভারতের অনৈক্য থাকুক, ভারত এক্ষণে এক বিষয়ে মিলিতে শিখিতেছেন। ইংরাজ কৃত অত্যাচারের প্রতিবাদ-বিষয়ে সমস্ত ভারতের ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদান-সামগ্রী লইয়া ভারত-সভা ভারতবাসীদিগের অন্তরে এক আংশিক জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তেই এই উদ্দীপনাকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ভারত-সভার নেতৃবৃন্দের প্রতিভা এই সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় তাঁহারা এই উদ্দীপনা-

কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বৈদেশিক ভাষা। সুতরাং ভারতীয় জাতি-সাধারণ কখন সেই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইবেন না; এই জন্য একটি ভারতীয় সাধারণ ভাষা চাই। হিন্দী ভিন্ন আর কোন ভাষাই ভারতীয় ভাষা হইতে পারে না। কারণ হিন্দী ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। আর সকল ভাষা অপেক্ষা এই ভাষাই ভারতের অধিক লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি, বঙ্গদেশে তাঁহারা বঙ্গভাষায়, তদ্ভিন্ন ভারতের আর সকল স্থলে হিন্দীতে এই উদ্দীপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ, জাতীয় ভাষায় উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় জীবনের কোন সম্ভাবনা নাই। ("অতীত ও বর্ত্তমান ভারত")

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গল সাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী পরস্পরের প্রতি পরস্পর সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী একবাক্যে স্বাধীনতা-প্রিয় ব্রিটনের নিকটে আত্ম-দুঃখ ব্যক্ত করিতে শিখেন; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত—জননী ভারত-ভূমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ—১২ই শ্রাবণ বুধবার [২৬ জুলাই ১৮৭৬]* কলিকাতা-মহানগরী-স্থিত

* যোগেন্দ্রনাথ এই 'ভারত-সভা' বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

আল্‌বার্ট হলে **"ভারত-সভা"** নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন! এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল! পারলৌকিক ধর্ম্ম পৃথক্ হউক, জাতি পৃথক্ হউক, সমাজ পৃথক্ হউক, তথাপি এ ধর্ম্মের একতা পরিলক্ষিত হইবে। এ ধর্ম্মে হিন্দু, মুসলমান; বৌদ্ধ, জৈন; সেশ্বর, নিরীশ্বর; সাকার, নিরাকার; খ্রীষ্টান, হীদেন—সকলই সমান। সকলেই নির্ব্বিরোধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটিমাত্র নিয়ম আছে—দীক্ষিতদিগের প্রত্যেকেই ভারত-বাসী হওয়া চাই। ইহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি বিরাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহা সাম্য-বাদী। এই ধর্ম্মই ভারত-সভার মূলভিত্তি। এই জন্য ভারত-সভা সকলকেই ভ্রাতৃ-ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন, সীক্! আপনারা সকলেই আসিয়া, এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন, ভারতের সুখ-সূর্য্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে। বৎসরে বৎসরে ভারতের প্রতি গৃহে যেন এই দিন উপলক্ষে মহান্ উৎসব হয়। যেন এই দিনে হিমালয় হইতে সিংহল, এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশে ভারতের যশোগান করে! ("ভারতের ভাবী পরিণাম")

'আত্মোৎসর্গ' :

আমি নরকে যাই তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি যেন আমার শব সাধনার বলে নরক হইতে উত্থিত হয়। আমি স্বর্গে যাইতে না পারি, তাহাতেও আমার

দুঃখ নাই, কিন্তু আমি যেন অন্ততঃ মৃত্যুকালেও দেখিয়া যাই যে, আমার দেশ অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে, আমার জাতি দেবোচিত সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে।...আমি শয়নে স্বপনে দেখি যেন মা আমার আবার অনন্ত বলশালিনী হইয়াছেন। যেন দশ দিক্ আবার আলোকিত হইয়াছে! যেন আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া মা আমার নগরে নগরে দীপমালা পরিধান করিয়াছেন! এবার মা বিচ্ছিন্নাঙ্গ নহেন, এবার মা একচ্ছত্রী। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য—পুনর্জ্জীবিতা জননীর আরাধনা করিবার জন্য—সমস্ত সন্তান আজ একত্র মিলিত হইয়াছেন।—২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৩-৪।

'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' ঃ

স্বার্থপর কাপুরুষেরাই আত্ম-স্বার্থহানির ভয়ে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে 'অসম্ভব' বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদনুসরণ হইতে আপনারা নিবৃত্ত হয় ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা জানিয়াও জানে না যে, এ জগতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্‌ডী-প্রমুখ তদীয় শিষ্যবৃন্দ ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন ইতালীবাসীরাই ইহাদিগকে 'অসম্ভবপ্রলাপী' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। 'শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালী আবার এক সূত্রে গ্রথিত হইবে, বহুকালের দাসত্বে দাস-প্রকৃতি-প্রাপ্ত ইতালী আবার স্বাধীন হইবে' ইহা ভাবিতেও যেন সেই কাপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।......

'আজও যখন হইল না, তখন আর হইবার সম্ভাবনা কই ?'—যাঁহারা অতীত ঘটনা হইতে এই অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, গ্যারিবল্‌ডীর জীবনী তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল। সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধি হয় নাই—ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত যে 'সাধনা পূর্ণ হইলেও সিদ্ধি হইবে না' তাহা অপসিদ্ধান্ত মাত্র ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটি চেষ্টা বার বার নিষ্ফল হইতে পারে। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইবে—যখন ক্ষেত্র বীজধারণ-ক্ষম হইবে—তখন সে চেষ্টা সহজেই সফল হইবে—বীজ রোপণ করিবামাত্র তখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। সময় আসে নাই বলিয়া তুমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে সময় হয়ত কখনই আসিবে না। অন্ধের নিকট যেমন আলোক কত বার আসে ও তাহার নিকট হইতে কত বার চলিয়া যায়—কিন্তু চক্ষুহীন হওয়ায় সে যেমন তাহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ চেষ্টাহীন উদ্যম-শূন্য ব্যক্তির নিকটও সময় কত বার আসিতেছে ও তাহার নিকট হইতে কত বার যাইতেছে, সে তাহা দেখিয়াও দেখে না ; চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধের মত বসিয়া থাকে।

ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীন সময়-প্রত্যাশী পতিত ভারতবাসিন্! তোমাদের ন্যায় ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও এক দিন এইরূপ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও দুই জন মনীষীর করস্পর্শে তাঁহাদের এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ত্রিবর্ণ পতাকা সগর্ব্বে রোমের ক্যাপিটলের উপরি উড্ডীন হইতেছে। ঐ দেখ! আজ পতিত ইতালী কতিপয় মনীষীর তপস্যার ফলে, আবার উঠিয়াছে। কিন্তু পতিত ভারতের তপ নাই, জপ নাই, সাধনা নাই—তাই ইহা আজও পড়িয়া রহিয়াছে। রাবণ-বধের পূর্ব্বে

রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনিও ইতালীর একতা ও মুক্তির জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দৈববলের উপর জ্বলন্ত বিশ্বাসের ফলও তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও এক দিন হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে এক দিন সমস্ত ভারত উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। তাই সেই মহতী সাধনার বলে এক দিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের দিনে—যখন কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে আসিয়া আপনাদিগের প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া দেবগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কালে দৈব-বলে বলীয়ান্ হইয়া আর্য্যেরা এক এক জন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বল পাইয়াছিলেন। আমরা সে সব দিন ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দশা। এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটী ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে সেই দেবদেব ভগবানের নাম কীর্ত্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ পড়িলে কি না হইতে পারে? এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে!! সকলে গগন বিদারিয়া গাও **"বন্দে মাতরম্"—"বন্দে হরিচরণারবিন্দম্"**। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক!!! (পৃ. ১, ৩-৪)

'চিন্তাতরঙ্গিণী' :

...আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে আর কিছুই দিয়া যান নাই, কেবল অনন্ত-রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি ও অনন্ত-রত্ন-গর্ভ সংস্কৃত ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুইএর কর্ষণ ও মন্থনে আমাদের সমস্ত জাতীয় অভাব বিদূরিত হইবে।...কত কত গভীর চিন্তা সংস্কৃতভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়াছে, আমরা আজও তাহার সহস্রাংশও মাতৃভাষায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। পারি নাই তাহার কারণ মাতৃভাষার অনাদর। যিনি সে কার্য্যে ব্রতী হইবেন তিনিই অনাহারে মরিবেন। কারণ বাঙ্গালী আজও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। শুদ্ধ যে আমরা উচ্চ সাহিত্যের লেখকগণকে অনাহারে মারি তাহা নহে, আমরা অনেক সময় তাঁহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকি। যিনি বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে তাঁহার বড় অনাদর। বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে অবজ্ঞাসূচক উপাধি। যিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, ও ইংরাজীতে লিখেন, তাঁহার সমাজে অধিকতর সম্মান। যেন ভাবের কোন মাহাত্ম্য নাই, ভাষারই মাহাত্ম্য। যেন কোন মহান্ ভাব জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহার মাহাত্ম্য কমিয়া যায়! যেন কোন ভাব অধিক লোকে বুঝিলে ভাবপ্রকাশকের গৌরব কমিয়া যায়! যেন মনে মনে শঙ্কা পাছে দাস জাতির ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকেরা আমাদিগকে দাস বলিয়া ঘৃণা করিবে। কিন্তু দাস! কত কাল এরূপ ময়ূরপুচ্ছে নিজ কাকত্ব লুকাইবে? কত কাল পরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আপনাকে সুন্দর দেখাইতে চেষ্টা করিবে? যাহা তোমার নয়, কখন তোমার হইবে না

ও হইতেও পারে না, তাহার গর্ব্বে অভিভূত হইয়া নিজের কাপুরুষত্ব আর কত কাল দেখাইবে? তাই বলিতেছি আইস ভাই! আমরা আপন জিনিসকে আদর করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা অনাদর করিলে, জগৎ অনাদর করিবে, সে মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না করিলে আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নানা দেশ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া তাহাকে সাজাই। নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃতা মাতৃভাষার শিরোভূষণ করি।...ওহাবীরা ধর্ম্মার্থে প্রতি গৃহস্থ প্রতি দিন এক মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া দেয়। সেইরূপ আইস আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনার্থ প্রত্যেকে মুষ্টিপরিমিত চাউল সঞ্চিত করি। আইস আমরা এইরূপে সঞ্চিত চাউল বিক্রয় করিয়া প্রতি গৃহে একটি করিয়া পুস্তকালয় সংস্থাপিত করি। কেহ টের পাইবে না, অথচ অচিরকালমধ্যে প্রতি গৃহ অচিরাৎ পুস্তকরাশিতে পরিপূরিত হইবে।...যে বিধাতা ভারতের পূর্ব্বভাষাকে দেবভাষায় পরিণত করিয়াছেন, যে বিধাতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে আজও ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন, সে বিধাতা যে ভারতকে আর উঠিতে দিবেন না—তাহা কখন বোধ হয় না।—কখনই নহে। ভারত আবার উঠিবে—আবার জাতিগণনায় অগ্রণী হইবে—আবার সভ্যতালোকে জগৎ ঝলসিত করিবে—আবার তাহার জাতীয় ভাষা যুগপৎ অমৃতবর্ষণ ও বিদ্যুদুদ্গিরণ করিবে! সে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা হইবে কি না, তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত! ("ভারতের জাতীয় ভাষা")।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—"অধিকাংশ পুস্তক আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি, উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি। কয়েকখানি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি মালাকার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও সমাহরণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি।"..."কয়েক বৎসর ব্রজেন্দ্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াত-কলম হউক।"—'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৫০।

শনিবারের চিঠি—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে যে-সকল সাহিত্য-সাধক বাংলা-সাহিত্যের নির্মাণে গঠনে ও প্রসারে আত্মনিবেদন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে তাঁহাদের জীবনী ও রচনাবলীর তালিকা সঙ্কলন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের যে অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আজ সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রাহ্য হইয়াছে।...তাঁহার সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ভাণ্ডার দিনে দিনে পূর্ণ হইয়া বাংলা-সাহিত্যের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনার সুযোগ ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখককে দান করিতেছে।" (বৈশাখ ১৩৫৩)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩২

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৪—১৮৮৯

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক ১৩৫০ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫১
তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৪ ; চতুর্থ সংস্করণ কার্তিক ১৩৬৭
মূল্য ০·৫৬ ন. প.

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—১৫।১১।১৯৬০

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' পুস্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ভাষায় সংক্ষেপে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী বিবৃত করিতেছি ঃ—

কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। তিনি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম।...সে সময় গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন।...

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে, কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছু কালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কালেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার এক জন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।...

...বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিগে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলো বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।...

হুগলী কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এক দিন হেড মাষ্টর গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া

কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম, যে তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না, লেখা পড়া করার ভান করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন, যে তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন

রেল হয় নাই ; বৰ্দ্ধমান দূরদেশ। এই সম্বাদ যথাকালে তাঁহার কাছে পৌছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, যে ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক্ আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন, যে সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই, যে পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল ; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভাবলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটি সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া শুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইনকমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে

আড়াই শত টাকা বেতনের একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot"*··· পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবামাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন, যে ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বসিয়া

---

* *Bengal Ryots* their rights and liabilities পুস্তকখানি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—ব্র. না. ব।

প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ, ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে ; Hills *vs.* Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব, সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয় ; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না ; সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল ; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন ; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃদসংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দ-প্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃৎপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথনাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্‌বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে

তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটি গিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্‌সস্ হইল। এ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব Inspector General of Registrationএর উপরে অর্পিত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল ঠিক ঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন

না, তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যরচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের

স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রাতভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না।...

এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল, * আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার ।নকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ তাঁহারাও লিখিতে

---

* ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে 'ভ্রমর' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২) অর্থাৎ ১৫শ সংখ্যা পর্যন্ত 'ভ্রমর' বন্ধ হইয়া যায়।

অনেকে জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমরে'র "নূতন পর্য্যায় ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা" ও পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ," "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া "জাল প্রতাপচাঁদ," "পালামৌ", "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকেও যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রর। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল— শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন, বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এত দিন তাঁহার ভয়ে, সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম।

আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা ও চক্ষুলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি "মুণ্ডরিবাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।*

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

---

* সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় এই কয় খণ্ড 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় :—

৫ম খণ্ড	...	১২৮৪ সাল
৬ষ্ঠ খণ্ড	...	১২৮৫ সাল
৭ম খণ্ড	...	১২৮৭ সাল
৮ম খণ্ড	...	১২৮৮, বৈশাখ-আশ্বিন
৯ম খণ্ড	...	১২৮৯, বৈশাখ-চৈত্র

গ্রন্থাবলী

সঞ্জীবচন্দ্র বাংলায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **যাত্রা সমালোচনা** (প্রবন্ধ)। ১৮৭৫ (১০ জুলাই)। পৃ. ৩৬।

যাত্রা সমালোচনা। ("বঙ্গদর্শন" ও "ভ্রমর" হইতে উদ্ধৃত)। কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৫।

২। **রামেশ্বরের অদৃষ্ট** (উপন্যাস)। ১২৮৩ সাল (২০ জানুয়ারী ১৮৭৭)। পৃ. ৩১।

"ভ্রমর হইতে উদ্ধৃত।"

৩। **কণ্ঠমালা** (উপন্যাস)। (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)। পৃ. ১৮৪।

'কণ্ঠমালা'র ৩৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত 'ভ্রমরে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'কণ্ঠমালা'র "অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত" হয়। "কণ্ঠমালা 'মাধবীলতা'র পরিশিষ্ট।"

৪। **সৎকার** (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৮১। পৃ. ১২।

গ্রাম্য পাঠ নং ১ সৎকার। ভ্রমর পত্রিকা হইতে সংগৃহীত Printed by Radhanath Banerjee At the Bangadarsana press, Kantalpara for the proprietor. ১২৮৮। মূল্য এক আনা মাত্র।

৫। **বাল্যবিবাহ** (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৮২। পৃ. ১২।

গ্রাম্য পাঠ নং ২। বাল্যবিবাহ। ভ্রমর পত্রিকা হইতে সংগৃহীত। Calcutta. Printed and Published by Radda Nath Banerjee. Johnson Press. 1882.

ইহা প্রথমে নূতন পর্য্যায় 'ভ্রমরে'র ১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১২৮৫) প্রকাশিত হয়।

৬। **জাল প্রতাপচাঁদ**। ইং ১৮৮৩। পৃ. ১৩৮।

জাল প্রতাপচাঁদ। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। Calcutta : Published by Radhanath Banerjee for the Proprietor. 1883.

"আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্ত্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিষ বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটা কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেই জন্য আপাতত জাল রাজাকে উপলক্ষ করা গিয়াছে।

যাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।"···বিজ্ঞাপন

৭। **মাধবীলতা** (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (২০ এপ্রিল ১৮৮৫)। পৃ. ১৮৭।

মাধবীলতা। (কণ্ঠমালার পূর্ব্ব ভাগ) বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২ নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯১। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

৮। **দামিনী** (উপন্যাস); **পালামৌ** (ভ্রমণবৃত্তান্ত)।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়া অগ্রজের রচনার যে সঙ্কলন প্রকাশ করেন, তাহাতে 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ছাড়া এই দুইটি রচনাও স্থান পাইয়াছে।

"পালামৌ" ১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' "প্র. না. ব" এই ছদ্ম নামে ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সর্ব্বশেষ অংশ—কি কারণে বলিতে পারি না—'সঞ্জীবনী সুধা'য় বা বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পূর্ণ 'পালামৌ'-এর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা যে-পরিমাণ ছিল, কার্য্যতঃ তাহা সে-পরিমাণ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও 'আধুনিক সাহিত্যে' সঞ্জীব-চন্দ্রের প্রভিভার এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষে তাঁহার পক্ষে বলিয়াছেন ঃ—"সঞ্জীবচন্দ্র বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।"—'পালামৌ' হইতে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণপূর্ব্বক সঞ্জীবচন্দ্রের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহা এই—সঞ্জীবচন্দ্র সহজ স্বাভাবিক ও সর্ব্বজন-পরিচিত বিষয়ের মধ্য হইতে রসবস্তু সন্ধান করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়া তুলিতে পারিতেন। কোনও অভাবনীয় বা আকস্মিকের প্রতি তাঁহার মোহ ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সর্ব্বত্র আমরা এই সহজ রসের পরিচয় পাই। বাংলা-সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার দান যদি কিছু চিরকাল স্বীকৃত হয়, তাহা এই সহজ রসিকতা। তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলেই সঞ্জীবচন্দ্রর এই বৈশিষ্ট্য সকলের চোখে পড়িবে।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট :—

এই ঘোরনাদী সমুদ্রের অনন্ত বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর! এই বালুকাময় উপকূলারূঢ় নারিকেল বৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায়, কোদালী হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে বিশ বৎসর! এই সাগর প্রান্তব্যাপী ফেণবিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দ তুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বৎসর! স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, 'মরিব'—মরিতে পারিল না—বিশ বৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি, 'এই করিব,' আর এক জন মনে করেন আর। আমাদিগের কার্য্য, দৃষ্ট; তাঁহার কার্য্য, **অদৃষ্ট**! (পৃ. ৪১)

কণ্ঠমালা :—

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিদল প্রাতে ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে বসিয়া কত কথা বলে, কত কলহ করে, কত বার উড়ে, কত বার বসে, কত পুষ্প ঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি; প্রজাপতিগুলি উড়িতেছে; কখন শূন্যে উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটি ছুটিতেছে, প্রথমটি আবার পলাইতেছে; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। বড় বড় তরুসকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে জন্মিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, কত বার তুলিয়াছে, একবারও সরে নাই; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী উচ্চাকাশে উঠিয়া তিলবৎ আকা র ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। ভালবাসি সত্য,

কিন্তু কেবল এই সকল দেখিবার নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে চাহি? কদাচ নহে। সকল সময় ত এ সমস্ত ভাল লাগে না। যখনই ভাবি, ঐ বৃহৎ পক্ষী সমস্ত দিন কেবল আহারের নিমিত্ত এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উড়িতেছে, অমনি আমার রাগ হয়। এই যে সুন্দর প্রজাপতি সর্ব্বদা উড়িতেছে, ইহারও আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল আহার খুঁজিতেছে, মরণপর্য্যন্ত কেবল আহারই খুঁজিবে! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! ইহারা কেবল আহারের নিমিত্ত জন্মিয়াছে। (পৃ. ৪৯)

জাল প্রতাপচাঁদ :—

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে, সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যারা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্‌মায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়। সেই জন্য তাহারা সংকল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্‌মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। "বদমায়েসের" সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন

না। তাহার পর, যখন তাহারা অভীষ্ট স্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানী তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্টি কথা বলিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনাটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে, বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন; তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, "আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।"

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের

প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লিতে একটী সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি। (পৃ. ১৩৬-৩৮)

মাধবীলতা :—

একদা সিংহশত গ্রামে একজন ধনবান রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই, কেবল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দুই একটী ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ—প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টকস্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম। বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কানন-কুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহাসনে, আর কালিদাস নিম্নে, যোড়হস্ত। ভুল। (পৃ. ১)

নহবদ, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, সকল একেবারে

বাজিতে লাগিল। বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল; যে ছুটিতে পারিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। এক কুটীর-সম্মুখে একটী বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, বাদ্যোদ্যম হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর, দরিদ্র-সন্তান, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বোধ হয়, বড় স্নেহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশমাত্রও নাই; নয়নে কজ্জল, ভ্রূযুগের মধ্যস্থানে একটী সূক্ষ্ম টিপ। মুখখানি অতি যত্নে মার্জ্জিত।

বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা সেইখানে দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন। করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে যাইবার নিমিত্ত পৈঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাকুলিত স্বরে আরও কাঁদিতে লাগিল। রাজা তখন চূড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন, দুই একবার ডাকিলেন, বালিকা ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র দুই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন, "কন্যাটী ব্রাহ্মণের সন্তান।" রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটী তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া একবার পথের দিকে হস্ত বাড়াইয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল। রাজা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর দর্শন করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোমার দ্বারা তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন। চল,

তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই।" বালিকা আনন্দে হাসিতে লাগিল। (পৃ. ২৪-২৫)

পালামৌ :—

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব, একটি পয়সা" "সাহেব, একটি পয়সা।" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি ?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালি।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে, যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময়ে একটি দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাঁধিল! (পৃ. ৮৩)

তাহার পর কতক দূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল,

আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে। আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতক দূর গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। (পৃ. ১১০)

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্ত-ভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃণ্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রিয়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময়ে দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময় মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া

তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল। (পৃ. ১১৮-১৯)

উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার যে নিদর্শন আছে, তাহা দৃষ্টে সাহিত্য-রসিক পাঠকমাত্রেই এই ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন যে, প্রতিভার উপযোগী বৃহৎ সৃষ্টি তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এই ক্লেশকর অসম্পূর্ণ-তার মধ্যে তিনি নিজেকে স্মরণীয় করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বলিয়া নয়, 'বঙ্গদর্শন' 'ভ্রমরে'র সম্পাদক বলিয়াও নয়, 'পালামৌ-এর লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের স্থান বাংলা-সাহিত্যে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের ও রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিটি মনে রাখিলে এই আত্মভোলা ভাববিভোর লোকটির সাহিত্য সম্পর্কে আমরাও সঠিক বিচার করিতে পারিব :—

...তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে; তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরও কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।—'জীবনস্মৃতি', পৃ. ২৬৪।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮—১৯০৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

জন্ম

১৭ এপ্রিল ১৮৩৮ (৬ বৈশাখ ১২৪৫) তারিখে হুগলী জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে মাতামহের আলয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র—হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং দুই কন্যা—বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অবস্থা মন্দ ছিল না। আনন্দময়ী তাঁহার একমাত্র কন্যা; এই কারণে তিনি জামাতা কৈলাস-চন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে, প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কৈলাসচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। উত্তরপাড়ায় পৈতৃক ভদ্রাসনের একটু অংশ ব্যতীত তাঁহার আর কোন সম্পত্তি ছিল না।

হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবল্লভহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। নয় বৎসর বয়সে তিনি খিদিরপুরে আসেন। খিদিরপুরে রাজচন্দ্রের একখানি ছোট বাড়ী ছিল, তিনি খিদিরপুরে থাকিয়া মোক্তারি করিতেন। মাতামহের খিদিরপুরের বাড়ীতেই হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

ছাত্র-জীবন

হিন্দুকলেজ

খিদিরপুরে অবস্থানকালে হেমচন্দ্র প্রতিবেশী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধি-কারীর সুনজরে পড়েন। প্রসন্নকুমার তখন হিন্দুকলেজের জুনিয়র

স্কুলের ১১শ শিক্ষক (১৮৫১—জুন, ১৮৫৩)। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হেমচন্দ্রকে ইংরেজী পড়াইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ও পরিশ্রমী হেমচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই পাঠে বিলক্ষণ অগ্রসর হইলেন। প্রসন্নকুমার সন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক হেমচন্দ্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য একেবারে হিন্দুকলেজের সিনিয়র-স্কুল-বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। দরিদ্র হেমচন্দ্রের স্কুলের বেতনও তিনি যোগাইতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় হেমচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৫২-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

The examiners consider the following boys deserving of certificates of honor :—

SECOND CLASS

1. Gopal Chunder Banerjee ... Mathematics
2. Hem Chunder Banerjee ... Literature
3. Rooplall Mitter ... Vernacular.

জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দুকলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল—এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র হিন্দু স্কুল হইতে জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১০৲ বৃত্তি লাভ করেন। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

List of Students to whom Scholarships have been awarded in April 1855.

... ...

HINDU SCHOOL.

Shamachurn Gangooly gains Dwarkanath Tagore's Scholarship of Rs 10-0-0

Hem Chunder Banerjee gains Rajah of Burdwan's Scholarship of Rs 10-0-0*

শিক্ষকতা-পরীক্ষা

জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া হেমচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কলেজে পড়িতে পড়িতে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষকতা-কর্ম্মের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের রিপোর্টে (App,. C, p. 28) প্রকাশ :—

Return of Candidates passed during the year for Employment or Promotion in the Education Dept.

Names of passed Candidates—Hem Chunder Banerjee.

Where Educated—Presidency College.

Employment at the time of Examination—Student in the Presidency College.

When and where examined—Calcutta Sept. 1856.

Grade of Certificate gained—High 2nd Grade.

N. B. 2nd Grade Certificate-holders are eligible to appointments of which the Salary does not exceed Rupees (150) One hundred and fifty.

---

* General Report on Public Instruction,...From 27th January to 30th April 1855. App. p. xciii.

কৌতূহলী পাঠকের জন্য শিক্ষকতা-পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

QUESTIONS SET AT THE TEACHERSHIP EXAMINATION HELD AT CALCUTTA IN SEPTEMBER 1856.

ART OF TEACHING AND DUTIES OF SCHOOL-MASTER.

For candidates for 2nd and 3rd Grade Certificates.

1. What books have you read, and what instruction have you rcceived in the art of teaching ?

2. Give a short analysis of any one of the books which you may have read on the art of teaching.

3. How would you organize a school of I00 boys between the ages of 6 and 12 years ?

4. What apparatus and books would you require ?

5. Give the forms of the different registers which you shall keep in a School.

6. State the distinctive features of the simultaneous, the elliptical, and the individual methods of teaching. For what subjects are they respectively suited ? Give your reasons.

7. How would you begin to teach Geography to a Class of young boys ? Give a Topographical account of your own village. Write a paper on the use of the black-board. What are the principal advantages of the Gallery system of instruction ? What system of punishments would you adopt in your School ? What are your reasons for or against corporal punishments ? What provision for the moral training of the boys you make in your School ?

8. Give a lesson using ellipses on any subject you like, say an Elephant or a Horse.

9. What amount of work ought a Class two years below the Junior Scholarship Standard to get through in one month ?*

সিনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা

ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের ঐ বৎসরের রিপোর্ট (পৃ. ১২) হইতে আরও জানা যায়, হেমচন্দ্র দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া সিনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পান। ডিরেক্টরের রিপোর্ট হইতে (App. C,. p. 12) আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Return of Senior Scholarships gained during the year.
> Names of Scholars—Hem Chunder Banerjee.
> School at which gained—Presidency College.
> When gained—April 1857.
> Monthly value of Scholarship—Rs. 25.
> For how long tenable—Two years.
> For Proficiency in what branch—General Proficiency.

---

* Rep. oi the Director of Public Instruction for 1856-57, App. C. pp. 84-85.

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা

এই সময়ে হেমচন্দ্র আরও একটি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ; এই বৎসরই এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হেমচন্দ্র উত্তরপাড়া স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পরীক্ষা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ, পর-বৎসর ৩ মে ১৮৫৯ তারিখে বি-এ পরীক্ষা হয় ; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৪ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে মাত্র ৮ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে তিন জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে ভোলানাথ পাল (হেডমাষ্টার, রাণাঘাট স্কুল) প্রথম, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় এবং তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।* এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা না দিলে কোন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিত না। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

---

* Appendices to Genl. Rep. on Public Instruction...for 1858-59. Vol. II. App. A, p. 185 ; App. C. p. 12.

এল-এল ও বি-এল উপাধি লাভ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন। ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি এই পরীক্ষা হয়। হেমচন্দ্র উপযুক্ত পারদর্শিতা দেখাইতে না পারায় এল-এল উপাধিলাভের যোগ্য বিবেচিত হন।* ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কোন স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হয় নাই। ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ম হয়, যে-সকল এল. এল.-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়াছেন, তাঁহারা ৩০৲ টাকা ফি জমা দিলেই বি-এল উপাধি লাভ করিবেন।

চাকুরী

শিক্ষকতা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হেমচন্দ্র কেরাণী-রূপে মিলিটারী অডিটার-জেনারেলের আপিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন।† অল্প দিন এই কার্য্য করিবার পর তিনি ৫০৲ টাকা

* General Report on Public Instruction,...for 1860-61. App. A, p. 147.

† কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষক প্রসন্নচন্দ্র রায়ের স্থলে হেমচন্দ্র নিযুক্ত হন বলিয়া একটি সংবাদ ২৯ জুলাই ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপ :—

"নিয়োগ।—বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সংস্কৃত কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষকতাপদে ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন।"

বেতনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টার হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর ঘোষের লেনে স্থাপিত হয়; ইহাই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আসে এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টি-টিউশন নাম ধারণ করে। এই স্কুলে শিক্ষকতাকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহশিক্ষকও ছিলেন।*

মুন্সেফি

চাকুরী বজায় রাখিয়া হেমচন্দ্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আইন-পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এল-এল উপাধি লাভ করিয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ১৯ মার্চ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু উকীল হইয়াই কাহারও পসার-প্রতিপত্তি হয় না। এ দিকে হেমচন্দ্রের আথিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। মনে হয়, এই সময়েই তিনি হে এণ্ড কোম্পানীর অনুরোধে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে Norton's Law of Evidence 'নিদর্শন-তত্ত্ব' নামে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য। খুব সম্ভব, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি মুন্সেফের কর্ম্ম স্বীকার করেন। তিনি শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় প্রতিনিধি-মুন্সেফ-রূপে বৎসর-খানেক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যে তিনি হাবড়ার মুন্সেফ ছিলেন, তাহা ২ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে :—

কিন্তু আমরা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকবর্গের ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বেতনের বহিতে হেমচন্দ্রের নাম পাই নাই। এই পদের নিয়োগপত্র পাইলেও শেষ-পর্য্যন্ত তিনি ইহা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য।

হাবড়ার মুন্সেফী আদালতটি…ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। …এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফী আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনি উচ্চউপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক ইহার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার কএকটী কার্য্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।—"সাত্রাগাছী"

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাবড়ার মুন্সেফি-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, হেমচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য হাইকেটে প্রবিষ্ট হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ওকালতিতে তাঁহার পসারও হইয়া গেল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া দুটা একটা মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমায় এক-দিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেম বাবুকেই argue করিতে হইল। তিনি মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সূত্রপাত হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। (পৃ. ৭৩)

এপ্রিল ১৮৯০ তারিখে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকীল নিযুক্ত হন।

সাহিত্য-সেবা

ছাত্রজীবনে হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে কাব্যাদি পাঠ ও কবিতাদি রচনা করিতেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়; তিনি তখন সবে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৩। ইতিমধ্যে মধুসূদন দত্তের সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইয়াছিল। তিনি পর-বৎসর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্রে প্রকাশ :— "Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface,..." তিনি আরও একখানি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন; উহা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত—কামিনী রায়-রচিত "আলো ও ছায়া।" মধুসূদনের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলেই হউক বা যে-কারণেই হউক, কাব্যরচনার দিকে দিন দিন হেমচন্দ্রের ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। শেষে ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের ভালে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন; মধুসূদনের মৃত্যুতে তিনি লিখিলেন :—

> কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন,—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীর কথা আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শেষ-জীবন

হেমচন্দ্রের শেষের দিনগুলি বিষাদময়। শোক দুঃখ ব্যাধি তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িতে থাকে। ২২ নবেম্বর ১৮৯৭ তারিখে চক্ষুতে অস্ত্র করা হইল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া আসিল না। হেমচন্দ্র অন্ধ হইলেন। ২৪ মে ১৯০৩ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনা

বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে হেমচন্দ্রের যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন করা সহজসাধ্য নহে। বর্ত্তমান তালিকায় আমরা তাঁহার কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিলাম;— এই সকল রচনার কয়েকটি এখনও তাঁহার কোন পুস্তক বা গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই।

এডুকেশন গেজেট

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

১। হতাশের আক্ষেপ ... ১২৭৫, ১৭ মাঘ
২। জীবন-সঙ্গীত ... ২ ফাল্গুন
৩। বিধবা ... ১৬ ফাল্গুন
৪। যমুনা-তটে ... ২৮ চৈত্র

৫।	কোন একটি পাখীর প্রতি	...	১২৭৬,	২৬ বৈশাখ
৬।	লজ্জাবতী	...		১৬ শ্রাবণ
৭।	মদন-পারিজাত	...		২৭ চৈত্র }
			১২৭৭,	৩ বৈশাখ }
৮।	জীবন-মরীচিকা	...		৩০ বৈশাখ
৯।	ভারত-বিলাপ	...		২৮ জ্যৈষ্ঠ
১০।	প্রিয়তমার প্রতি	...		২৫ আষাঢ়
১১।	ভারত-সঙ্গীত	...		৭ শ্রাবণ
১২।	গঙ্গার উৎপত্তি	...		৫ কার্ত্তিক
১৩।	ভরতপক্ষীর প্রতি	...		২৬ কার্ত্তিক
১৪।	পদ্মের মৃণাল	...		৬ ফাল্গুন
১৫।	প্রলয়	...	১২৭৮,	১০ আষাঢ়
১৬।	উন্মাদিনী	...		৬ শ্রাবণ
১৭।	অশোক-তরু	...		১০ ভাদ্র
১৮।	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ	...		২৪ ভাদ্র
১৯।	ভারত-কামিনী	...		৩১ ভাদ্র
২০।	কাল-চক্র	...		২৬ ফাল্গুন*

অবোধ-বন্ধু

১।	ইন্দ্রের সুধাপান	...	১২৭৬,	শ্রাবণ

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত

১।	কামিনীকুসুম	...	১২৭৯,	বৈশাখ
২।	মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয় (প্রবন্ধ)			জ্যৈষ্ঠ

* অক্ষয়চন্দ্র সরকার: 'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৮।

৩। দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ) ... ১২৭৯, ভাদ্র
৪। ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা ... পৌষ
৫। পরশমণি ... মাঘ
৬। অন্নদার শিবপূজা ... ১২৮০, জ্যৈষ্ঠ
৭। [মধুসূদনের] স্বর্গারোহণ ... ভাদ্র
৮। দুর্গোৎসব ... আশ্বিন
৯। ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার চৈত্র
১০। কমল বিলাসী ... ১২৮১, আষাঢ়
১১। এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী আশ্বিন
১২। সুহৃৎ-সঙ্গম ... ১২৮২, অগ্রহায়ণ
[কলেজ রি-ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে]

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ঃ

১। "ভুলো না ও কুহুস্বর,—ভুলো না আমায়" ১২৮৪, আষাঢ়
২। একটী প্রিয় জলাশয় ... ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ
৩। হায় কি হলো ?— ... ১২৯০, কার্ত্তিক (১০৩ সংখ্যা)
৪। নব বর্ষ ... মাঘ (১০৫ সংখ্যা)

অমৃত বাজার পত্রিকা

১। খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য ... ১২৮১, ১৯ আষাঢ়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ 'হেমচন্দ্র' পুস্তকে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪) লিখিয়াছেন ঃ—"রহস্য কবিতা রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন।... 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমৃত-বাজারের কোন পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র 'দাঁতভাঙ্গা কাব্য' নামক একটি

হাস্যরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন।…আমরা আজিকালি বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক দাঁতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু যাঁহার কাব্য প্রসাদগুণের জন্ম সর্ব্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাঁতভাঙ্গা কাব্য'খানি কিরূপ তাহা দেখিবার আমাদিগের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এ পর্য্যন্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আশা করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব্যটি উদ্ধার করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।"

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্রের কোন প্রচলিত গ্রন্থাবলীতেও "দাঁতভাঙ্গা কাব্য" স্থান পায় নাই। সুখের বিষয়, ২ জুলাই ১৮৭৪ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় আমরা হেমচন্দ্রের "খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য" পাইয়াছি। কবিতাটি হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।—

বাঙ্গালিরা তবে শুন বাঙ্গালির যত গুণ
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞা মত তাঁর;
সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃত বাজার নামে
সুবিখ্যাত পত্রিকা যাঁহার।
বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাঁত
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক;
বাক্যবিশারদ বীর প্রিয় পুত্র জননীর
অন্ধকার বঙ্গের জনাক—
আমার শিশির ভাই তাঁহার আদেশে গাই
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ;
আচার্য্য যেমন যার সেইরূপ শিষ্য তার
অধমের এই অনুরোধ॥

১

বাঙ্গালি অপূর্ব্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে;

মল্ল ভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে !
বিড়ালে করিলে তাড়া মূষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লেখনী ধরে বীর !
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গভূমি করয়ে অস্থির।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্নিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটা কলম ঢাকের কাটা
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়।
অমনি বাঙ্গালি যত উচ্চ শব্দ করে কত
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায় ;
পলাশী পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায়।
এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোঁপে চাড়
দিয়া রঙ্গে মল্লবেশে সাজি ;
কলমে বাজায় ডঙ্কা কুঁদনিতে জিনে লঙ্কা
কথায় দেখায় ভেল্‌কীবাজী।

২

দ্বিতীয় বাহন দল ইহাঁদের যে সকল
বাঙ্গালির গৌরবের হাঁড়ি ;
কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মাল সাটে
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী ;
গিন্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্দ রাগভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,

যত পড়ে গাত্র জলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায়।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে ?
গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড় ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোযাগারে।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহজ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ ;
আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।
গায়ে থাকে গার ঝাল আবার সপ্তাহ কাল
গত হলে গায়ের দাহন ;
ভাগ্যবলে বাঙ্গালায় করিতে ভারত উদ্ধার
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ।

৩

তৃতীয় তাহার পর সেই সব গুণধর
এই অন্ধ বাঙ্গলার নড়ি ;
শোনা কথা সাত কাণ করে যারা খান খান
খেলে খালি লৈয়ে কাণা কড়ি।
ঝাপট সাপট সার নাহি ছাড়ে গৃহদ্বার
তিল পেলে কর্য্যে তোলে তাল ;
কপাটে হুড়্‌কা এঁটে লাঠি ধরে কসি সেঁটে
আগে যেতে হাঁটে পিছুয়াল ;
বিদ্যার ঘরেতে ফক্কা বিছানায় হেরে মক্কা
টিমটিমিয়ে ঢকা জ্ঞান করে ;

বায়স ডাকিলে তায় ভাবে সে গরুড় ছায়
কেঁচো দেখে দশ হাত সরে।
ইংরাজির ভাঙ্গা বুলি জিহ্বা অগ্রে কতগুলি
সর্ব্বদাই করে ধড়্‌ ফড়্‌;
লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত
শেষ কথা ক্যাম্প ছাড়ি রড়!
উঠেছে ছাপার ছত্রে অমৃত বাজার পত্রে
বাঙ্গালির গুণের কীর্ত্তন,
বাহওবা দেয় সাত বার হাত পা আছাড়ে আর
ঘরে গিয়া করয়ে শয়ন।
ভারত উদ্ধার হেতু ইংরেজী বিদ্যার সেতু
এই সে তৃতীয় প্রকরণ!!

৪

চতুর্থ আমার মত ঝোল ভাত রাঢ়ী যত
ধীর শান্ত স্থির সহিয়ান,
বনেদি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে
কিল চড়ে নাহি যায় মান,
চাপট পড়য়ে যেই গাল ফিরাইয়া দেই
দুর্ব্বল মানিতে নাহি লাজ;
চটকের প্রাণ লৈয়ে সুবৃহৎ গাছ বৈয়ে
সাধ করে না হইতে বাজ।
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয় এখন ত সে দিন নয়
দাঁত ভাঙ্গে গোরাঙ্গের কিলে।
এখনও সে বিবিজান অন্দর ছাড়ি পালান
দূরে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে!!

বদনে বদন নাই আর কি বলিব ভাই
তবু বাণী শুন খোগ্‌লার—
বাঙ্গালির ফণা ধরা মরিতে পালক পরা
ছাতারের নৃত্য করা সার !!

খোগ্‌লা চন্দ্র বন্দীয়ান

২। বাজিমাৎ ... ... ১২৮২, ৭ মাঘ

"১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়।...

হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তেমনই এই ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্য-কবিতা রচনায় ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ্ না।" এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' রচিত হয়।"—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : 'হেমচন্দ্র', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৮।

নবজীবন

১। মদন পূজা ... ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, শ্রাবণ
২। হুতোম প্যাঁচার গান ... " ৩য় " আশ্বিন
৩। দীপণ-উৎসব।— ... " ৬ষ্ঠ " পৌষ
ভারতের নিদ্রাভঙ্গ
৪। হরিদ্বার ... ২য় " ৫ম " ১২৯২, অগ্রহায়ণ

[এই কবিতাটি পরে কবি-কর্তৃক স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়; সংশোধিত কবিতাটি ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।]

৩য় ও ৪র্থ বর্ষের (১২৯৩-৯৪) 'নবজীবনে'র লেখকগণের নামের মধ্যে হেমচন্দ্রের নাম আছে, কিন্তু উহাতে কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয় নাই।

প্রচার

১। সংসার ... ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, ১৫ শ্রাবণ
২। দেশলাইএর স্তব ... " ৩য় " আশ্বিন
৩। গঙ্গার স্তোত্র।
(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে) ২য় খণ্ড, ৪র্থ " ১২৯২, কার্ত্তিক
৪। বন্দে মাতর্গঙ্গে ... ৪র্থ খণ্ড, ১১শ-১২শ " ১২৯৫, ফাল্গুন-চৈত্র

ভারতী

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ... ১২৯২, শ্রাবণ
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ... ফাল্গুন
জীবনের লীলা ফুরালো ... ১২৯৩, চৈত্র
জয় জগদীশ হে ... ১২৯৪, কার্ত্তিক

নব্যভারত

১। কেন কাঁদ? [বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে] ১৩০১, আষাঢ়

নাট্যমন্দির

১। লছমন্ ঝোলা ... ১৩১৯, শ্রাবণ

মাসিক বসুমতী

১। তুষানল ... ১৩২৯, বৈশাখ
২। বিজয়া ... কার্ত্তিক

গ্রন্থপঞ্জী

হেমচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

বাংলা :—

১। **চিন্তাতরঙ্গিণী**। সন ১২৬৮, ইং ১৮৬১। পৃ. ৩০।

চিন্তাতরঙ্গিণী
"পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য,
মনুষ্যের সার পদার্থ মন।"

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র। সন ১২৬৮। ইংরেজী ১৮৬১। মূল্য ।০ চারি আনা।

ইহার "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কবিতাকেশরী রায় গুণাকরের পর কবিতারচনা করিয়া যশঃ লাভ করা অসাধ্য। ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া আপাততঃ মূঢ়ের

কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সকলের মন সমান নহে। দেশ কাল ভেদে মনোবৃত্তি প্রবাহের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে। এমন কি এক ব্যক্তিরই সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব উথলিত অন্তঃকরণের ভাবনিকর লিপিবদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সংস্কারপরবশ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিতে সাহস অবলম্বন করিলাম।

পাঠকবর্গের নিকট আমার এই মাত্র নিবেদন যে, তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। ইহার দোষ গুণ বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না; কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহার দ্বারা প্রাচীন ব্যক্তিগণ নব্যসম্প্রদায়ের মনের অবস্থা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং অনেকানেক পিতা মাতা সন্তানদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের মনঃপীড়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

পশ্চাল্লিখিত গল্পটী বাস্তব কোন ঘটনার অবিকল বিবরণ নহে উহার অধিকাংশই কাল্পনিক।

কলিকাতা।
১ লা ভাদ্র।
১২৬৮ সাল।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া রচিত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য আত্মহত্যা করেন। ইহার অল্প দিন পরেই হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী ও বাল্যসুহৃদ্ শ্রীশচন্দ্র (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের অগ্রজ) পিতার কোন আদেশ বিবেকবিরুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী

হন। এই ঘটনা হেমচন্দ্রকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> হেমবাবুর চিন্তাতরঙ্গিণী···তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।···আমিই [হাবড়ার হিতকরী পত্রিকায়] প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের "Man's love of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।—(পৃ· ৭৪-৭৫। 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়)

২। **নিদর্শন তত্ত্ব।** ইং ১৮৬২ (?)

ইহা Norton's Law of Evidence গ্রন্থের অনুবাদ।* কলিকাতার Hay & Co. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া হেমচন্দ্রের সাহায্যে এই অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। আমরা এই পুস্তকখানি এখনও কোথাও দেখি নাই।

৩। **বীরবাহু কাব্য।** ইং ১৮৬৪। পৃ. ৯৪।

> বীরবাহু কাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
>
> "Italia ! Oh Italia ! thou who hast
> The fatal gift of beauty, which became
> A funeral dower of present woes and past,
> On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame.
> And annals graved in characters of flames.
> Oh God ! that thou wert in thy nakedness,
> Less lovely or more powerful and could'st claim

* Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, &c. (1875), p. 76.

Thy right, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress.
BYRON.

কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭১ সাল।

আখ্যা-পত্রের পৃষ্ঠে এই কবিতাটি আছে :—

আর্ কি সে দিন্ হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥
যবে দেব-অবতংশ, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর!
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত॥

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিতেছেন :—

প্রায় তিন বৎসর হইল আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এ কালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ, প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয় ত যশের নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক একবার চেষ্টা করিয়া দেখি

সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

খিদিরপুর
৩১এ বৈশাখ। } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বীরবাহু কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বীরবাহু কাব্যে একদিকে যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্য দিকে সেইরূপ, ভাষা ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্যসঞ্চার দেখা যাইতেছে।—'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৭।

৪। **নলিনী-বসন্ত নাটক**। ১২৭৫ সাল [১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮]। পৃ. ১১৪+১ শুদ্ধিপত্র।

নলিনী-বসন্ত নাটক। মহাকবি সেক্‌সপিয়র কৃত টেম্পেষ্ট্ নামক নাটক অবলম্বনে বিরচিত।

"Sweetest Shakespeare, Fancy's child,
Warbling his native wood-notes wild."

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১১২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ সাল।

৫। **কবিতাবলী**। ২১ নবেম্বর ১৮৭০। পৃ. ৭৯।

কবিতাবলী। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট ও অবোধবন্ধু হইতে পুনর্মুদ্রিত

ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭ সাল।

হেমচন্দ্রের চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, "অনেক অনুসন্ধানেও কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" আমরা ১ম সংস্করণের 'কবিতাবলী' দেখিয়াছি ও উহার "সূচিপত্র"টি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইন্দ্রের সুধাপান, হতাশের আক্ষেপ, জীবন সঙ্গীত, বিধবা রমণী, যমুনাতটে, কোন একটি পাখীর প্রতি, লজ্জাবতী লতা, মদন পারিজাত, জীবন-মরীচিকা, ভারত-বিলাপ, ভারত-সঙ্গীত, প্রিয়তমার প্রতি, গঙ্গার উৎপত্তি, চাতক পক্ষীর প্রতি।

১২৭৮ সালে প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র ২য় সংস্করণও মন্মথবাবু দেখিতে পান নাই। আমরা উহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। ইহাতে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জ্জিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত কবিতাগুলি নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

কুলীনমহিলাবিলাপ, পদ্মের মৃণাল, প্রভাত কাল, উন্মাদিনী, অশোক তরু, প্রলয়, ভারত কামিনী।

পাছে গবর্মেণ্টের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়েই বোধ হয়, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণ 'কবিতাবলী'তে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জ্জন করিয়াছিলেন,—বিশেষতঃ এই জাতীয়তাবোধক কবিতাটি প্রথমে যখন 'এডুকেশন গেজেটে' (৭ শ্রাবণ ১২৭৭) প্রকাশিত হয়, সেই সময় গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুর কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন।

১২৮৩ সালে উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তৃতীয় সংস্করণ 'কবিতাবলী' (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ২য় সংস্করণের "প্রভাত কাল" কবিতাটি বর্জ্জিত এবং নিম্নোক্ত নূতন কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা, দেবনিদ্রা, পরশমণি, কমল বিলাসী, ভারতভিক্ষা, অন্নদার শিবপূজা, ভারতে কালের ভেরী, এই কি আমার জীবনতোষিণী, দুর্গোৎসব, স্বর্গারোহণ, সুহৃৎ সমাগম, কামিনী কুসুম, কালচক্র।

তৃতীয় সংস্করণের 'কবিতাবলী'র কয়েক খণ্ড পুস্তকের শেষ ভাগে "ভারত-সঙ্গীত" ও "তুষানল"—হেমচন্দ্রের এই দুইটি কবিতা একত্র মুদ্রিত করিয়া সংযোজিত হইয়াছিল। "তুষানল" সম্বন্ধে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন :—

> …বোধ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড কবিতাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। 'তুষানল' ও 'ভারত-সঙ্গীত' একত্র মুদ্রিত করিয়া কোন কোন বন্ধুকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড পুস্তকের শেষভাগে উহা বাঁধানও হইয়াছিল। কিন্তু 'তুষানল' কবিতাটি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। —'হেমচন্দ্র', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩।

১২৮৭ সালে "বিদ্যালয়-পাঠ্য" 'কবিতাবলী,' ১ম ভাগ (৫ম সং) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৩য় সংস্করণ 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলি ছাড়া আরও দুইটি কবিতা বেশী আছে; একটি—"কুহুস্বর", অপরটি—"ভারতসঙ্গীত"। ১২৯৭ সালে বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাবলীর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' *First Edition* (*Revised*) প্রকাশ করেন, ইহার কবিতাগুলি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; ইহাতে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে :—

> ১। যমুনাতটে, ২। পদ্মের মৃণাল, ৩। জীবন-সঙ্গীত, ৪। লজ্জাবতী-লতা, ৫। জীবন মরীচিকা, ৬। অশোক তরু,

৭। চাতক পক্ষীর প্রতি, ৮। পরশ-মণি, ৯। গঙ্গার উৎপত্তি, ১০। চিন্তাকুল যুবা, ১১। শচী-বিলাপ, ১২। কাশী-দৃশ্য, ১৩। বৃত্রাসুর বধ, ১৪। শিশুর হাসি, ১৫। আশাকানন, ১৬। স্বর্গারোহণ, ১৭। দধীচির অস্থিদান, ১৮। সতীশূন্য কৈলাস।

'কবিতাবলী' সমালোচকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ১ম সংস্করণের 'কবিতাবলী' সমালোচনাকালে লিখিয়াছিলেন :—

These poetical pieces are amongst the best specimens of Bengali poetry we have recently seen. The versification is nearly faultless, the sentiments are not always common-place, and the imagery shows good taste in the writer. The volume is a reprint of pieces which appeared first in the columns of the "Education Gazette" and the "Abodha Bandhu." The first piece, a ballad entitled "Indra's Potation" is in our opinion the best.

৬। **বক্তৃতা**। ইং ১৮৭২। পৃ. ৮।

ইহা সুবারবান্ রেট্-পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতা। ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

৭। **বৃত্রসংহার**, ১ম খণ্ড। ১২৮১ সাল [১৪ জানুয়ারি ১৮৭৫]। পৃ. ১৩৭।

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) ১২৮১ সাল।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিণ্টন্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই ; কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।...

...বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।...

...সকল বিষয়ে কিম্বা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি।... কলিকাতা, খিদিরপুর। ১৮ পৌষ, ১২৮১ সাল।

'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন। ১২৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'বৃত্রসংহারে'র সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বাঙালী পাঠককে হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিলেন।

৮। **ভারতভিক্ষা।** ১২৮২ সাল [১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫]। পৃ. ১৮।

ভারতভিক্ষা। (যুবরাজের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা। ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। এবং শ্রীবিপিন বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল। মূল্য ৵০ আনা।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) ২৩ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় আগমন করেন। এই উপলক্ষে 'ভারতভিক্ষা' রচিত হয়।

৯। **আশাকানন।** ১২৮৩ সাল [৩০ মে ১৮৭৬]। পৃ. ১৭২।

আশাকানন [সাঙ্গরূপক-কাব্য] শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ও শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে, নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৮৩ সাল।

প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায় "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

আশাকানন এক খানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহাই অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক।......

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্তু কবি নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তক খানি প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।...খিদিরপুর ১লা মে, ১৮৭৬।

১০। **বৃত্রসংহার,** দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮৪ সাল [১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭]। পৃ. ২২৬।

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত। ১২৮৪ সাল।

১১। **কবিতাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮৬ সাল [১ জানুয়ারি ১৮৮০]। পৃ. ৭৭।

কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম সংস্করণ।

"The soul is dead that slumbers."

Longfellow.

কলিকাতা। ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে, শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত, এবং ১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

ইহাতে নিম্নলিখিত বারটি কবিতা স্থান পাইয়াছে :—

কাশী-দৃশ্য, শিশুর হাসি, গঙ্গার মূর্ত্তি, চিন্তা গঙ্গা, বিন্ধ্যগিরি, মণিকর্ণিকা, ইউরোপ এবং আসিয়া, পদ্মফুল, রেলগাড়ী, বিশ্বেশ্বরের আরতি, বাঙালীর মেয়ে।

১২। **ছায়াময়ী।** ১২৮৬ সাল [১৫ জানুয়ারি ১৮৮০]। পৃ. ১৪২।

ছায়াময়ী। [কাব্য]

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may the rather meete."
Spenser.

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া
চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে,
ধরি এই মনোরথে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডাণ্টের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বী এক জন প্রকৃত খৃষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন :—"ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশান-বর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।"

১৩। **দশমহাবিদ্যা।** ১২৮৯ সাল [২২ ডিসেম্বর ১৮৮২]। পৃ. ৫৪।

দশমহাবিদ্যা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Where shall I grasp thee, infinite Nature where !

* * *

How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range !

Geothe's Faust.

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ নং ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২। [*All rights reserved.*]

"গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটীকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।...

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না, যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিতমতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। খিদিরপুর। অগ্রহায়ণ। ১২৮৯ সাল।

১৪। **হুতোম প্যাঁচার গান।** ১২৯১ সাল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন :—"১২৯১ সালের আশ্বিনে হেমবাবু 'নবজীবনে' "হুতোম প্যাঁচার গান" বা "কলির সহর কলিকাতা" লিখেন। অল্প কাল পরে নবজীবন আফিস হইতে পুস্তিকাকারে ঐ পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের নাম ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। হেমবাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা স্থান পায় নাই।"—'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৪৩।

১৫। **নাকে খৎ।** ইং ১৮৮৫ (?)। পৃ. ২১।

এই "হাস্য-কাব্যে"র একটি ইতিহাস আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচ শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২৪১)...এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। (ঐ, পৃ. ১১৮।)

এই পুস্তিকার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

১৬। **ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব।** [১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭]। পৃ. ১১।

> "উপহারের জন্য এই কবিতাগ্রন্থের একটি রাজসংস্করণও রয়েল ৪ পেজী আকারে নানাবর্ণের কালীতে অতিপরিপাটিভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা মূল কবিতা ও পরপৃষ্ঠায় ইংরাজী কবিতায় উহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। মহারাণীকে উপহার প্রদান করিবার জন্যই ইংরাজী অনুবাদটি মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অনুবাদটি হেমচন্দ্রের নহে। হেমচন্দ্র কখনও ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।"—'হেমচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

১৭। **রোমিও-জুলিয়েত।** ১৩০১ সাল [২০ জুলাই ১৮৯৫]। পৃ. ১৮৯।

রোমিও-জুলিয়েত। (ছায়া)
বাণী বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২৯।৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে, আর্য্য-সাহিত্য সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০১

ইহা শেক্‌সপীয়রের গ্রন্থের অনুবাদ নহে। গ্রন্থকারের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

> এই পুস্তকখানি, সেক্ষপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়া মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্য কঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম।...

১৭। **চিত্ত-বিকাশ।** ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৮। পৃ. ৭০।

চিত্ত-বিকাশ। শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Renounce all strength but strength devine;
And peace shall be for ever thine."

Cowper.

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনারস সিটি। ৺কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটীরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম। উপরিলিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম
ইং ১৮৯৮। ২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫। ৯ পৌষ — শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'চিত্ত-বিকাশ' কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে এই কয়টি কবিতা স্থান পাইয়াছে :—

হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন, বিভু কি দশা হবে আমার, কি হ'বে কাঁদিয়া ?, জয় জগদীশ জয় বলয়ে বদন, কৌমুদী, স্মৃতিসুখ, খদ্যোত, আলোক, ফুল, সরিৎ সময়, কল্পনা, প্রজাপতি, জন্মভূমি, কি সুখের দিন, ধনবান্, ভালবাসা, অতৃপ্তি, মৃত্যু, শিশু বিয়োগ, ব্রজবালক, কবিতা সুন্দরী।

গ্রন্থাবলী :—

হেমচন্দ্রের অনেকগুলি গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য ; এগুলির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

১। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪):—ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ইহাতে তিনটি কবিতা—"দেশলাইএর স্তব," "সংসার" ও "মদন পূজা"—আছে। হেমচন্দ্র হিন্দী হইতে বাংলা পদ্যে কতকগুলি দোহাঁ "দোহাঁবলী" নামে অনুবাদ করেন, সেগুলিও এই গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

২। ১৩০০ সাল:—আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থাবলীতে পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির "নূতন সংশোধিত সংস্করণ" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ১ম ভাগ 'কবিতাবলী' স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহার কবিতাগুলি পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকের অনুরূপ, কেবল "প্রিয় বয়স্যের প্রতি" কবিতাটি বেশী আছে। বিবিধ কবিতাগুলির মধ্যে ২য় ভাগ 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলি ছাড়া এই কয়টি স্থান পাইয়াছে:—দোহাঁবলী, নব বর্ষ, মন্ত্রসাধন, জয়মঙ্গল গীত, মদন পূজা, সংসার, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে, সাবাস হুজুক আজব সহরে, হায় কি হলো?— নেভার্—নেভার, বাজিমাৎ, দেশলাইয়ের স্তব।

৩। ১৩০৬:—হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা আর্য্য-সাহিত্য-সমিতির 'হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অনুরূপ, কেবল কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রোমিও-জুলিয়েত' ও 'চিত্ত-বিকাশ' নূতন সংযোজিত হইয়াছে। বিবিধ কবিতাগুলির মধ্যে এই কয়টি বেশী আছে:—দীপন উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে, বিদ্যাসাগর, আমায় কেন পাগল বলে পাগলে।

১৩১১ সালে হিতবাদী-কার্য্যালয় 'হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে আরও এই কয়েকটি কবিতা নূতন সংযোজিত হইয়াছে:—এবে কোথা চলিলে? (সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে),

আজি কি আনন্দ বাসর! (ভারতেশ্বরীর জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে), বঙ্গে মাতর্গঙ্গে, কেন কাঁদ, রাখিবন্ধন (কংগ্রেস উপলক্ষে), দোহাবলী।

ইংরেজী :—

১। *Life of Srikrishna.*

হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় হেমচন্দ্র ইহা রচনা করেন। তাঁহার চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন :—

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র [হিন্দু] কলেজে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন।...হেমচন্দ্রও এই সভায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত" বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড লঙ উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা'র তৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার ফর্বস্ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।—'হেমচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯।

২। *Brahmo Theism in India.* [7 April 1869], pp. 61.

পুস্তকখানি রচনার ইতিহাস এইরূপ :—

"তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র...ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিলেন।...তিনি কিছুকাল কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিলেন। গয়ায় তাঁহার পিতৃদেবের তর্পণাদি করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে দেশময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায়, শিক্ষিত ব্যক্তিও

যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় "কুসংস্কার" পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতর্পণ করিলেন ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া "কুসংস্কারপূর্ণ" হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, ইহার ইঙ্গিতও করিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism In India শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া কি জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।"—'হেমচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ১৩২৫ সালের 'মালঞ্চ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি নব্যতন্ত্রী হইয়াও পুরাতন যুগের শেষ কবি। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সকল বিভাগে অভিনবত্বের বান ডাকাইয়াছিলেন মধুসূদন। তিনিও আমৃত্যু অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়। বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই কাব্যগগনের সমুজ্জ্বল সূর্য্যরূপে রবীন্দ্রনাথ দেদীপ্যমান হন। মধুসূদনের তিরোভাব হইতে রবীন্দ্রনাথের এই আবির্ভাবকালমধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে আজ তাঁহাদের প্রভাব যতই হ্রাস

পাইয়া থাকুক, স্ব স্ব রাজত্বকালে তাঁহারা যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক মিলিবে। মধুসূদনের মৃত্যুতে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ; রবীন্দ্রনাথের "হিন্দুমেলায় উপহার" ('অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত) কবিতাও কম প্রমাণ নয়। শিক্ষিত বাঙালী একদিন হেমচন্দ্রের ভেরী ও সিঙ্গা-রবে মাতিয়াছিল, নবীনচন্দ্রের কামান-গর্জ্জনে পুলকিত হইয়াছিল। আজ যুগপরিবর্ত্তনে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা এই দুই জন শক্তিমান্ কবির কীর্ত্তি ভুলিতে বসিয়াছি। ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই এই "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। কবির আসল পরিচয় তাঁহার কাব্যে মিলিবে।

হেমচন্দ্রকে নানা সমালোচক নানা ভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন—তিনি ভাষা ও ছন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাঁহার কাব্যের কোনও অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না, বিলাতী কাব্যপাঠে যাঁহারা অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্য-সাহিত্য হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গা ভাসাইয়া চলিতেন, ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন-না-কোন দিক্ দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইলেও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুগাবসানে তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইলেও হেমচন্দ্রের রচনা যুগ-প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবেই সাধন করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের অনেক কাব্য-কবিতাই নিত্য কালের নহে, কিন্তু যুগবিচারে তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নয়। হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের খাঁটি বাঙালী কবি, বাঙালীয়ানার সকল দোষগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। সে-যুগের বাঙালীরা এই কারণে হেমচন্দ্রকে

মধুসূদনেরও উর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন :—

> এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।...আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—
>
> ... ...
>
> ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
> অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায়,
> নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার
> বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।
>
> নাহি করে গতি গ্রহমলপতি
> অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
> নদনদীজল হইল অচল
> নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।
>
> দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
> গগনে হইল কিরণোদয় ;
> ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
> পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।
>
> শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
> তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়

ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তার।

হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা দীর্ঘকাল বাঙালীর মুখে মুখে চলিয়াছিল; "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে", "আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়", "কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকুসুমে" প্রভৃতি লিরিকধর্ম্মী কবিতা আজিও সে-যুগের বাঙালীরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্রের অন্তরের অনুভূতি নানা কবিতার আকারে বর্ত্তমান থাকিয়া কবি-মানুষটির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করে। এই গীতিধর্ম্মী কবিতার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রচনাকালে কবি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। হেমচন্দ্রকে যাঁহারা ভাবুকতা-বিলাসী বলিয়া জানেন, তাঁহারা এই কবিতাটিতে তাঁহার ভাবের গভীরতাও দেখিতে পাইবেন—

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে;
আমার রজনী শেষ হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধায় সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে,
শিশির বসন্তকাল আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে!
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।

আধুনিক যুগের মানুষ পুরাতন যুগকে মমতার চক্ষে দেখেন না বলিয়া হেমচন্দ্র আজ বিস্মৃত হইয়াছেন। হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনা হইতে সাময়িক ও ভাবাতিশয্যপূর্ণ লেখা বাদ দিলেও এমন বস্তু কিছু থাকিবে, যাহাতে তিনি বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় পাঠককে হেমচন্দ্রের যাবতীয় কাব্য-কবিতা পড়িতে হইবে। আমরা সাধারণ পাঠকের জন্য একটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন এখানে প্রকাশ করিতেছি।—

চিন্তাতরঙ্গিণী :—

কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহারচিহ্ন কত ॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া ॥
এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে ॥
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে ॥

কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনোকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার,
একাসনে দুজনে বসিয়া ॥
কত বার একাসনে, দোঁহে মিলি সংগোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি ॥
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে ॥

বীরবাহু কাব্য :—

মা গো ও মা জন্মভূমি ! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়েসে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা বলে।
কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।

কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ ॥

নলিনী-বসন্ত :—

রাগ ললিত—তাল আড়া ঠেকা।
দিবা হলো অবসান ডুবিছে তিমির ;
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
এ কি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে, সখীগণে নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস, ভুলাতে অমর।

কবিতাবলী :—

লজ্জাবতী লতা

(১)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, উটি লজ্জাবতী লতা
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে এক ধারে আছে স'রে,
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারি ধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা, ওইখানে থাক, দিও না'ক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে
যেও না উহার কাছে, খাও মোর মাথা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, উটি লজ্জাবতী লতা!

(২)

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর !
যায় না কাহারো পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর !
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর !—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর ?

(৩)

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন ;
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানস-রঞ্জন ;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !
ছুঁয়ো না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন ।

জীবন সঙ্গীত

ব'লো না কাতর স্বরে, "বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার,"
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।
মানব জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়।
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়॥

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।
সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;

অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান ;
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গণ মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

হতাশের আক্ষেপ

(১)

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে!

তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

(২)

অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

(৩)

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

(৪)

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম !
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম !

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;

কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি, নাথ" !
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

(১১)

বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

ভারত-সঙ্গীত

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা, আজন্মপূজিতা
চির বীর্য্যবতী, বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায় ॥

আরব্য মিসর, পারস্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে,

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার!

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী, যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে;
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

এখন তোরা যে শতকোটি তার,
স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারি হইতে,

বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন?

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল!

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?

সকলি ত আছে, সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে
গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে!

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদ-ভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে!"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
আবার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গভীর স্বরে—

"এখনো জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

এক বার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না,—হবে না—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন ॥

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

কামিনী কুসুম

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

(৩)

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুলমুখে মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি !
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,

রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি ?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

(৪)

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা ;
না জানে বেশ বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা-সম কোথা পাব ললনা !

(৫)

কে দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা ।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !—
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা !

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,

বঙ্গবাসী রঙ্গ রসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরাণী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা ফিঁকে "ভায়োলেট" গন্ধ নাহি তাহাতে—
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতি
বান্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে !

(৮)

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী !—
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভালবাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
মরি কি অপরাজিতা, নীলিমার লহরী !

(৯)

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

বৃত্রসংহার

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষবনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।

সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া !
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া !
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে চপলা বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন ॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে !
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে !
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে !
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারি দিক্ বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে !
হায় এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ !
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ !
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল !

নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চির দিন কেমনে সহিব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাসসুখ ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ !
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ !
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে !
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।

যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে !
কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে !
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি !
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু-বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি !
সুমেরুশিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমরসঙ্গিনীগণ সহ ।
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্র পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত ।
নির্ম্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু অঙ্গে নিত্য বরষিত !
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশসুখকর ।

চলেছে নন্দন তলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে সে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দনবিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়!
যে পুষ্প শচীর হৃদি স্নিগ্ধ করিবারে বিধি
নিরমিলা অতুল শোভায়!
সখি রে দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে;
যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা চপলারে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, আর কি কব অধিক,
এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে!
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে!
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!

আমার মুকুট-রত্ন, অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায় !
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী স্থান !
আর না আসিবে লক্ষ্মী, করেতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্পঘ্রাণ !
ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা ;
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁর—
শচীর পরশ এবে মলা !
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই ।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই !
কোথায় পলাব বল ? কোথা আছে হেন স্থল ?
এ মুখ না দেখাব কাহারে ;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে !
ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ ।
তবে সে ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥”

... ...

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী ;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে ;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গবহির্দ্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

... ...

হেথায় কুমেরুশৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হৈয়ে সুসজ্জিত,
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য যেথা বিরাজিত উমা, উমাপতি।

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি, পর্ব্বতমালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা, চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ-শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোনখানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি-আবৃত,
সুদৃশ্য ধরণী অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায় !

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত—
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীগহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্য-প্রিয়-দেশ।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরম্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতিঃবিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারু দীপ্তি সূর্য্য চারি ধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্যপথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে।

সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর;

দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন,
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে,
বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি-শূন্য অপূর্ব্ব ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি,
সুদূর নক্ষত্র-তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীন প্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে

শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অষ্ট, সংযত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা ;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজূটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি অচল অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ।

বসিয়া নিমগ্ন চিত্ত গভীর কথনে ;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বামদেশে ;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে ;—

কি হেতু হইল সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপনা।

... ...

গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ;
প্রকাণ্ড-মুদ্গর ধ্বনি, কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর যথা—
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম বাষ্প পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদ্বীপ শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণ সহ।

প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচিঅস্থি। উচ্চ স্তম্ভ পরে
দেখিলা জ্বলিছে উর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,
তড়িৎপিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে—
উজ্বলি ভূমধ্য দেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহীদেহ ; নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।

কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে,—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তড়িত আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি ;
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতু সহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে
শোভাকর,—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলি-উজ্জ্বল-আভা কাদম্বিনীকোলে।
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গার স্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ।
পীতবর্ণ হরিতালস্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে,
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।

অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ।
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু প্রবাহক

বিশাল লৌহের নল শত দিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণীজঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি অন্য মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা, ধাতুবিনির্ম্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি, ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়
ঘর্ম্মাক্ত, ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম করে।
ঘুরিতেছে একবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ;
শূর্ম্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু;
মুহূর্ত্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার, ধাতু পত্র নানা,
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি, চারু অবয়ব,
বাহির হইছে নিত্য; কত স্তম্ভরাজি

স্ফটিক-লাঞ্ছনা-আভা—শোভে চারি দিকে।
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল বহ্নি ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু, ধাতু-ক্লেদ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায় !
শিলাচূর্ণ ধাতুস্রাব, ভস্ম বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে—
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে।
গঠে শিল্পী কত সেতু, কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস, অস্ত্র, বর্ম্ম, দেখিতে অদ্ভুত।

ছায়াময়ী ঃ—

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;

ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী বন।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।
ঊর্দ্ধ চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভুঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরবীপাল,
ভীম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বালিছে ভাল।
চণ্ড আরবে, খেলিছে ভৈরবে
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে।

দশমহাবিদ্যা ঃ—

সতীশূন্য কৈলাশ

ছিন্ন হইল সতীদেহ, শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন ॥
সতীমুখ-বিভাসিত যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুমকানন।
পেয়ে যে কিরণমালা, সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন ॥
শুষ্ক কল্পতরু সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন ॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন ॥
আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহছায়া।
ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া ॥
মুখে "সতি"—"সতি"স্বর বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।

করে জপমালা চলে, মুখ "ববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন ॥
জটালগ্ন ফণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বা জালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন, নিরানন্দ পুষ্পগণ,
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর ॥
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস-জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা মা" নাদে, অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে
"বম্" শব্দ সহ সম্মিলন ॥
কৈলাস-অম্বরময়, তারা সূর্য্য অনুদয়,
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমঃছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ কণ্ঠের গরল ॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন ॥
তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্বকথা মনে সরে,
সরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়, নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন।
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি,
যুগযুগান্তের কথা মনে।

জগতের জড় জীব, কান্দিছেন হেরি শিব,
কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে ॥

মহাদেবের বিলাপ

"রে সতি রে সতি" কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে ॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে ॥
জলনিধি-মন্থনে, অমৃত উছালিল,
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভস্ম-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরল প্রবাহে ॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, হরষিত অন্তর,
সংসাররতি নিরবাণে ॥

কারণবারি'পরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।
নির্ঘৃণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেহ ক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে॥
প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,
নর-ভালে প্রীত গিরীশ।
পুষ্পকবাহন, বাসব সুরপতি,
বৃষবর-বাহন ঈশ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥

চিত্ত-বিকাশ :—
বিভু কি দশা হবে আমার
একটী কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন॥
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে॥

চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে॥

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।
ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্তিমান॥

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি॥

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার।
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে।

আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে ॥
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে।
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে ॥
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানববদন।
নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার।

———

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৪

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৩

মূল্য আট আনা
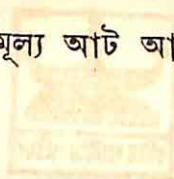
মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১— ৬. ৭. ১৯৫৬

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯—১৯১১

আত্মকথা

বংশ-পরিচয় ঃ আমার বংশ-পরিচয় এইরূপ,—প্রপিতামহ ঠাকুর অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে বিবাহ করিয়া গঙ্গাটিকুরীতেই বাস করেন। পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের অনতিদূরস্থ গাঁফুলিয়া গ্রামে আমার পূর্ব্বপুরুষদের বাস ছিল। প্রপিতামহের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ঠাকুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা, তন্মধ্যে ঠাকুর বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা। বিমাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গ প্রাপ্তির পর আমার পিতাঠাকুর পাণ্ডুগ্রামের ঠাকুর ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই আমার পরমারাধ্যা জননী।

জন্ম ; বিদ্যাশিক্ষা ঃ শকাব্দাঃ ১৭৭১।২ জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণাসপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে আমার জন্ম। পাণ্ডুগ্রাম আমার বর্ত্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী হইতে ঈষৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাটিকুরী,—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী।

পিতাঠাকুর পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মাস বয়ঃক্রম, তখন পিতামাতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত

পূর্ণিয়াতেই থাকিতাম; কেবল বৎসর বৎসর ৺শারদীয় পূজার সময়ে গঙ্গাটিকুরীর বাটীতে আসিয়া মাসেক-দেড় মাস থাকিতাম। পূর্ণিয়ায় প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারই কাছে বিদ্যারম্ভ বলিতে হইবে।

বাঙ্গলা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না; বোধ করি, ষষ্ঠ বর্ষেই পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। ঐ স্কুলে তখনকার থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। ইংরেজীই পড়িতাম, উর্দ্দু অতি অল্প, বাঙ্গলা মোটেই পড়িতাম না। বাঙ্গলায় অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল,…।

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,—গঙ্গাটিকুরীতে হইয়াছিল। নবম বর্ষে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে।

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পূর্ণিয়া গেলাম না। কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতে গেলাম। যখন ভর্ত্তি হই, তখন সেসনের অন্তিম কাল, সেই কারণে আমাকে সেবেন্ত্ ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল।…অধিক দিন কৃষ্ণনগরে পড়া হইল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরও কৃষ্ণনগরে পড়িতেন, তিনি পীড়িত হইলেন। কঠিন জ্বর-প্লীহাদি। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলাম। কিছু কাল পরে আমার জ্যেষ্ঠের সহিত বীরভূমে পড়িতে গেলাম। ইহা বোধ হয়, ১২৬৪ কি ১২৬৫ সালে।

বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথমতঃ ভর্ত্তি হই। তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও কিছু কাল সেখানে পড়িয়াছিলাম। মোটের উপর দুই বৎসর কি কিছু কম বীরভূমে পড়িয়াছিলাম। এত কাল পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ অল্পাধিক পীড়াই ভোগ করিতেছিলেন।

মনে হইতেছে, ১২৬৭ সালের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইতিমধ্যে ১২৬৬ সালের ১৩ ফাল্গুন গঙ্গাটিকুরীর পার্শ্ববর্ত্তী বালুটিয়া গ্রামে ৺বনয়ারিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করি। ভাগলপুরে আমার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে আমাদের বাসনের ব্যবসা ছিল, সেখানে আমাদের লোকজন থাকিত, বিশেষতঃ এক পিতৃব্যপুত্র (জ্যেঠতুত দাদা) সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এই কারণে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হওয়াতে আর বীরভূমে থাকা হইল না।...ভাগলপুরে পড়িতে গেলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া, ক্রমে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করি।

বীরভূমেই বাঙ্গলা শিখিতে আরম্ভ করি। ভাগলপুরে বাঙ্গলা শিখিবার সুযোগ ছিল না, উর্দ্দু পড়িতাম। কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষা বাঙ্গলাতেই দিয়াছিলাম। সে কেবল বাহুবলে বলিতে হইবে। কেন না তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কিছু শেখা হয় নাই।

এনট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে গেলাম। আগে কখনও কলিকাতা দেখি নাই। কলিকাতা গিয়া আমার শরীর ভাল ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ৩।৪ মাস পরেই স্কলার্সিপ ট্রান্সফর করাইয়া হুগলী কালেজে আসিলাম।

আমি আজন্মই অলস। পড়া-শুনায় আমার আটা হয় না। ১৮৬৫ সালের ৺শারদীয় পূজার সময়ে বাটী আসিয়া আমার প্রবল জ্বর হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত আমার জ্বর; কাজেই পড়া হইল না। তথাপি পরীক্ষা দিলাম, যথাবিধি ফেল হইলাম।...ফেল হইয়া দুঃখ হইয়াছিল, লজ্জাও হইয়াছিল। হুগলী কালেজে আর ফিরিয়া গেলাম না। কলিকাতায় গিয়া ফ্রী-চর্চ্চে ভর্ত্তি হইলাম। ফ্রী ছাত্র

হইয়া ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে, 'এক মাস তোমাকে ফ্রী রাখিব, যদি মাসিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে পার, উত্তম; নচেৎ ইহার পর বেতন দিতে হইবে।'...মাসিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থানই অধিকার করিলাম। বৃত্তিও পাইলাম। মাসে মাসে এইরূপ বৃত্তি পাইতে থাকিলাম। ক্রমে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা...দিই।

হুগলী কালেজের প্রিন্সিপাল Thwaytes (থোয়েটস্) সাহেব আমাকে—আমাকে কেন প্রায় সকল ছাত্রকেই—খুব ভাল বাসিতেন। ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, দেখিয়া, তিনি আমাকে জোর করিয়া হুগলী কালেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। থার্ড ইয়ার্ এবং ফোর্থ ইয়ারের অর্দ্ধেক হুগলী কালেজে পড়িলাম। তখন শতকরা পঁচাত্তর দিন কালেজে উপস্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে দেখিলাম যে, আমি হুগলী হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিতে পাইব না। অগত্যা একটু নীতি খাটাইয়া কলিকাতার কেথিড্রাল মিশন কালেজে ট্রান্সফার হইয়া গেলাম। সেইখান হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিলাম। ১৮৬৯ জানুয়ারিতে আমি গ্রাজুয়েট হইলাম।

পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলের তৎকালীন ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এবং অনুরোধে আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস দুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারি পাওয়াতে আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম। ওকড়সায় বৎসরের শেষ কয় মাস কাটাইয়া ১৮৭০ প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় গিয়া (B. L.) বি. এল. পরীক্ষার লেক্‌চর সারা করিলাম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম। ১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে

হাইকোর্টে নাম লেখাইলেন ; এবং সেই হইতে হাইকোর্টের জয়পত্র মাথায় বান্ধিয়া ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছে।

আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থূলকথা এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি ; তবে, অল্প যাহা পড়ি, তাহা সুজীর্ণ করি, তাহাতে অম্লোদ্গারাদি হয় না, বলাধানই হয়। আর এক কথা এই যে, আমার পড়া-বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশি। আমি কুড়াইয়া বহু বিদ্যা লাভ করিয়াছি।

ওকালতী ঃ আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থান পূর্ণিয়াতেই আমি প্রথম ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর পারসী ভাল জানিতেন এবং সাতিশয় দান-শৌণ্ড ছিলেন। 'মুন্সীজী' বলিলে, যেন পারিভাষিকরূপে তাঁহাকেই বুঝাইত। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭১ সালের এপ্রিল কি মে মাসে পূর্ণিয়া গিয়া দেখিলাম যে, লোকে আমাকে "মুন্সীজীকা লেড়কা" বলিয়াই চিনিতেছে ; এবং পরিচয় করিয়া দিতেছে। তাহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল। পিতৃগৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়।

পূর্ণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস দুই মধ্যেই আমি মুনসেফি পাইয়া ঐ জেলায় ডণ্ডখোবা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্তু জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ৺পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল। কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিলাম। তাহার পর হইতে বর্দ্ধমানে আছি।

সাহিত্য-সেবা ঃ ইং ১৮৭০ সালে ইংরেজী এন্ট্রান্স কোর্সের

নোটস্ লিখিয়া গুপ্তপ্রেসে ছাবাইতেছিলাম, সেই সময়ে সেই প্রেসে একখানি বাঙ্গলা নাটকও ছাবা হইতেছিল। মনে হইতেছে, সেই নাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল; ইচ্ছা হইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম—'উৎকৃষ্ট কাব্যং।' গুপ্তপ্রেসেই তাহা ছাবান হইল।...পুস্তকের মূল্য করিয়াছিলাম ৵১২॥০ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অন্য স্থান হইতে আধলা ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইয়াছিল; কেন না, কেহ তিন পয়সা দিতে আসিলে তাহা লওয়া হইত না।...তাহার পর ১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব বাক্সিনেশন্ আমার প্রিয় সুহৃদ্ 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। 'স্বর্ণলতা'র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি 'কল্পতরু' লিখি। আমার বাসার উঠানে গুটিকতক ফুলগাছের সম্মুখে দূর্ব্বাঘাস লাগাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর দূর্ব্বাবন উৎপন্ন হইয়াছিল; সুশ্যামল, সুদীর্ঘ—বায়ুভরে দোলায়মান তেমন দূর্ব্বাবন আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিয়া সেই দূর্ব্বাবনের উপর মাদুর পাতিয়া,—কবি-হৃদয়হারী সুকোমল সান্দ্র-সুশীতল সেই সুখাসনে বসিয়া, একটী টীনের বাক্সের উপর কাগজ রাখিয়া 'কল্পতরু' লিখিয়াছিলাম। 'কল্পতরু' লিখিতে

১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। 'কল্পতরু' রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন ;...প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পুর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 'কল্পতরু' উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, 'কল্পতরু' ফিরিয়া পাইলাম। তাহার পরে আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাবাইয়া গ্রন্থকার হইলাম।

গ্রন্থ রচনার ঝোঁক থামিয়া গেল। তবে মধ্যে মধ্যে অক্ষয় দাদার (শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার) 'সাধারণী'তে পত্রে-প্রবন্ধ লিখিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্যিক কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করিতাম।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন ওকালতী করি, তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছু কাল আমার বাসা ছিল। এই বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক-সংঘ হইত। এই সংঘে ৺অঘোরনাথ কুমার একজন নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিরিক্ত রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অঘোরনাথ নিত্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবি-কণ্ডূতির উদ্রেক হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে 'ভারত উদ্ধার' লিখিয়া ফেলিলাম।...'ভারত উদ্ধার' বাজারে বাহির হইল ; অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্ত হইয়া, দিবা-রাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল ;—আমার শুভ্র যশোরাশির ভয়ে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলেন। ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলাম,—ভয় নাই,—আর বোধ হয়, আমি লেখনী চালাইব না।...

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি দুই জনে 'হাতে হাতে ফল' নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম। চুঁচুড়াতে তাহা ছাবাও হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যের বাজারে তাহাকে ছাড়া হয় নাই। অক্ষয় দাদার বাড়ীতে সে পুস্তক থাকিতেও পারে।

তাহার পর ঐ বাসাতেই 'পঞ্চানন্দের' সূত্রপাত হয়। অক্ষয় দাদার সঙ্গে একপরামর্শী হইয়া পঞ্চানন্দ লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু কতক কতক লিখিয়া, যাই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাদা তাহা 'সাধারণী'র উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দুই একবার এইরূপ হইবার পর, একবার চুঁচুড়ায় গিয়া দুই জনে এক খণ্ড পঞ্চানন্দ লিখিলাম; তাহা ছাবানও হইল। কিন্তু আমাদের উভয়েরই আলস্য, এবং ঔদাসীন্য রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, একখানি ছাড়া তখন আর পঞ্চানন্দ বাহির হয় নাই।

কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়—ভূধর চট্টোপাধ্যায় নহেন—প্রভৃতি কতগুলি যুবক 'পঞ্চানন্দ' বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা কাগজ চালাইবেন, ছাবাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে আমি লিখিতে সম্মত হইলাম। 'পঞ্চানন্দ' রীতিমত বাহির হইতে লাগিল।

তাহার পর আমি হাইকোর্ট ছাড়িয়া বর্দ্ধমান আসিলাম। বর্দ্ধমান হইতে কয়েক খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' বাহির করিলাম। কিন্তু রীতিমত কাগজ চালান আমার কাজ নহে, ধারা রাখিতে পারিলাম না।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের লাগিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এ আক্রমণে

বস্থজের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাভব স্বীকার করিয়া 'বঙ্গবাসী'তে "পঞ্চানন্দ" দিতে লাগিলাম।

'বঙ্গবাসী'র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই।...

এই ত আমার মাতৃভাষার চর্চ্চা। দুই চারিটা প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছি, কিন্তু ধারা ধরিয়া আর কোনও গ্রন্থ লেখা হয় নাই। তবে দিনাজপুরে থাকিতে 'সিরাজউদ্দৌলা' নামে এক নাটক লিখিয়াছিলাম, তাহা ছাবান হয় নাই। কলিকাতায় কে তাহা আমার নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা আমার মনে নাই। 'সিরাজ-উদ্দৌলা'ও আর আমাকে জ্বালাতন করেন নাই।"—'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১ সাল)।

মৃত্যু

২৩ মার্চ ১৯১১ (৯ চৈত্র ১৩১৭) তারিখে ইন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

'পঞ্চানন্দ'

ইন্দ্রনাথের অতুলনীয় কীর্ত্তি—তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ'। ইহার ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা (পৃ. ২৬) চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ২৬ অক্টোবর ১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। চুঁচুড়া হইতে 'পঞ্চানন্দে'র আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করিলে কালীপ্রসন্ন

বন্দ্যোপাধ্যায় (কাব্যবিশারদ), ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকবৃন্দের উৎসাহে ভবানীপুর সুধাকর যন্ত্র হইতে 'পঞ্চানন্দ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহার ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার (পৃ. ২৬) প্রকাশকাল—২৯ জানুয়ারি ১৮৮০। প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ঢাকার 'বান্ধব' লিখিয়াছিলেন :—

> 'পঞ্চানন্দ। রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন। ভবানীপুর সুধাকর-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'—...দুই তিন বৎসর হইল পঞ্চানন্দ বাঙ্গালা-সাহিত্যগগনে প্রথম উদিত হইয়া, দেখা দিতে না দিতেই, ধূমকেতুর মত দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান। এইবার তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ। (৩য় সংখ্যা, ১২৮৭)

ভবানীপুর হইতে 'পঞ্চানন্দে'র ১০ম সংখ্যা (৩১ অক্টোবর ১৮৮০) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮১ সনের প্রারম্ভে ইন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্ট ছাড়িয়া ওকালতী করিবার জন্য বর্দ্ধমানে গমন করেন। বর্দ্ধমান হইতে 'পঞ্চানন্দে'র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষ দুই সংখ্যা, ১১শ ও ১২শ, যথাক্রমে ১৮৮১ সনের ১৯এ জানুয়ারি ও ৮ই ফেব্রুয়ারি বর্দ্ধমান প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 'পঞ্চানন্দে'র ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার (পৃ. ২০) প্রকাশকাল—এপ্রিল (?) ১৮৮১। ৪র্থ সংখ্যা ৩০ আগষ্ট ১৮৮১ ও ৫ম-৬ষ্ঠ যুগ্ম-সংখ্যা ২০ জুন ১৮৮২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বর্দ্ধমান হইতে বোধ হয় 'পঞ্চানন্দে'র আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

'পঞ্চানন্দে'র বাকী ইতিহাসটুকু আমরা বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়-প্রকাশিত 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> 'বেঙ্গলী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিচারক নরীশ সাহেবকে গালি দেওয়ায় তাঁহার জেল হইল [ইং ১৮৮৩]...দেশময় একটা

হুলস্থুল পড়িয়া গেল।...ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ইন্দ্রনাথের সেই 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকাটুকু আর বাহির হয় না,—বন্ধই হইয়া গিয়াছে। এখন এই হুজুকের সময়ে যদি রসিক ইন্দ্রনাথের রসময় 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসী'তে বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে 'বঙ্গবাসী'র আদর প্রতিপত্তি হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইবে, এই ভাবিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐ হুজুকের আরম্ভেই বৰ্দ্ধমানে গিয়া ইন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রনাথও "সুরেন্দ্রায়ণ" লিখিয়া সানন্দে 'বঙ্গবাসী'র কায়ার সহিত পঞ্চানন্দের ছায়া মিশাইয়া দিলেন। ইহা হইতেই 'বঙ্গবাসী'র সহিত ইন্দ্রনাথের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।...

'বঙ্গবাসী'র প্রথম পঞ্চানন্দ "সুরেন্দ্রায়ণ"। তার পর প্রায়ই 'বঙ্গবাসী'তে ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ বাহির হইত।...ইন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া 'বঙ্গবাসী'তে পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন। পরে যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ এবং গুরুতর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন্দ লিখিতে পারিতেন না, তখন নানা জনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর পঞ্চানন্দ লিখিতেন না।

গ্রন্থাবলী

ইন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল-লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **উৎকৃষ্ট-কাব্যম্।** ১১ শ্রাবণ ১২৭৭ (ইং১৮৭০)।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্। শ্রীমতা গ্রন্থকর্ত্রা এণ্ড কোঙা বিরচিতং। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

"শিশিরে কি ফলে ধান্য বিনা বরিষণে ?
কত লোকে কত বলে সকলে কি শুনে ॥
"যস্মিন্ দেশে যদাচার—"
... ...

১২৭৭—মূল্য (সাড়ে বার গণ্ডা পঞ্চাশ কড়া মাত্র।)

২। **কল্পতরু** (উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (২১ জুন ১৮৭৪)। পৃ. ১৯৫

কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

——Et me fecere poetam
Pierides : * * * * : me quoque dicunt
Vatem pastores ; sed non ego credvius illis ;
Name neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinnt
Digna, sed argutos inter strepre anser olores."

—Virgil.

ক্যানিং লাইব্রেরী ; কলিকাতা। সন ১২৮১ সাল।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'তে এই পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হয় নাই। উহা এইরূপ :—

প্রণয়াধার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়কে এই গ্রন্থ প্রেমোপঢৌকন দিলাম।

"শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?"

দিনাজপুর জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ গ্রন্থকারস্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ সালের পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'কল্পতরু'র যে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়,—মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায়

লিপি-চাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে২ প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লাগিরি"তে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। 'কল্লতরু' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৩। **ভারত-উদ্ধার** (খণ্ড-কাব্য)। ১২৮৪ সাল (২ জানুয়ারী ১৮৭৮)। পৃ. ৪৩।

পর্ব্বোপলক্ষে উপহার। ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত। "One must understand a thing to be abls to enjoy it" "Every man is a caricature of himself when you strip him." কলিকাতা ক্যানিঙ্‌ লাইব্রেরী শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৪।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'ভারতী' (মাঘ ১২৮৪) লিখিয়াছিলেন :—"এই হাস্য-রস উদ্দীপক "মহাকাব্য"খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে শত শত সাধুবাদ দিয়াছি।

বাস্তবিক এরূপ সরস গ্রন্থ আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাব্য (satire) বঙ্গভাষায় আর নাই। ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় বঙ্গ-যুবক কর্ত্তৃক কিরূপে "পাষণ্ড-ইংরাজ" "ঝাঁটায়িত" নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রন্থকার ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।"

৪। **হাতে হাতে ফল** (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২৯ মে ১৮৮২)। পৃ. ৫৯।

হাতে হাতে ফল। (হসন-হাসন।) শ্রীবঙ্গবিলাস সমজ্‌দার প্রণীত। "যেদিকে ফিরাই আঁখি, কৃষ্ণময় সকলি দেখি।" ১২৮৯

ইহার ভিতরের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১২৮৮" আছে। প্রহসনখানি ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সম্মিলিত রচনা,—পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য।

৫। **পাঁচুঠাকুর :**

১ম খণ্ড। ১২৯১ সাল (৩০ আগষ্ট ১৮৮৪)। পৃ. ৩৬২।
২য় খণ্ড। ১২৯১ সাল। পৃ. ১৬৬।
৩য় ভাগ। ১২৯২ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ১৫৬।

"রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই,...। বাঙ্গলায় এখন হাসিবার কিংবা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে ; সে পক্ষে ক্ষমতার দাবী দাওয়া কিছু রাখি না।

একটা সুসংবাদ দিয়া মুখপাতের চূড়ান্ত করিব। শাস্ত্রে আছে কার্য্যভেদে অবতার ভেদ; পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ—অর্থলোভ; অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষা বলিতে হইলে, লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাণ।—"মুখপাত" 'পাঁচুঠাকুরের' প্রথম দুই খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' পত্র হইতে, এবং তৃতীয় খণ্ড 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত কিছু কালের "পঞ্চানন্দ হইতে সঙ্কলিত।

৬। **খাজানার আইন**। অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের প্রজা-স্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। পৌষ ১২৯২ (৮ জানুয়ারি ১৮৮৬)। পৃ. ১৭৬।

সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৭। **ক্ষুদিরাম** (গাল-গল্প)। চৈত্র ১২৯৪ (২৯ মার্চ ১৭৮৮)। পৃ. ১৪২।

ক্ষুদিরাম। গাল-গল্প। (ভগ্নাংশ) শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

কলিকাতা শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯৪ সাল—চৈত্র।

৮। **জাতিভেদ** (সন্দর্ভ)। ১৩১৭ সাল (২ এপ্রিল ১৯১০)। পৃ. ৫০। 'নায়ক' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

৯। **ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী**। ১৫ শ্রাবণ ১৩৩২। পৃ. ৯৩৩।

স্বচী :—উৎকৃষ্ট-কাব্যম্। কল্পতরু। ভারত-উদ্ধার। ক্ষুদিরাম। পাঁচুঠাকুর। অন্যান্য রচনা।

প্রথম তিন খণ্ড 'পাঁচুঠাকুর' ছাড়া, "আর যত পঞ্চানন্দ-রচনা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেনগুলি সঙ্কলিত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম—এই পাঁচ কাণ্ডে পাঁচুঠাকুর—এই গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হইল।"

"অন্যান্য রচনা—'বঙ্গবাসী' ও 'নবজীবন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা হইতে ইন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থাবলীর শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল।" এই বিভাগে 'জাতিভেদ' পুস্তিকাখানি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

ইন্দ্রনাথের তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার সাহিত্যসেবা সম্পর্কে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত'সাহিত্যে' (বৈশাখ ১৩১৮) প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।...

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ইংরাজি হিসাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরাজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায়

বলিতে হইলে, বলা চলে যে, তিনি ইংরাজি ভাষায় একজন পাকা মুন্সী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ সাজেন নাই, ইংরাজি ভাষায় ও সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হন নাই। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; খাঁটী বাঙ্গালীর গৌড়ীয় ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষায় ইংরাজি শব্দের বা স্ফুটোক্তির অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তিনি ইংরাজি ভাবকে খাঁটী বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত 'কল্পতরু,' 'ক্ষুদিরাম' ও 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গ কাব্যে ঝরঝরে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ' নিভাঁজ গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে লিখিত হইত। 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের ভাষা খাঁটী বাঙ্গালা করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন। এই হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ ছিলেন।

খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজীয়ানায় পরিবৃত থাকিলেও, শেষ জীবনে, আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ পরিচ্ছদে প্রায় ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরাজিনবীশ কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই। গোটা ভারত জোড়া দেশহিতৈষণা এবং বাঙ্গালায় নিবদ্ধ দেশপ্রীতির কথা লইয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে তিনি একখনি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহারই কতক অংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"তুমি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র একটু জান; সৌরমণ্ডলের অনুমান তুমি করিতে পারিবে। জান ত, সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া নানা গ্রহ, উপগ্রহ সকল চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ভারতের হিন্দুত্ব এই সূর্য্যসদৃশ। উহারই আকর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশে আকৃষ্ট এবং কেন্দ্র-সংবদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্রভাবে সংস্থিত। হিন্দুত্ব এক, কিন্তু দেশভেদে হিন্দুর আচার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র রকমের। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুত্বের পুষ্টি হইবেই। তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, undefined and indefinite units অর্থাৎ নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কখনও সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়ের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও, পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী, যতি সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করি।"

ইন্দ্রনাথ এই হেতু তাঁহার শেষ জীবনে বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর সমাজের কথা, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কথাই অনবরত ভাবিতেন। বাঙ্গালীর দুঃখে, বাঙ্গালার অধঃপতনে, তিনি অহরহঃ কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তাই আমি তাঁহাকে "বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ" এই আখ্যা দিয়াছি।

এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব। ইংরাজিতে যাহাকে Satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব অতুলনীয় Satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় এক দিকে যেমন ইংরাজি Wit ও Humour দেখান আছে, অন্য দিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ শ্লেষ রঙ্গ কৌতুক উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামর্থ্য যে আমাদের অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও ইন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই তাঁহার সরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুরাগী হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি Satireটাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satiristদিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু De-Quinceyর মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার গাছমরীচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিম বাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে

শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে; পরন্তু বেজায় emotional; নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কষাঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে তখন তাহার এই অপূর্ব্ব Humour এবং নির্ম্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।

ইন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গালায় কদাচিৎ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্ঘের কেন্দ্র-মূর্ত্তি ছিলেন; হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনস্বী সকল উহার সদস্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশে Halley's comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে।" ইন্দ্রনাথের মনীষার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি কথায় যে রূপ ফুটাইয়া ছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে না।

Satirist-এর অবলম্বন *bonhomie* ইন্দ্রনাথের খুবই ছিল। একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে ইন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন,

"ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্ নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠ্তে পারি নে।" উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"যখন অনুমতি পাইলাম, তখন করিব।" কিছু-দিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বাহির হইল, বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে ইন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার হাসির হুলহুলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদনধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাঁহার 'ক্ষুদিরাম' পুস্তিকায় এই শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষুদিরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে; অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাস-কৌশল এমনই অসামান্য যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এবংবিধ হাস্যের কার্পাস আবরণে শোকের অশ্রুধারা তাঁহার 'ভারত-উদ্ধারে' ও 'কল্পতরু'তে আছে; পঞ্চানন্দের বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষে পাওয়া যায়। লেখকের আরাধ্য আদর্শের পরিচয় পাইলে হাসির মধ্যে কান্নার অংশটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ পুরাতন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। অপূর্ব্ব ভাষায় তিনি সেই আদর্শ হইতে চ্যুতিজন্য সামাজিক উদ্ভটতা সকলের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থানে তিনি নিজেই সামলাইতে পারেন নাই, তাই পর্ব্বতপঞ্জর ভেদ করিয়া গিরিতটিনী যেমন বিমল

অশ্রুকণার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে হৃদ্‌গত শোকাশ্রুর দুই এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই হিসাবে তাঁহাকে হেল্‌ভেশিয়সের (Helvetius) ভাষায় Patriot satirist বলা চলে। কর্ণেল চেস্‌নীর *Indian Polity* নামক গ্রন্থ যখন প্রথমে প্রচারিত হয়, তখন 'পঞ্চানন্দ' পত্রে উহার নকলে ভারতশাসনপদ্ধতির এক উদ্ভট পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাতে লেখা হয়, বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি সকলে ভারতশাসন পুঁথির মলাট-সদৃশ। এই মলাটের প্রসঙ্গে পঞ্চানন্দ যে করুণরসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব।

ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব-ব্যাখ্যানে ও হিন্দুত্ব-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ উপার্জ্জনশীল ধনী হইলেও, ইংরাজিনবীশ হইলেও, কালপ্রভাবকে পরাভব করিয়া খাঁটী ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার পুরুষকার অপূর্ব্ব। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে একবার লিখিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মের আলোচনা আর ধর্ম্মের আচরণ—বলা সোজা, করা কঠিন। প্রায় অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তা' আচরণের ভাগ্যে যাহা হইবে হউক, কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারো? অদৃষ্ট আর জন্মান্তর, মৃত্যুর পর মানুষের কি দশা হয়, স্বর্গ নরকের স্বরূপ বা বিশেষ পরিচয় কি?—এই কথাগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে কি প্রকার আছে, তাহা, প্রমাণ সহিত, সংগ্রহ করিতে পারো? পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হইবে। তাড়াতাড়ি কিছুই নাই; কিন্তু নিত্যকর্ম্মের মতন সংকল্প করিয়া অল্পে অল্পে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে কি?"

ইহার পর সমাজের ও অর্থতত্ত্বের কথা কহিতে যাইয়া বর্ত্তমান

প্রবন্ধ-লেখকের লিখিত "কি খাইব ?" প্রবন্ধের অবলম্বনে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"খবরের কাগজে কিংবা গোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে যত কথার আলোচনা হইতে পারে, তাহার মধ্যে "কি খাইব" এই কথাই গোড়ার কথা। অতএব, কথাটা যদি তুলিয়াছ, তবে ছাড়িও না; আগামীতে আবার লিখিও, তাহার পরে, তাহার পরে, তাহার পরে, যত দিন পর্য্যন্ত লোককে না মাতাইয়া তুলিতে পারিবে, তত দিন পর্য্যন্ত লিখিতে থাকো।"

তবে, ক্রমশঃ আরও চাপিয়া লিখিতে হইবে। "কি খাইব" প্রশ্নে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্নপানের কথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার—কর্ম্মমাত্রই উপস্থিত হয়। জীবিকাভেদের সুতরাং জাতি-ভেদের সমুদয় প্রসঙ্গই এ প্রশ্নের টানে আসিয়া পড়ে। অতএব ভুলিও না, কথাটা ছাড়িও না।

কেবল শাস্ত্র-শাসিত সমাজকে অবলম্বন করিয়াও যদি "কি খাইব" বিচার করো, তাহা হইলে কে প্রশ্নকর্ত্তা, ইহা মনে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইও। ব্রাহ্মণে "কি খাইব" জিজ্ঞাসিলে যে উত্তর হইবে, শূদ্রে জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর হইবে না, অন্য উত্তর হইবে। শাস্ত্রাধীন রাজা যখন নাই, তখন প্রশ্নের উত্তরদাতা কে হইবে, তাহাও দেখিও। কেন না, "কি খাইব" প্রশ্নের অভ্যন্তরে "কোথায় পাইব" প্রশ্নও নিহিত আছে।

"কি খাইব"—ইহা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ হইলে, কিংবা হতাশের কাতর-ক্রন্দন হইলে বিচারের বিষয় হয় না। বাস্তবিক মা অন্নপূর্ণার সংসারে কোনও দিনই অন্নের অভাব হয় না, হয় নাই, এবং হইবে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের উপদ্রবে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা হইতেই এখানে ফেলা-ছড়া, আর ওখানে উপবাস হইয়া পড়ে।

ইহা যদি পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারো, তাহা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত অর্থনীতিতে সুবোধের শ্রদ্ধা হইবেই হইবে। শ্রদ্ধার পর আচার ; আর, শ্রেষ্ঠের আচার হইলে ইতরে অনুসরণ করিবেই করিবে।

আয়-ব্যয়, অর্থাৎ অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় আর অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থা—দুই-ই ভাবিতে হয়। ইহা ভাবিতে গেলেই (education) সুশিক্ষা কিসে হয়, সুশিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি কি প্রকার হওয়া উচিত, এ সব বিচার্য্য হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যে এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টসিদ্ধিরই উপযোগী। তাহাতে আমাদের সম্যক্ ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টও হইতে পারে। এ অবস্থায় Education question-এ বিশেষরূপে আমাদের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। সুশিক্ষা যাহাতে সুলভ হয়, স্বল্পব্যয়-সাধ্য হয়, সমাজের প্রকৃতির অনুরূপ হয়, এবং সমাজের বিহিত কর্ম্মের উপযোগী হয়, তাহার উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। বাঙ্গালীর মধ্যে বড় জোর হাজার এম্, এ, বি, এল, কি দুই হাজার B. A.-র পরিশ্রম অল্পাধিক সার্থক হইতে পারে—দেশের ছেলে মরিতে যায় কেন ?

কি খাইব খুব বড় কথা। তুলিয়াছ ; খুব ভাল করিয়াছ। ছাড়িও না। দিন রাত্রি ভাবিও, তথ্য সংগ্রহ করিও—আর লিখিও। যদি দশ বিশ জনকে ভাবাইতে পারো, তোমার জন্ম সার্থক হইবে।”

কর্দ্দিন্যাল নিউম্যানের “সাহিত্যের ধর্ম্ম” শীর্ষক এক উপদেশ (sermon) অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক ‘হিতবাদী’তে এই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ সেই সকল প্রবন্ধ-সমালোচনার ব্যপদেশে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দিয়া এত নূতন কথা বলিয়াছিলেন,

এবং বিষয়টি এতই বিশদ করিয়াছিলেন যে, উহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিবার বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রনাথের বড়ই ক্ষোভ ছিল যে আধুনিক লেখকগণের লিখিত রচনায় ধর্ম্মের ভাব নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিতেন যে ভাষার tone ও instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষা টিকে না। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অনুচিকীর্ষার বনিয়াদের উপর বিন্যস্ত, খোসখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, ইহার বাঁধন ছাঁদন নাই। ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, লেখক পাকা হিন্দু হইতে পারিলে তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ভাষায় ধর্ম্ম নাই, প্রয়োগ-সংযম নাই, তাহা এ দেশে বিকাইবে না—টিকিবে না। এই হেতু তিনি একবার 'পঞ্চানন্দে' লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কুন্ত রাশি, উহা রমণীকক্ষেই শোভা পায়।...তাঁহার মতন লেখক, ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবে না।... ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য যে নিধি হারাইল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

'কল্পতরু' : সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, দুঃখও সেইরূপ। যদি উপর্য্যুপরি ছয় মাস দিন হয় তাহা হইলে, ছয় মাস কাল রাত্রিও হইবে। এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়ান্তরে সেখানে অবশ্যই ছায়া হইবে। অদ্য যে ঘরে আগুন লাগিল, একদিন না একদিন, অবশ্যই তাহার উপর দৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন আছে। কল্য

পরের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার মুখের জল শুষ্ক হইয়া মুখে ধূলি উড়িতেছিল বলিলেই হয়, আজি আবার আমিও গ্রন্থকার—মহারাজ চক্রবর্ত্তী ; "পাঠক !" "পাঠক !" করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কাণ ঝালা পালা করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থাপরির্ত্তনের এতদপেক্ষা সাধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

মধুসূদন আহার সমাপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাটী করিলেন, তথাপি ভাবনার কূল পান না। এমত কালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় আসিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর, লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ ; নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন সুখ, মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যেমন সুখ, এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও অধিক সুখ হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারেন।

বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্ত্তিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শূকর-কেশর-সম্মার্জ্জনীর শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটী প্রকাণ্ড, যেন পান্‌শী নৌকার পিতলের চোখ। কাণের পরিবর্ত্তে, যেন দুর্গাপ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের

পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার-চর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেঁটে, না লম্বা।

কালাপেড়ে ধুতি-পরা নিমুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত; পান চিবাইতে চিবাইতে গবেশ রায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।···

সময় কাহারও হাত ধরা নয়; সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সেনানীর তূরিধ্বনি শুনিলে যেমন সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক, তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া দাঁড়ায়, ঘণ্টার শব্দমাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেইরূপ, গৃহপ্রবেশের জন্য একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আদানপ্রদানের জন্য একটী ছোট দ্বার কাটা থাকে; সেইটি যেমন উদ্ঘাটিত হইল, অমনি একটা মৃতদেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীরের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই সেই দ্বারের দিকে ঝুঁকিল,—অগ্রে টিকিট লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; একটি ছেলে, লোকের চাপে কাঁদিয়া উঠিল; এক জন প্রাচীন, যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল, অপর এক জন "ছোট লোক" তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল।······

গবেশ! তোমার পেটে এত সার! হে অস্মদ্! হে উত্তম পুরুষ! তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্গুলিকে কষ্ট দিতেছ? যে জন্য লিখিতেছ, তাহা কি খুঁজিলে পাইবে? যখন পাইবার হইবে, আপনিই পাইবে। তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" নির্জীব পক্ষীর পালক কে কাটিয়াছে, চিরিয়াছে;

তাহাতে ঘর্ষণ করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহাশয়ের তাড়ায় ছাড়িবে ; তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না? নিজের কিছু অর্থ এবং সুখ্যাতির লোভে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও বলি, ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, যদ্দ্বারা দেশেরও কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়। ইহার মধ্যে একটি অবলম্বন কর, দোষ দিব না। ঐ দেখ পাঠক! বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী, —তাহারাও ত লেখা-পড়া রীতিমত করিয়াছে?—কেমন অজ্ঞান-তিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানি করিয়া মামাত-ভ্রাতাদের (অর্থাৎ সূর্য্যিমামার দেশের লোকের) নিকট দিনে দিনে পরিবর্দ্ধনশীল আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। আরও উপায় আছে; রাধাচরণ থানাদার ঘুস্ লয় না; প্রাণান্তে কাহারও সম্মান করে না, ফল কথা, কাতে পাইলে কাহাকেও ছাড়ে না। তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না? সে বশীভূত হউক না হউক—আর হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত—তোমার ত কাজ হইবে! দেখ দেখি, ভবানীরঞ্জন ঐ পথ অবলম্বন করিয়া কি না করিল? দশ জনে চিনিল, গৌরব বৃদ্ধি হইল, গরিবউল্লার সর্ব্বনাশ করা হইল, নিজের কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব? এমন দশ হাজার সদুপায় আছে। কোনটীই ভাল না লাগে তুমিই উৎসন্ন হইবে।......

রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোখ ফুটিল। কতকগুলা কাক কা কা স্বরে পরামর্শ করিয়া সরল এবং নির্ব্বোধ বালক-বালিকার উদ্দেশে একটা গাছ হইতে উড়িয়া গেল। ইহারা বিলক্ষণরূপে জানে যে, সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাড়ীর

উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া গেল দেখিয়া আনন্দে একটা কোকিল কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কুহু কুহু করিয়া উঠিল; বুঝি সে 'কাকের বাসা কখন খালি হইবে' সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্যাচ ম্যাচ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা হয় বড় ধার্ম্মিক, নয় নিতান্ত দ্বেষপরবশ;—সংসারে ইহাদের মত লোক অনেক। একটি স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর তীরে এই ব্যাপার হইতেছিল। সেই পুকুরের জলে নক্ষত্রকুল সমস্ত রাত্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাছটা অমনি জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল; কি দেখিল, কি বুঝিল, বলা যায় না, কিন্তু তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন উঠিল না। একটা মাছ লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোলপাড় করিতে লাগিল, একজন মাত্র ইংরাজের মুখের কথায় সমুদয় বঙ্গদেশ টলিয়া উঠে;—এ সব পরাক্রমের কাজ। জল চঞ্চল হইল, আর মুখ ভাল দেখা যায় না, এজন্য নক্ষত্রগণ কোথায় সরিয়া পড়িল।

'ভারত-উদ্ধার'ঃ গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি' করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে—

জ্বালাইয়া পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা ; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তা'রা, এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে ; (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তা'রা ত মা মরা !)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ ধ্যান মাতঃ বর্দ্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার।
  কালেজের পড়া শুনা সব করি শেষ,
দু মাস ছ মাস ধরি আফিশে আফিশে
নিতি নিতি যাই আসি ; কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,

ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
ফেকো উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পূরিয়াছে মোর;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে, কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ,
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল,
ধরিয়া বিরাট্ ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে; অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্ত্তমান হেন;—কিসে ভারত-উদ্ধার
করে হৈল কোন্ মতে কাহার দ্বারায়।
স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে,
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্যুক্ত মতে।

আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন।—
"কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ?
হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলি কম্পিত হয়; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরেতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সে দিন আছে? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাও রে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড়;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও, সঙ্গীত;—
আমা হ'তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি।
দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয় বল? কবে ফুরাইবে,
দশ দিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"
... ...

অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি,
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে লোগদীঘি-তটে ;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন ;—"হায়! গত কত দিন
এই ভাবে ; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ, কত কাল রবে,
বঙ্গবাসী পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন র'বে!
সুখের চাকরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুঁতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধনিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি-সাহিত্যের হাটে

বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য,
প্রতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট"-পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না।
অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে।
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে

—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!
—হায় রে দুঃখের কথা, অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি-দেহে।—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"

... ...

বাঙ্গলায় বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন স্বনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।

কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা-নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তা'রা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন' সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী-কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি।

দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন, বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল

হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাহি ;
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে ;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলী ?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি কথা প্রাণনাথ ? এ কি কুলক্ষণ ?"
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি,
"কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায় ; কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুরি, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার ?
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে।"
"তা নয় প্রেয়সি" ব'লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায় রে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি,
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,

শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।”
“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে”—চমকে বিপিন,
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ তা'র কাঁটা দিয়া উঠে—
“দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছ হেন, সহিবে কেমনে ?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে ? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার ?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, ল'ব শিরঃ পাতি ;
আমি তব চিরদাসী।” “ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে ;
নিশ্চিত যাইব রণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।”
“ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?”
“প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,

যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোন(ও) কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।”
“নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,”
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দি চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।”—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।

‘পাঁচুঠাকুর’ঃ লেজ! লেজ!! লেজ!!!—অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা আপনি তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও, তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান্ উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, এমন সময়ে মোক্তার আপন

কার্দ্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন ভিন করিয়া তোমার স্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকিলের বিশেষ দরকারি। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথা মুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না, প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তখন আত্মগরিমায় জখম লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি অপদস্থ হও। একটী লেজ থাকিলে কোনও ভয় থাকিবে না, সময়শিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপনার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও! লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন যোগানো, আর পাড়াপড়সিকে ভোগানো তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি ; কত সভা-সমিতিতে কত দরবারে

তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজে লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মিপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটী লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বরপুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এত দিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধারবার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই তাহা জানি, তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কত দিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজমালা দিবানিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক্ লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই বলিতেছি, গুণরাম, একটী লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের যোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটী লেজ লও!

নগত মূল্যে লইলে এক রস্তা দস্তুরি দেওয়া যাইবে।

পেসাদার এণ্ড কোম্পানি

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

বিজ্ঞাপন।

১ নং

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এন্টী-বোকামি-মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

সঙ্গতি বুঝিয়া বারো অথবা চব্বিশ মাত্রা সেবন করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য। নিয়ম না থাকাই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের

অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন, নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃ-শ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাঁরা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচনা করিতে কাতর হন না, লিণ্ডলী মরের সপিণ্ডী-করণ করিতেছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাকমাশুলের চাপ নাই,
ছোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

'ক্ষুদিরাম'ঃ সংসার নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্ন-আকাশে মরীচিমালী মার্ত্তণ্ডদেব মনের সুখে মজা করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ। রৌদ্রে জগৎ ভাসিতেছে, ত্রিলোক হাসিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। পথিক চলিতেছে, শিশু খেলিতেছে, গাড়ি ছুটিতেছে, কেরাণী খাটিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও বিরহী মাথা কুটিতেছে, কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষোভের তপ্তশ্বাস, কেহ কাজ লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাজের অভাবে ত্রস্ত; কেহ বা পাইতেছে, কাহার বা যাইতেছে, বেচা-কেনা, লেনা-দেনা, সবই হইতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। এই ইহারই মধ্যে সেই যুবা পুরুষ, সেই দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য হইতে হইতে, কত ফেরিওয়ালা কত রকম ডাক ডাকিয়া, কত দিক্ হইতে কত দিকে চলিয়া গেল। তবু সংসার নিস্তব্ধ।

"পয়সে কা পচীস্ সুই"—"সিল্‌বে-জুতিয়ে"—"ইব্-কম্-উও"—"মুংক-ডাল"—স্ফুট, অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট, সুবোধ, অবোধ, দুর্ব্বোধ, নির্ব্বোধ, কত ডাকাডাকি, কত হাঁকাহাঁকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি সংসার নিস্তব্ধ।

ইহাই সংসার। এইরূপই সংসারের নিয়ম। উপন্যাস-লেখকের শব্দবিন্যাস নহে, কবি-কল্পনার অলীক জল্পনা নহে, প্রকৃত সংসার ত এই। যখন একটি পয়সা, কিম্বা এক লক্ষ টাকার চিন্তায় তুমি উন্মত্ত, যখন তোমার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই; যখন না জানিয়া, না শুনিয়া, কিম্বা না মানিয়া তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে পদদলিত করিয়া যাও, যখন তুমি মনে কর যে, এ সংসারে তোমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই,—তখন বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা অন্তরাত্মায় উদিত হইলে "কি করি, সংসার চলে না" বলিয়া তুমি যে উত্তর দাও, সে কোন্ সংসারকে উদ্দেশ করিয়া? ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, গুরুজনের অবজ্ঞা না করিলে, বিলাসে বাধা পড়িলে, কিম্বা অভীষ্টে বিঘ্ন ঘটিলে, সত্যই কি সংসার অচল হয়? সংসার কি তোমারই হাত পা লইয়া চলে? তুমি যখন কর্ম্মক্ষম হও নাই, তখন কি সংসার চলিত না? তুমি ছাড়িয়া গেলে সংসার যদি নিতান্তই ক্রন্দন করে, তাহা হইলে কি অচল হইয়া, স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁদিবে? তাহা নহে। সংসার পূর্ব্বেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে, পরেও চলিবে। যাঁহার সংসার, তিনিই চালাইতেছেন, পরেও তিনিই চালাইবেন। তুমি চলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দিক্, দেশ, কাল,—কিছুই অচল থাকিবে না, সংসার চলিবে। সংসার তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। তবে কেন বল যে "সংসার চলিবে না?"

রামমোহন রায়

(সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—নং ১৬)

প্রমথ চৌধুরী ('সবুজপত্র'-সম্পাদক) লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গলার অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহন রায়,...তাঁর ইংরেজী ও বাঙ্গলায় নানা জীবনচরিত আছে। কিন্তু তার কোনটিই সন্তোষজনক নয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সেইটিকেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করি। লেখক অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যা পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।"—'বঙ্গ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত, ১৯৪৪)।

হরিনাথ মজুমদার

১৮৩৩—১৮৯৬
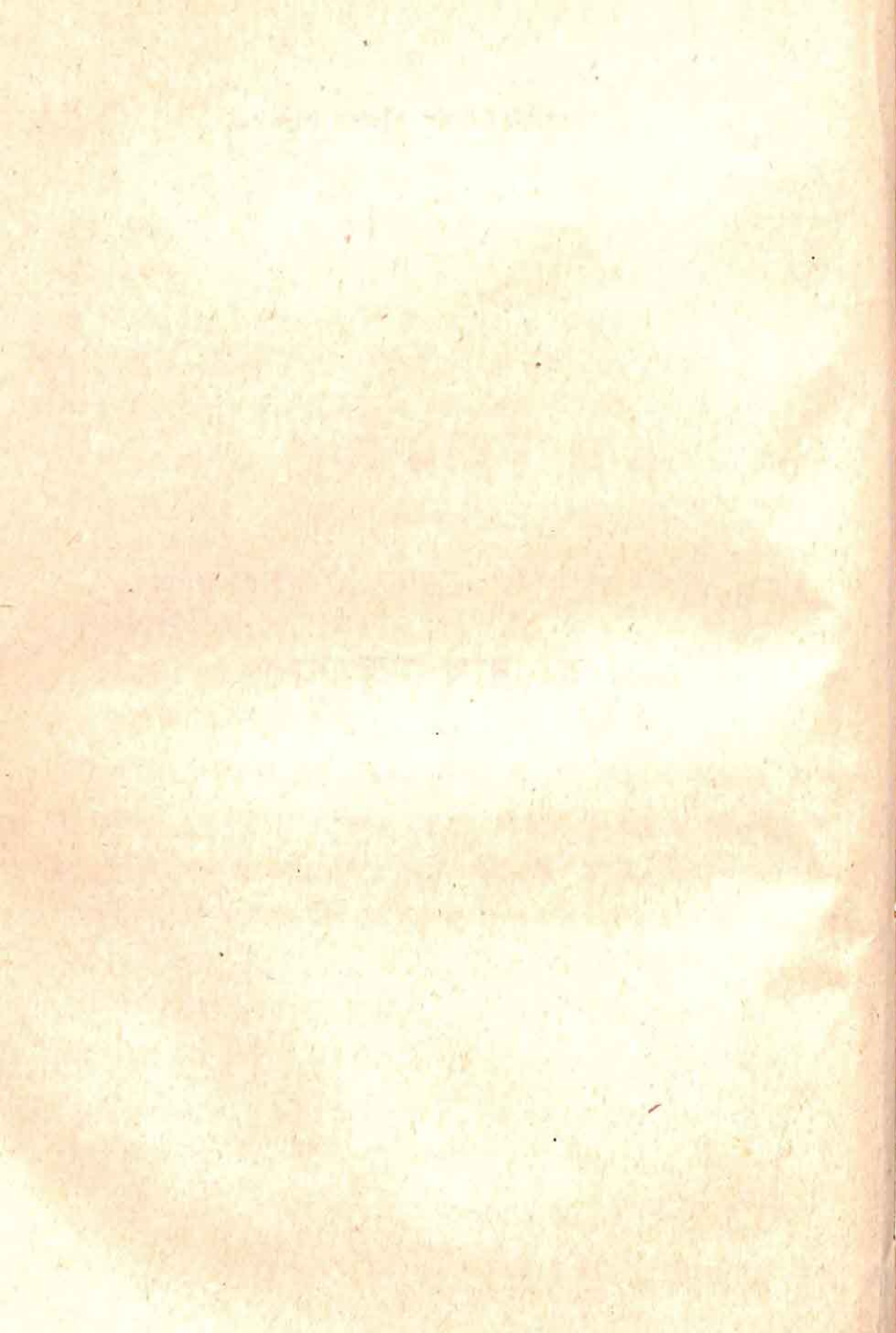
হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫১
পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫৪ ; চতুর্থ সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৬৮

মূল্য—দশ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—১৮.৪.৬১

জন্ম ঃ বাল্য-জীবন

১২৪০ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৩৩) নদীয়ার অন্তঃপাতী কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তিলি-পরিবারে হরিনাথ মজুমদারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর মজুমদার। হরিনাথের বাল্য-জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দারিদ্র্যে পূর্ণ। তিনি "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতা মাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত

তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।" ('গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', ১৩ আষাঢ় ১২৮৫)

স্বদেশ-সেবা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।—বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে না পারায় হরিনাথের মনে ক্ষোভ ছিল। স্বগ্রামস্থ বালকগণের শিক্ষার অভাব তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য তাঁহারই যত্নচেষ্টায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি কুমারখালীতে একটি বাংলা পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। হরিনাথ বিনা-বেতনে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি কেমন করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন:—

"আমার বাল্যসখা মথুরানাথ মৈত্র [অক্ষয়কুমারের পিতা] পাবনা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি অবকাশ উপলক্ষে যখন বাড়ী আসিতেন, তখন আমি তাঁহার নিকট ক্ষেত্রতত্ত্ব, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতাম।...বন্ধু যখন কুমারখালী ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিলেন, তখন আমার পড়ার ও পড়াইবার সুবিধা হইল।"

কুমারখালী বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। হরিনাথকেও আর অধিক দিন একান্তভাবে অবৈতনিক থাকিতে হইল না; তাঁহার মাসিক ১১৲ আয়ের সংস্থান হইল। গবর্ণমেণ্টও বিদ্যালয়টিকে মাসিক ১১৲ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে একখানি পত্র 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ :—

"ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের এস্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিদ্যালয় না থাকায় দ্বেষাচার দেশাচারে সংমিলিত হইয়া কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট না করিয়াছে। গ্রামের এরূপ কুৎসিত অবস্থা একদা ভাবনা করিয়া বিশিষ্ট কুলোদ্ভব শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, বাবু যাদবচন্দ্র কুণ্ডু, বাবু গোপালচন্দ্র শান্ন্যাল এবং বাবু হরিনাথ মজুমদার প্রচলিত রীত্যনুসারে একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন করিতে আপন২ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকাভাবে কিছু কাল ক্ষান্ত থাকিতে হয়। পরে শেষোক্ত সচ্চরিত্র বাবু সঙ্কল্পের বিষয় প্রতিষ্ঠা করণার্থ ১৮৫৫ সালের ১৩ই জানুয়ারি দিবসে বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা পদে বৃত হইলেন। সূচনাবধি কিয়ৎকাল ইহাঁদিগকে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বলিতে কি মনে করিতেও অদ্যাপি আমাদিগের অশ্রুপাত হয়। ক্লেশের অবধি ছিল না, কটু কহিতে কেহ ত্রুটি করেন নাই। সে যাহা হউক ইহাঁদিগকে ধন্য বলিতে হইবে, তাদৃশ অবস্থায় তিতিক্ষা-বলে সে সকলও সহ্য করিয়াছেন, বালকগণ তালপত্র পরিহার পূর্ব্বক সানন্দে পুস্তক হস্তে লইয়া নব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করত দিন২ বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল তদ্দৃষ্টে প্রতিপালকবর্গ যাহার পর নাই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ প্রতিপাল্যদিগকে বিদ্যাভ্যাসে

যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে আয়ের অনটন জন্য শিক্ষকবাবু কিছুকাল অবৈতনিক থাকেন, পরে পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত এচ উড্রো সাহেবের শুভাগমনে দেসহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু, বাবু রামধন মজুমদার প্রভৃতি বিশেষ উৎসুক হইয়া অধ্যক্ষদিগের দানে ও বালকগণের দত্ত বেতনে মাসিক ১১৲ টাকা আয় সংস্থান করেন এবং তদ্বিবরণ শ্রীযুক্ত তত্ত্বাবধারক সাহেবকে অবগতি করিবায় তিনি ১৮৫৬ সালের ৭ই জুলাই দিবস অবধি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১১৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। উক্ত আয়ে বিদ্যালয়টি এক্ষণে একরূপ চলিতেছে, বর্ত্তমান বালক সংখ্যা ৯৫, তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তিন জন শিক্ষক আছেন কিন্তু আয়ের অপ্রতুল জন্য তাঁহারা যৎসামান্য বেতন পাইতেছেন সম্প্রতি আর ৪৲ টাকা দান প্রাপ্তি কারণ আবেদন করা হইয়াছে প্রাপ্ত হইলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বেতন বৃদ্ধি হইবেক,…। শ্রীমথুরানাথ মৈত্র। কুমারখালী ১৮৫৭ সাল, ২৯ আগষ্ট।”

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হরিনাথের বেতন ২০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু হরিনাথ এই টাকা পূরা গ্রহণ করিলেন না। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

“আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে, নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখী হইলাম। এই পনের টাকা পর্য্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন।”

হরিনাথের পরিচালনায় কুমারখালীর বাংলা পাঠশালাটি কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, ‘সংবাদ প্রভাকরে’ (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে :—

"প্রায় পঞ্চ বৎসরাতীত হইল কতিপয় সজ্জনের বিশেষোৎসাহে এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।...কয়েক বৎসর সুপ্রণালীতে বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে নয় জন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সার্দ্ধ বৎসর হইল এই বিদ্যালয়ের ভবনাভাবে ভগ্নাবস্থা হওয়াতে ছাত্রগণেরও আয়ের দিন দিন ন্যূন হইতেছে, তথাচ এ বর্ষ পাঁচ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।...এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের সাতিশয় যত্নে ও অপরিসীম শ্রমগুণে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু সম্পাদক মহাশয়ের অপার সৌজন্যে এই বিদ্যালয়ের এত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই,...। শ্রীদ্বারকানাথ প্রামাণিক। সাং কুমারখালি।"

হরিনাথ স্বগ্রামস্থ বালিকাদের শিক্ষার প্রতিও অবহিত ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় কুমারখালীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৫ এপ্রিল ১৮৫৭) প্রকাশিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে এই সংবাদ জানা যায়। পত্রখানি এইরূপ:—

"এই কুমারখালী গ্রামে ইতিপূর্ব্বে সুপ্রণালীসিদ্ধ বিদ্যামন্দির না থাকায় তন্নিবাসী বালকবৃন্দ আলস্য সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া অন্যান্য জনগণের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিষ্কলঙ্কিত গ্রাম তাহাদের অত্যাচারে নানা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছিল, বিদ্যালোচনা ব্যতীত এই অনিষ্ট নিবারণ কল্পে কি কোন সদুপায় নাই, বিবেচনায়...শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারীতে অত্র গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুজ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৫ সালের ১৩ জানুয়ারীতে তথায় আর একটি বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া

আপামর সাধারণের মহদুপকার করিয়াছেন, এই সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে তাঁহারদিগকে যে কতই কটু কাটব্য সহ্য করিতে ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার পরিসীমা নাই। কুসংস্কারশীল কতিপয় মহাশয়েরা কত বার তাহার সমূলোচ্ছেদ করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উচ্ছেদ না হইয়া বরং অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অমোঘ যত্ন ও উৎসাহ-উৎস উৎসারিত হইয়া বিদ্যা-তরু দিন দিন ফলবান্ হইতেছে, আহা, কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে গ্রামে নূতন প্রথানুসারে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিতে কত ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে ইং ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের যত্নবলে একটি বালিকা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তদনন্তর গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র সকলের বালিকা এই বিদ্যামন্দিরে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হইতেছে! এ বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারো কোন আপত্তি নাই বরং উৎসাহেরই নিদর্শন প্রদর্শন হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যেই যে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে তাহার আর সংশয় কি? শ্রীহরিনাথ মজুমদার। কুমারখালী। বিদ্যোৎসাহিনী সভা।"

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'।—জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল ও গোরা পল্টনের উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জের দুর্দ্দশা দেখিয়া হরিনাথের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি এই সকল অত্যাচারের কথা কখন কখন সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে তিনি পল্লীবাসীদের আর্ত্তনাদ রাজদ্বারে পৌঁছাইবার জন্য নিজেই 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার স্বলিখিত লিপিতে প্রকাশ :—

"এই গ্রামে বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থসম্পন্ন কত লোক আছেন, তাঁহারা মনে করিলে গ্রামবার্ত্তার ন্যায় কত পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন। এত

লোক থাকিতে আমি বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাশূন্য দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? এ কথার উত্তর কে করিবে? তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, কুমারখালীবাসী সম্ভ্রান্ত মহাজনগণ একবার জমীদারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যারপরনাই অপমানিত হন এবং কয়েক হাজার টাকা ঋণ দান করেন; তখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে। আমি স্বচক্ষে নির্দ্দোষ মহাজনগণের অপমানজনিত অশ্রুপাত দেখিয়া, ইহার কোন প্রতিকারের পথ আছে কি না সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতে লাগিলেন, "সংবাদপত্র ব্যতীত এরূপ অত্যাচার নিবারণের আর উপায় নাই"—কিন্তু সংবাদপত্র কি? কিরূপে তাহার কার্য্য চালাইতে হয়, ইহার কিছুই জানি না। বিদ্যা সম্বলের মধ্যে কুমারখালীর ইংরাজী বিদ্যালোক-দাতা বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের দয়া বিতরিত ফাষ্ট নম্বর রিডারের দুই চারিটি গল্প ও তিন চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উপদেশ। কি করি, কি করি, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে বুঝিতে পারি না, অথচ যিনি হৃদয়ে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন, তিনি ছাড়েন না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারখালীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলেন, অনেকে 'খাতাই' ব্রাহ্ম হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ শিরোমণি উপাচার্য্য হইয়া কুমারখালী আসিলেন, তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান হইল, প্রথম খণ্ড হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যত খণ্ড ছিল, তৎসমুদয় পাঠ করিলাম। পূর্ব্বে কেবল স্বভাবতঃ পদ্য লিখিতে জানিতাম, এক্ষণে গদ্যও লিখিতে শিখিলাম। সংবাদ প্রভাকর গতিকে সতিকে আনাইয়া সংবাদপত্র কি এবং তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে

প্রভাকরে লিখিয়া পরিশেষে প্রভাকরের একজন সংবাদদাতা বা লেখক মধ্যে গণ্য হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে নীলকুঠীতে ও মহাজনদিগের গদিতে ছিলাম, জমীদারের সেরেস্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম ; যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিন্সন সাহেব যখন অনুবাদ-কার্য্যালয় খুলিলেন, আমিও সেই সময় গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম।" (১৮৯৬, জুন সংখ্যা 'দাসী' হইতে উদ্ধৃত)।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল (১২৭০, বৈশাখ) মাসে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' প্রকাশিত হয়। ইহা কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

১২৮১ সালের এক সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' দেখিয়াছি ; তাহার মলাটের উপর এই কবিতাংশ মুদ্রিত আছে :—

Some to the fascination of a name
Surrender judgement hoodwinked—

Cowper

১২৭৬ সালের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৮৬৯) হইতে মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' (১১ মে ১৮৬৯) লেখেন :—

"আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কুমারখালীর গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানি পাক্ষিক হইয়াছে। এতৎ পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত হরিনাথ মজুমদার স্বদেশের হিতসাধনে উৎসাহিত হইয়া অনেক ধনবানের শরণ লইয়াছিলেন।..."

১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' আবার সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।*

হরিনাথের অপ্রকাশিত দিনলিপিতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবরণ আছে, উহা হুবহু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে বলিয়া আমরা স্থানে স্থানে বাদ দিয়া নিম্নাংশ প্রকাশ করিলাম :—

"আমি শুনিলাম, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যলয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম।

কুমারখালী বাঙ্গালা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায় (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া

---

* কাঙ্গালের পৌত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন, 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' আরও কিছু দিন পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭১ সালের আষাঢ় হইতে চৈত্র, এবং ১২৭৭ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পাক্ষিক 'গ্রামাবার্ত্তা' তিনি দেখিয়াছেন।

অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভ গ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান্ হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব।···

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন সুতরাং গ্রামবার্ত্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান্ হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং

তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না···

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।···অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া··· পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম।···

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত হইতেছে।

…এত দিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না,… গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে …[১২৭৬] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই।…কুমারখালী নিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি একশত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই এক শত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদয় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রাম-

বাসীদিগের—হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে
পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে
সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন
ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময়
প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার
অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্ম-
নীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকা-
বস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই
আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার
নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত।...

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া
গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা
জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন
ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই
প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার
নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর চাকদহ ও উলা
প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত
উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন
করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রাম-
বার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায়
প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন
করিয়াছিল, আমি তত দূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা
প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম।...

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল,
আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল।

যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।... এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায় চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল।...

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয় শত টাকা ..আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে 'মথুরানাথ-যন্ত্র'* নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান।...

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া

* ইহা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের উল্লেখ আছে।

খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তৎসঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল।...

আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম।"*

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ১২৮৮ সালের চৈত্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালের প্রারম্ভে ("সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাখানি অর্থের অভাবে উঠিয়া গেল"—'সুলভ সমাচার' ৩১ মে ১৮৭৯)। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন প্রভৃতির পরিচালনে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ১২৯১ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

পত্রিকা-সম্পাদনে হরিনাথের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা আদর্শ ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :—

"হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা সত্য সত্যই দেশের মধ্যে "দোষপ্রদোষধ্বান্ত-

---

* কাঙ্গালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার কাঙ্গালের স্বলিখিত লিপি হইতে উদ্ধৃত অংশ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

চন্দ্রিকা" হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের অনাথ প্রজাপুঞ্জের উপকার হইতে লাগিল, কিন্তু অনেকে হরিনাথের শত্রু হইয়া উঠিলেন। হরিনাথ যেরূপ নির্ভীকভাবে "দোষপ্রদোষ" বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথকে হস্তগত করিবার জন্য অর্থলোভন ও তর্জ্জন গর্জ্জন প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। অবশেষে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তায় লিখিলেন,—

'মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্যপালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায়; এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তানগুলি অত্যাচারিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভারত রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া এক দিন না হয় দুদিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা-প্রহার, এ কথা আর গোপন করিতে

পারি না। ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া যে প্রকাশ না করে, আমাদিগের মতে সে-ই রাজদ্রোহী।'

হরিনাথ স্বদেশ সেবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না; তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য পঞ্জাবী "গুণ্ডা" পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইল; অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন; কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন।...

যতদিন "গ্রামবার্ত্তা" জীবিত ছিল, প্রায় তত দিনই কোন-না-কোন-রূপে হরিনাথকে জমিদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। ১২৮৫ সালের ২১ চৈত্র তারিখের একখানি স্বহস্তলিখিত পত্রে হরিনাথ তাঁহার কোনও স্নেহভাজন সাহিত্যসেবক প্রিয় শিষ্যকে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

'জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি যত দূর সাধ্য অত্যাচর করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে অত্যাচারের হাত খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন। এখন আর তাঁহাদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবার্ত্তা যথাসাধ্য প্রজার উপকার করিয়াছে। পরে কি ঘটে, বলিতে পারি না।

জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দামা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচারিত হইলেও গ্রামের লোকে তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ও আমার এত দূরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার!'

যে জমিদারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে যাঁহা জানাইয়া গিয়াছেন তাহাতে যাঁহাদিগের কৌতূহল দূর হইবে না, আমরা তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এ দেশের সাহিত্যসংসারে এবং ধর্ম্মজগতে চিরপরিচিত;—তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে!"—'সাহিত্য', বৈশাখ ১৩০৩।

সাহিত্য-সাধনা

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাথমিক রচনা।—অল্প বয়স হইতেই গদ্য-পদ্য রচনায় হরিনাথের অভ্যাস ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে রচনাদি ও স্থানীয় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি সংশোধন করিয়া স্বীয় পত্রে স্থান দিতেন। ২১ অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রাথমিক রচনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

টাকা

ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, কি কব অধিক॥
রজত কাঞ্চন ছিল, জগত রঞ্জিত।
অঙ্কিত হইয়া তারা, হোলো কলঙ্কিত॥
তোমাকে করিল সৃষ্টি, করিতে সুসার।
অসার হইয়া হোলে, বিবাদের সার॥

তোমার কারণে লোক, লাঠালাঠি করে।
কত শত জমীদারে গেল ছারখারে ॥
তোমার কারণে ঘটে, অঘট ঘটনা।
পুত্র হোয়ে জনকেরে, করে প্রবঞ্চনা ॥
সহোদর তুল্য প্রিয় ত্রিভুবনে নাই।
তোমা হেতু কাটাকাটি, করে দুই ভাই ॥
তোমাতে মাতিয়া দেখ, যত মর্ত্ত্যলোক।
একেবারে হারায়ে, বসেছে পরলোক ॥
টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞান, টাকা বুকে ধোরে।
কত লোক মোরে গেল, টাকা টাকা কোরে ॥
আঁধার ঘরেতে ধন, চাবি দিয়া রেখে।
শুকায়ে মরিছে লোক ফেন মাত্র চেখে ॥
ইহার অধিক আর কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

—*—

তোমা হেতু কত জন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।
অপরের প্রাণ নাশে ধর্ম্ম কর্ম্ম খেয়ে ॥
নিয়ম অতীত কেহ, পরিশ্রম করে।
অকালে কালের গ্রাসে ভুক্ত হোয়ে মরে ॥
আত্মীয় স্বজন তেজি, কত শত জন।
তোমা হেতু করিতেছে, সমুদ্র লঙ্ঘন ॥
কত সদ্বিদ্যাবান, জ্ঞান হারাইয়ে।
রাজদ্বারে দণ্ডনীয় উৎকোচ খেয়ে ॥

কত বুধ মহাশয়, তোমার কারণ।
শাস্ত্রের যথার্থ ভাব, করিছে গোপন ॥
তোমার লোভেতে লোক, পাগলের প্রায়।
পরধন হরি পরে, বেড়ী পরে পায় ॥
তুমি অর্থ একমাত্র, অনর্থের হেতু।
চোকের পর্দ্দা, উল্‌টায়েছ, ভেঙ্গে লজ্জা সেতু ॥
তব গুণ বল্‌তে প্রাণ, জ্বলে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

—*—

টাকা হে তোমার গুণে, কত কাণ্ড হয়।
ব্যাধি হোতে মুক্ত হোয়ে, কত মহাশয় ॥
তোমাকে ত্যজিতে মনে, কষ্ট বোধ করি।
বৈদ্যরাজ ফাঁকি দেয়, সুমন্ত্রণা ধরি ॥
সমূহে রয়েছে ব্যাধি, এই কথা বলে।
মিথ্যাবাদী হোয়ে থাকে, সুজন মণ্ডলে ॥
তোমার কারণে টাকা, বিজ্ঞ কটিক চাঁদে।
ধনী হোয়ে ডাক্তারের, পায়ে পড়ে কাঁদে ॥
এ কথা বলিতে মনে, লজ্জা হয় ভারি।
গেঁটে টাকা পেটে ক্ষুধা, বিড়ম্বনা ভারি ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ, হোয়ে কত জন।
সন্তানের ব্যাধি রাখে, করিয়ে গোপন ॥
টাকার কারণে আর, পুত্র প্রাণাধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

—*—

পরের দৃষ্টান্ত আগে, দিয়ে এতক্ষণ।
নিবেদন করি কিছু আত্ম বিবরণ ॥
হই নাই যতদিন তোমার অধীন।
অচিন্তায় কত সুখে, কাটায়েছি দিন ॥
হৃষ্ট পুষ্ট ছিল কায়, সবল অন্তর।
তিলার্দ্ধের হেতু সুখ ছিল না অন্তর ॥
তোমার অধীন হোয়ে, সে সব গিয়াছে।
বপুরাজ্যে দুর্ভাবনা, রাজা হইয়াছে ॥
ইতিপূর্ব্বে প্রিয়বন্ধু তুষিত সুভাষে।
তোমার কারণ কটু, কহিছে আভাষে ॥
সন্দেহ করিছে কত, আত্ম পরিজন।
ইহা হোতে বরণ্ ভাল, এ দেহ পতন ॥
অল্প দিন হইয়াছি তোমার অধীন।
অসহ্য যাতনা দিয়া দেহ কর ক্ষীণ ॥
সকলি করেছ তুমি, বাকী কি রেখেছ।
বন্ধু বিচ্ছেদের সূত্র, সূচনা করেছ ॥
ইহা হোতে কষ্ট বল, কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপদেশ ও সহায়তায় হরিনাথ ক্রমে সুলেখক হইয়া উঠিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বিজয়-বসন্তে'র নাম সুপরিচিত।

গ্রন্থাবলী। হরিনাথ আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, গীতাভিনয় ও পাঁচালি আছে। হরিনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ আমোদ-

প্রমোদের অভাবে অনেক সময় গ্রামের যুবকগণ বিপথে বিচরণ করিয়া থাকে ; তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি এই সকল নাটক, গীতাভিনয় ও পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকদের দ্বারা এগুলি অভিনয় করাইতেন, কখন বা পাঁচালির দল করিয়া গান করিতেন। ইহার ফলে গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সুনীতি বিস্তারের পথ সুগম হইয়াছিল। তাঁহার রচিত সঙ্গীতের—বিশেষতঃ বাউল-সঙ্গীতের সংখ্যাও বড় কম নহে। 'ভারতীয়-সঙ্গীত-মুক্তাবলী'তে বাংলা গীতিকবিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত স্থান লাভ করিয়াছে। হরিনাথের রচিত পুস্তক-পুস্তিকার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। **বিজয়-বসন্ত** (নীতিগর্ভ উপাখ্যান)। ১৭৮১ শক। (ইং ১৮৫৯)। পৃ. ১০৫।

প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমণ্ডলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম্ম হইতে পতিতা হয়েন। স্ত্রী ছায়াতুল্য স্বামীর অনুগতা, ও সখীতুল্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা, এবং সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা করিবেন। কেন না, এ দেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতিনিন্দা অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা হইবে তথায়, কি সখীর

আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমত স্থানে তিলার্দ্ধ কালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমূদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হয়েন তথাপি পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন, নতুবা পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্ব্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসন্তোষই পরম সন্তোষ সাধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্গবাসিনী হয়েন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিনী হয় সন্দেহ নাই।"

২। **পদ্মপুণ্ডরীক** (পদ্য)। ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬২)। পৃ. ৪২। বালকপাঠ্য। ২৯ পৌষ ১২৬৯ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত। ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নাশের হেতু

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার॥
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি-বিরোধন॥
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি-জাগরণ।
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন॥
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা-আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ॥

সুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ।
সর্ব্বনাশ-হেতু, বালক-বিবাহ ॥

৩। **চারুচরিত্র**। ২৬ বৈশাখ ১২৭০ (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ২০০।

ইহাতে দ্বাদশ শিশুর চরিত্র নানাবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রথম শিশু—অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরুভক্তিপরায়ণ নিষাদপুত্র বটু। দ্বিতীয় শিশু—রণনিপুণ অভিমন্যু। তৃতীয় শিশু—মাতৃভক্তিপরায়ণ ধ্রুব। চতুর্থ শিশু—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ। পঞ্চম শিশু—সূর্য্য-কুল-তিলক ভগীরথ। ষষ্ঠ শিশু—ক্ষমাশীল সিন্ধু। সপ্তম শিশু—ন্যায়পরায়ণ প্রহ্লাদ। অষ্টম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ পুরু। নবম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ বৃষকেতু। দশম শিশু—কৃষ্ণ ও বলরাম। একাদশ শিশু—তত্ত্বজ্ঞানী নিমাই। দ্বাদশ শিশু—পরাক্রমবিশিষ্ট লব ও কুশ।

এই বালক-পাঠ্য পুস্তক প্রথমে **'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ'** নামে ১২৬৯ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ থাকায় পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে 'চারুচরিত্র' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪। **কবিতাকৌমুদী**। মাঘ ১২৭২ (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৪৪।

৫। **বিজয়া** (পাঁচালি)। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। পৃ. ৩০।

৬। **কবিকল্প** (দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক কাহিনী)। ইং ১৮৭০। পৃ. ৫৮।

৭। **অক্রূরসংবাদ** (গীতাভিনয়)। বৈশাখ ১২৮০ (১৬ এপ্রিল ১৮৭৩)। পৃ. ৪৭।

"'কবিকল্প' পুস্তকাবলম্বনে নাটকাকারে যাত্রা বা গীতাভিনয়।"

৮। **সাবিত্রী নাটকা** (গীতাভিনয়)। ১২৮১ সাল। পৃ. ৯০।

৯। **চিত্তচপলা** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)। পৃ. ১৪৮।

১০। **একলব্যের অধ্যবসায়** (বালকপাঠ্য)।

১১। **ভাবোচ্ছ্বাস** (নাটক)।

১২। **কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী।** ১২৯৩-১৩০০ সাল।

এগুলি প্রথমে ১২ পৃষ্ঠা হিসাবে ১৬টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম ১২ খণ্ড একত্রে "প্রথম ভাগ"-রূপে ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। বাকী চারি খণ্ড (১৩-১৬) মিলিয়া দ্বিতীয় ভাগ; তন্মধ্যে শেষ বা ১৬শ খণ্ডটি ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। এই গীতাবলীতে অপরের রচিত কতকগুলি গানও স্থান পাইয়াছে। কাঙ্গালের মৃত্যুর পর, ১৯০৪ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের বাউল সঙ্গীত' (পৃ. ২৩০) নামে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩। **ব্রহ্মাণ্ডবেদ।** ১২৯৪-১৩০২ সাল।

৬ ভাগে প্রকাশিত; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ।

১৪। **কৃষ্ণকালী-লালা** (পাঁচালি)। ১২৯৯ সাল। পৃ. ৩৮।

১৫। **অধ্যাত্ম-আগমনী।** ১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। পৃ. ২৪।

১৬-১৭। **আগমনী। পরমার্থ গাথা।**

১৮। **মাতৃমহিমা।** ১৩০৪ সাল পৃ. ৬০।

১৩০২ সালে রচিত ও কাঙ্গালের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

হরিনাথ গ্রন্থাবলী। ১৩০৮ সাল (৪ নবেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৩২। (বসুমতী)।

সূচী : কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী (সতীশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত) পরমার্থ গাথা, বিজয় বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রূর সংবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস, ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত।

সাহিত্য-শিষ্যগণ। হারিনাথ নিজেই যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, অপরকেও সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-শিষ্যগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,

দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও মীর মশার্‌রফ হোসেনের নাম সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। ইহারা কেহই হরিনাথের সহানুভূতি ও উৎসাহলাভে বঞ্চিত হন নাই।

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীত

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-সম্পাদনের গুরুভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হরিনাথ সাধন-ভজনে মন দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কুমারখালীতে একটি বাউলের দল গঠন করেন; এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই সাধারণের নিকট তিনি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত। জলধর সেন এই বাউলের দল প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালী) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুলমাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই। এই সময়ে এক দিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গ্রামবর্ত্তার 'কাপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার আফিস, অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার, গ্রামবার্ত্তার প্রিণ্টার প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য,

সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির…কাঙ্গালের কুটীরে…কয়েকটি গান করিয়াছিলেন।…সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, বেশ।"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ; কিন্তু গান কোথায়? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই; কচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন, "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।"…অক্ষরকুমার বলিলেন "তার জন্য ভয় কি? ধর্ ত জলদা, কাগজ; বাউলের গানই লেখা যাক।" আমি তখন কাগজ কলম লইয়া বসিলাম।…অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবা নিশি, অবিনাশি, সত্য-পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোঁবে না রে সোনা দানা;
সেই পথে মনোসাধে চল্ রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে দিনে রেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা;
আবার রে ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে, লয় রে কেড়ে সব সাধনা।"

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন, "এত দূর ত হোলো—তার পর?" তার পর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বাললেন, "কথাটা বুঝিলে না। বাউলের গানের নিয়ম হচ্চে এই যে, গানের শেষ একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয়

বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাবছি।"...আমি বলিলাম, "অত গোলে কাজ কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক কোরে দেবেন।" অক্ষয় বলিলেন, "তা হবে না; তাঁকে একেবারে surprise (অবাক) কোর্‌তে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক কোরছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "লেখ্ জলদা!" আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন—

"ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই মিছামিছি পর ভাবনা;
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না।"

বাস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকিরচাঁদ" নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্ম-ভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকিরচাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে না কি। তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি একটু স্থির হ'য়ে কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল্ ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয় আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ...বলিলেন, "আমরা একটা বাউলের দল কোরবো। তার জন্য একটা গান লিখেছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেচিস্? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে; এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।"

আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন ; তাহার পর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান! সে এক অপার্থিব দৃশ্য!

শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন, "দেখ্, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন ; তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন—

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।
পালের ছটা গরু ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল।
আমি, গাদা কোরে নাদা পূরে রে, কত যত্ন ক'রে খোল বিচালি
খেতে দিই ঘরে ;
তারা ছটা যে গুখেকো গরু রে ; তারা, নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর পারি নে
গরু চরাতে ;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীনদয়াল।"

এইটি দ্বিতীয় গান। এই দুইটি গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রাম-বার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—

"ভাব মন দিবানিশি—"

তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে

ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা অশ্রুবর্ষণ করিলেন।...কিন্তু দুইটি গানে লোকের পিপাসা মিটিল না,...তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল; অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর গান বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দ্দার প্রসিদ্ধ গায়ক...প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন,...প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটি গান বাঁধিয়া ফেলিলেন।...গানটি এই—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ রে আমার মন পামরা।

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি ঔষধ আদি দেবে তারা;
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নড়াচড়া।

২। যখন তোর সবশ অঙ্গ অবশ হয়ে, প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা।
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকেডুকে না পাইবে কথার সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস ওরে ঘাটেপড়া;
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াত্ ঘড়া।

৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্যপথে নিত্য-নগরেতে মোরা;
শুনেছি সেই ধামেতে এইরূপেতে মরে নারে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটি রচনা করলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না।...তৃতীয় দিনে যখন এই গানটি লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল।...কাঙ্গালের কুটীর হইতে গানের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌঁছিল তখন লোকারণ্য;...আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি, এমন প্রাণস্পর্শী গানও

আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়নসম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে প্রথম গঠিত হয়।...

এই ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই ভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনতত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনের উপায়স্বরূপ পরমার্থপথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমময় গীতি সকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যত দূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে তত দূর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের গান নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং

নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত, যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা পবিত্রতা রহিয়াছে; অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃত কার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া, হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য আমাকে এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।'

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র কুমারখালী গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না।...সকলেরই অনুরোধ, তাহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার... রাজসাহী চলিয়া গেলেন।...আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম।...আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।"—'কাঙ্গাল হরিনাথ,' ১ম খণ্ড।

এইরূপে বাউল-সঙ্গীতের স্রোত বহিতে লাগিল। "কাঙ্গাল" ভণিতায় হরিনাথ নূতন নূতন গান রচনা করিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতগুলি সাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এগুলি সহজ সরল ভাষায় রচিত ও সাধারণের আয়ত্তাধীন সুরে গীত হইত। আমরা কয়েকটি বাউল-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে, তোমারে॥

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
যাঁদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে।

২

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে
তবে কি মা, এমন ক'রে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পারতে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে ;
তোমায়, ডেকে দেখা পাই নে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ্‌ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ;
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে।

ডাকার মত ডাকা শিখাও
না হয়, দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে ;
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে ॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জান্‌তে ;
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে ॥

৩

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি।

৪

দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ্‌, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা ;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুত এরিতলা ;
কাল আবার কোপনী প'রে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা ;
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা।

কাঙ্গাল কয় পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা ;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা ।

৫

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খর ধার ।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী, সাধু ভক্ত, চড়নদার তার সমুদায় ।
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে ;
হাল ধ'রে তার স্থকৌশলে বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার,
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে,
মনের স্থখে জ্ঞান মাস্তলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে ।
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে
পাকে ফেলে অবশেষে ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে ।
সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি ;
লোণা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়,
স্থবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায় ।
ঠিক না থাক্‌লে হালি, অম্‌নি নৌকা করে গালি ;
গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল ।
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল ;
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ মন আমার,

৬

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর !
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর ॥
কমলের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে, সোনার মাণিক, কিবা সে উজ্জ্বল ;
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধ'রে করেছে লেঠা ;
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥
ফিকির চাঁদ ফকীরে বলে,
সেই সাপকে ধরে বশ করেছে, যে জন কৌশলে ;
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর ॥
(হায় রে পাগল)

জীবন-সায়াহ্নে

হরিনাথের শেষ জীবনের কথা আমরা তাঁহার প্রিয়শিষ্য অক্ষয় কুমারের ভাষায় বর্ণনা করিব। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন :—

"হরিনাথ আবাল্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। যৌবনে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম একটি ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

পাপেতে পৃথিবী ধার।	ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র ॥
ধর্ম্ম তথা নাই আর ॥	কপটতা ধর্ম্ম সাজে।
অনেকে "মিলের" ছাত্র।	পৃথিবী ঢাকিয়া আছে ॥

ধর্ম্ম যদি চাও ভাই। কপটতা পরিহর।
ধর্ম্ম সাজে কাজ নাই ॥ ভাল হও ভাল কর ॥

এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম লাভ করে নাই। ব্রহ্মাণ্ডবেদ নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাঝে মাঝে তাঁহার সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিত, এবং রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে মাতৃমহিমা নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপদেশ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্যসেবকের প্রাণের নিবেদন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইতেছে,—

আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
মরণের দিন দেখ সব ফক্কিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি ॥
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কে চিনিতে পারে।
তবে কেন মর জীব ধন-অহঙ্কারে ॥
পুঁথি পড়, পাজি পড়, কোরাণ পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান ॥
সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন।
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ ॥

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সকলেই জানে।
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে॥
না মানে কুবুদ্ধি, লোক মনে ভরা মল।
আগুনে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল॥
মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা।
ভার্য্যার সমান নাই শরীরতোষিকা॥
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা।
সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিকা॥"

৫ই বৈশাখ ১৩০৩ (১৬ এপ্রিল ১৮৯৬) পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ায় ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৬

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—১৬.৭.৫৬

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৭-১৯১৯

১৩১১ সালে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকে ত্রৈলোক্যনাথের জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে। এই জীবনী প্রধানতঃ তাঁহার স্বলিখিত; ইহাই সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরেজী পাদটীকাগুলি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Abstract of Services....1866 to 1896 [*Prepared on retirement from service*] পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

ইহাঁর পিতার নাম ৺বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। নিবাস ২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রাম।...ইনি ১২৫৪ সালে, ৬ই শ্রাবণ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা খড়দার মুকুটী,—কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।... ত্রৈলোক্যবাবু নিজে চারিটি বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট তিনি একটিও পয়সা গ্রহণ করেন নাই।...

ত্রৈলোক্যবাবু শিশুকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার ভয়ে গ্রামের অনেকে শশব্যস্ত থাকিত।...কিন্তু দুষ্টামি করিয়াও ত্রৈলোক্যবাবু ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নূতনতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। কাষ্ঠফলকে ও মাটির চাক্‌তিতে সেই বর্ণমালা

সংযোজিত করিয়া, বালক ত্রৈলোক্যনাথ আপন মনে নানাবিধ, অস্ফুট গান, হেঁয়ালি, শ্লোক প্রভৃতি রচনা করিয়া, কোন রকমে তাহা ছাপিতে লাগিলেন। ইহাঁর বয়স তখন অনুমান নয় বৎসর। সেই সব বর্ণমালা,—পিটম্যানের "সংক্ষিপ্ত লেখার" সহিত অনেক মিলিয়া যায়। এই পিটম্যনের সঙ্কেতের সহায়তায় এক মিনিটে এক শত আশীটি কথা লেখা গিয়া থাকে।

গ্রামের স্কুলে ও পাঠশালায় ত্রৈলোক্যনাথের শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৫৯ সালে গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ হুগলী-চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, ৬০ সালে ডবল প্রমোশন পাইয়া ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হন, ৬১ সালে কিছু দিনের জন্য ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়েন। পুনরায় ঐ ডফ সাহেবের স্কুলে আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৬২ সালে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে ইহাঁর পিতামহীর পরলোক ঘটে; পরে মাতা এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন।...এইখানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়া শেষ হইল।

ত্রৈলোক্যবাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এখন ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র অভিভাবক—পিতার জ্যেঠাই এবং মার পিসী। ত্রৈলোক্যনাথের বয়স ঐ সময় চৌদ্দ-পনর বৎসর। ত্রৈলোক্য-বাবুর জ্যেষ্ঠ, শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়; ইনিও সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত।* ত্রৈলোক্যবাবু মধ্যম। তাঁহার নীচে আর চারিটি ছোট ভাই। সকলেই এই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত। ইহাঁদের পৈতৃক

* ২৭ জুন ১৮৪৩ তারিখে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার লিখিত এই কয়খানি পুস্তকের নাম জানা যায়:—১। শরৎশশী, ২। বিজ্ঞান-দর্শক, ৩। চিত্তচৈতন্যোদয়

জমিসমূহ প্রজাবিলি ছিল। বাগান-বাগিচা ও গাছ-পালাও কিছু ছিল, কিন্তু ১৮৬৪ সালের ঝড়ে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। সংসারে বড় কষ্ট। রোগে, দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালে জানুয়ারী মাসে বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। তিনি মানভূম-পুরুলিয়ায়, আত্মীয় শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা করেন। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে গেলেন। তখন পয়সা ফুরাইয়া গেল। রাণীগঞ্জ হইতে মানভূম তিন দিনের পথ। বন, জঙ্গল, পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এই পথ হাঁটিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাণীগঞ্জে ইনি দামোদর নদ যখন পার হন, তখন একটি হিন্দুস্থানী চাপরাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাপরাসীর সহিত আলাপ হইল। ত্রৈলোক্য-বাবু বলেন—"আমায় চাপরাসী বলিল, আসামে গেলে তোমার ভাল চাকরি হয়, এবং আমি তোমায় পাঠাইতে পারি।" ত্রৈলোক্যনাথ সম্মত হইলেন।

চাপরাসীর সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। চাপরাসীর বাটীতে মস্ত একটা দল তাঁহাকে আটক করিল। সেখানে অনেক নীচ-জাতীয় স্ত্রীপুরুষ ছিল; তাহারা মাদল বাজাইয়া গান করিতেছিল। এক দিন পরে চাপরাসীর রক্ষিতা একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের দয়ায়

(কবিতা, ২৮ মাঘ ১২৭৪, পৃ. ৩৬), ৪। বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার (কাব্য, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ. ১৩৯), ৫। হরিদাস সাধু। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান (১২৯০ সাল, পৃ, ৩২), ৬। বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (১২৯৩ সাল, পৃ. ৩-৬৯৬) রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 'সোমপ্রকাশ,' 'কল্পদ্রুম,' 'আর্য্যদর্শন' ও 'জন্মভূমি'তে রঙ্গলালের অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যবাবু কুলি-চালান হইতে উদ্ধার পান। সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমাকে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবে, তুমি বলিও 'আমি যাইব না'।" ৫।৬ দিনের পরে চাপরাসী, কুলিগণ সমভিব্যাহারে ত্রৈলোক্যবাবুকে লইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবু পথিমধ্যেই পলায়ন করেন। পুনরায় তিনি মানভূমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাস্তায় বন্য কুলের গাছ ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ কুল খাইয়াই দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইনি মানভূমে পঁহুছিলেন। ইহাঁর আত্মীয় ইহাঁকে স্কুলে দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে ছোটনাগপুরের কমিশনরের আদেশে রাঁচির মেলা দেখিবার জন্য যাত্রা করিতে হইল। রাঁচি মানভূম হইতে পাঁচ দিনের পথ। পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল দিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্যবাবুও বালকদের সহিত গেলেন। সকলে গরুর গাড়ীতে গমন করিলেন। মানভূমের ডেপুটি কমিশনর এবং আমলাবর্গ এই সঙ্গে গমন করেন। ত্রৈলোক্যবাবু বলেন,

"স্কুলের মধ্যে আমলারাই অভিভাবক। ২।৪ দিনের মধ্যে বালকদের আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলকে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, মা'র কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম। ইহাতে বালকগণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাদিনে রাঁচি পঁহুছিলাম।

"কিন্তু অল্প দিন পরেই রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু'জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্যপ্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছু দিন পরে জঙ্গলের মাঝে এক দিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচি আসিলাম। রাঁচি হইতে আবার মানভূমে আসিলাম। কিন্তু স্কুল ছাড়িয়া দিলাম, বর্দ্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানের রেফাকয়ুদেন নামক এক জন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। তাঁহার নিকট পার্সী শিক্ষা করিলাম। অল্প দিনে পন্দনামা, আমদনোমা, গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম।

"বাড়ীর কষ্ট সর্ব্বদাই মনে জাগিত। পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। অল্প দিনের জন্য ইছাপুর গ্রামে একটিনী করিলাম। চারি মাস পরে সে কাজ গেল। গ্রামের জনৈক আত্মীয় যশোহর জেলায় কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। যশোহর-কোটচাঁদপুরে যাইতে পারিলে, দু'পয়সা হইতে পারে, তিনি এইরূপ ভরসা দেন। কোটচাঁদপুরে গেলাম। কন্‌ট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটী আসিলাম। আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ে বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর অব-স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাষ্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন; সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি

কিছু দিতেন ; কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।...

"রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ী ফিরিয়া আসিয়া...বৰ্দ্ধমানের দিকে চলিলাম। ৫।৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। অতিকষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ শুভকার্য্য হইয়াছে ;—ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্গোপ। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনৰ্জ্জীবিত হইল। পুনরায় বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।..."

ত্রৈলোক্যবাবু বৰ্দ্ধমান গিয়া হরকালীবাবুর কাছে শুনিলেন, তাঁহার পিতামহী অত্যন্ত পীড়িতা। ত্রৈলোক্যনাথকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা কাঁদিতেছেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথের হাতে একটিও পয়সা ছিল না। হরকালীবাবুর নিকট চাহিলে যদিও তিনি পথখরচ দিতেন,—যদিও পূৰ্ব্বদিন অনাহারে ছিলেন, তথাপি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রৈলোক্যবাবু বলেন,—

"সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম, দু'দিন আহার হয় নাই ; অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি ; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, ত কাল প্রাতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে

লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুলগাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন,—আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। এক জন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম। দিদিমা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

"কিছু দিন পরে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাষ্টারি করিলাম। আত্মীয় হরকালীবাবুর চেষ্টায় এ কাজ হয়। অল্প দিনের মধ্যে রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায় বদলি হইলাম। এ স্থানের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইলাম।* বেতন ১৮৲ টাকা। এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। রাত্রি দিন লোকের কাতর-ক্রন্দনে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। অস্থিচর্ম্মসার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় নর-নারী—বালক-বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়ার দুর্গন্ধে পথ-চলা ভার হইল! বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রারম্ভ—অতিশয় ক্ষুধা। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম,

---

* 1866-67 ; Served as Second master in the Okra and Head-master in Dwarka Government Aided Schools.

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারত-ভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্দ্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখ-মোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড় জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব-দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্য্যে কয় জনের দৃষ্টি আছে?

"ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি পরিচিত হই। উখড়ায় থাকিতে তাঁহার নিকট হইতে সহসা পত্র পাই যে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর স্থানে তাঁহার জমিদারীতে স্কুলমাষ্টারির পদ খালি আছে—বেতন ২৫৲ টাকা। আমি সে স্থানে গমন করিলাম। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামগুলি এক একখানি দ্বীপের ন্যায় দেখিতে হয়। যে দিকে চাহিবে, জল ও নৌকার মাস্তুল। স্থানান্তরে এমন কি অন্য বাড়ীতে যাইতে হইলেও, নৌকা করিয়া যাইতে হয়। এক দিন নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখি, একটি সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়; ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল,—সেই স্থানে তিনটি

অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই,—কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না,—কেবল ঘাড় কাঁপাইতে থাকে, কোথায় বাড়ী কে তাহারা, কি করিয়া তাহারা এই মাটির ঢিপিতে আসিল, কে তাহাদিগকে ফেলিয়া গেল,—তাহার কিছুই তাহারা বলিতে পারে না। ভাবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাগিকে আহার দেয় না, কেহ তাহাদিগের খোঁজখবর লয় না। কয় দিন তাহারা এই ভাবে সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে অতিশয় শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আমার নৌকায় তুলিয়া সাহাজাদপুরে আনিয়া আমি তাহাদিগকে যত্ন করিতে লাগিলাম। ইহাতে নায়েব মশায় অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ইহারা ত অল্প দিন পরেই মরিবে; মরিলে ফেলিবে কে? তুমি ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তাহারা যেখানে ছিল, সেইখানে রাখিয়া এস।" আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না। কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বিষয় লইয়া সে স্থানের কোন ক্ষমতাবান্ লোকের সহিত আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। অল্প দিন পরে পূজার ছুটিতে বাটী আসিলাম। ছুটির পর কুষ্টিয়া হইতে নৌকা করিয়া পদ্মা দিয়া স্যহাজাদপুরের দিকে যাইতেছিলাম। প্রথম দিন একটি চড়ার মাঝখানে নৌকা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর আমি রন্ধন করিতেছিলাম; হঠাৎ নিকটে একটি নিশ্বাসের শব্দ হইল। আমি ভয়ে দৌড়িয়া নৌকার উপর উঠিলাম; মাঝিরা বাঁশ লইয়া সেই দিকে গিয়া তাড়া দিল। কি একটা গিয়া জলে পড়িল, এইরূপ শব্দ হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মাঝিরা

বলিল, বোধ হয়, জল হইতে কুমীর উঠিয়া আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার নিশ্বাস পড়িল, তাই আমি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইলাম। পরদিন প্রাতে নৌকা ছাড়িলাম।

"ইতিপূর্ব্বে বাদলা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। পদ্মায় অতিশয় তুফান উঠিয়াছিল। কিছু দূর গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এক স্থানে তিনখানি বড় নৌকা লাগিয়াছিল; আমরা সেইখানে গিয়া নৌকা লাগাইলাম। পদ্মার নিজ ধারেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ; তাহার পরে গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উত্তর দিক্ হইতে বহিতেছিল। তুফানও অতিশয় বাড়িল। কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না। কিন্তু ঘোর কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলাম যে, তুমুল ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকের ঝড়ে আমাদের নৌকাকে ক্রমাগত পদ্মার মাঝখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। লগী পুতিয়া, দড়ি বাঁধিয়া আমরা নৌকা রক্ষা করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু লগী উঠিয়া যায় দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। আমাদের নিকট যে কয়খানি নৌকা ছিল, ঝড়ে একে একে তাহাদিগকে দূরে লইয়া ডুবাইয়া দিল। শেষ বড় নৌকাখানি বায়ুবেগে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। দুইখানি নৌকাই একেবারে নক্ষত্রবেগে পদ্মার মাঝখানে চলিল। অল্পক্ষণ পরেই নৌকা দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। আমাদের নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। কিন্তু চার দিক হইতে মাটি ভাঙিয়া পড়িতেছিল। একবার আমার নিকটেই দশ-বার হাত মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন মাটি চাপা পড়িবার ভয় হইল। কষ্টে পাড়ের উপর উঠিলাম। উঠিতেই ঝড়ে আমাকে ঠিক উড়াইয়া না হউক, ঠেলিয়া লইয়া চলিল; আর একবারে পদ্মার ভিতর ফেলিয়া দিল। পুনরায়

বাতাসে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমিও বায়ুর সহিত অতিকষ্টে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটি ছোট গাছ দেখিতে পাইলাম। আগ্রহের সহিত গাছটি ধরিলাম। হাতের চারি দিকে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বুঝিলাম, গাছটি চারা বাবলা গাছ। সে গাছ ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি ঝোপ পাইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। তাহার ভিতর শুইয়া পড়িলাম। অতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। আর কিছুই জানি না।

"যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে, দিন হইয়াছে। একজনদের বাটীতে পড়িয়া আছি। বাটীর স্ত্রীলোকেরা আমার গায়ে আগুনের সেক দিতেছে। ক্রমে যখন জ্ঞান হইল, তখন শুনিলাম যে, যাহাদের বাটীতে আছি, তাহারা জাতিতে চণ্ডাল। গ্রামের নাম বুলচন্দরপুর। পাবনা হইতে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। প্রাতঃকালে বাটীর পুরুষেরা, জলনিমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবার প্রত্যাশায় পদ্মার ধারে গিয়াছিল। ঝড় তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে চলিতেছিল। বায়ুবেগে পদ্মা হইতে জল উঠিয়া, তুমুল বৃষ্টির ন্যায়, উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িতেছিল। যে ঝোপের ভিতর আমি পড়িয়া ছিলাম, আশ্রয়ের নিমিত্ত চণ্ডালেরা সেই স্থানে প্রবেশ করে। মৃত অবস্থায় আমি পড়িয়া রহিয়াছি, দেখিতে পায়। গলায় পৈতা দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া, মাঠ পার হইয়া তাহারা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া আইসে। তাহার পর যত্ন করিয়া আমার পুনরায় চৈতন্য উৎপাদন করে। তিন চারি দিন পরে যখন কিঞ্চিৎ সবল হইলাম, তখন পাবনার দিকে যাত্রা করিলাম।

"কাদামাখা সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া, এক-ছুট অবস্থায়, আমার একটি আত্মীয় বৈদ্যবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের

বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।...তিনি পাবনায় কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে তিনি বহরমপুরে আছেন। ললিতকুড়ি অথবা অন্য কোন বাঁধের তিনি ইঞ্জিনিয়ার। ৪।৫ দিন তাঁহার নিকট রহিলাম। তিনি আমাকে কাপড় চোপড় কিনিয়া দিলেন। পাবনায় নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার সহিত আলাপ হয়। ইহারা দুই জনেই আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। রাখালবাবু আমাকে খরচ দিয়া বাটী পাঠান। তখন বাটীতে কেহই ছিলেন না; বীরভূম জেলায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট সকলেই ছিলেন। বাটী আসিয়া আমার জ্বর-বিকার হইল; কোনরূপে রক্ষা পাইলাম।

"বর্দ্ধমানের হরকালীবাবু তখন কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাই তাঁহার নিকট যাইবার বাসনায় বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। হাতে যাহা টাকা-কড়ি ছিল, নৌকা-ডুবিতে সে সমুদয় গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে টাকার নিমিত্ত পত্র লিখিলে, পাছে তিনি একেলা কটকে যাইতে না দেন, সেই ভয়ে তাঁহাকে লিখিলাম না। ধার করিতে মাথা কাটা যায়, সে নিমিত্ত ধারও করিলাম না।

"যৎসামান্য খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিড়া, নুন আর লঙ্কা খাইয়া দিন যাত্রা করিতে লাগিলাম। শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়া গেল। সে দিন খণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একবারে ১৯ ক্রোশ রাস্তা চলিলাম। মহানদী সাঁতার দিয়া পার হইলাম। হরকালীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইলাম। অল্প আরোগ্যলাভ করিলে তিনি আমাকে পুলিসের সব ইন্‌সপেক্টরী করিয়া দিলেন।*

---

* 1868-70: Beginning of Pensionable service. 5th May, 1868. Served as Sub Inspector of Police in the Cuttack District.

প্রথম আমাকে কাওয়াজ শিখিতে হইয়াছিল। অল্প দিন পরে কেঁউঝরের লড়াই উপস্থিত হইল। আমাকে তথায় যাইতে আদেশ হইল। কিন্তু প্লীহা জ্বর হওয়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিয়া আসিবার পর, ভুঁইয়া, জোয়াঙ্গ, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পরাস্ত হইল। বিচারে কাহারও ফাঁসি হইল, কাহারও বা দ্বীপান্তর হইল। আরোগ্য লাভ করার পর আমি থানার দারোগা হইলাম। কখন বা কোর্টে কাজ করিতে লাগিলাম। এই সময় জাজপুর, ওলাবয়, কেঁদারাপাড়া প্রভৃতি স্থানে দারগা-গিরি করিয়া ভ্রমণ করিলাম। কার্য্য সম্বন্ধে লেখা পড়া উড়িয়া ভাষায় করিতে হইত;—১৫ দিনের মধ্যে একরূপ চলন-সই উড়িয়া ভাষা শিখিলাম। ঐ ভাষায় যত ভাল পুস্তক আছে, ক্রমে সব পড়িলাম। তাহার পর কিছু দিন "উৎকল শুভকরী" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিলাম।*

"আমাদের যেমন কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত আছে, উড়িয়া ভাষায়ও এ শ্রেণীর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কেবল ভাষায় নহে, উড়িয়াবাসীর প্রতাপও দোর্দ্দণ্ড ছিল। ইহাদের পরাক্রমে কত বার, এক দিকে তৈলঙ্গ, অপর দিকে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণকে

---

* এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়; ইহার নাম ছিল—'উৎপল পত্রিকা'।   শকের পৌষ-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ:—"উৎকল পত্রিকা। এই মাসিক পত্রিকাখানি উৎকল ভাষায় কটক হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, উড় জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। কটকে একটী বাঙ্গালীদিগের ব্রাহ্মসমাজ আছে, তদ্ভিন্ন উড়দিগের নিমিত্ত একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি তাহারই মুখ স্বরূপ। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।"

পরাস্ত হইতে হয়। দুই দিক্ হইতে এরূপ আক্রান্ত হইয়াও উৎকল-বাসীরা সাড়ে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাঁহারা উড়িয়াদিগকে এক্ষণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কণারক, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরমন্দির, কাঠজুলীর বাঁধ প্রভৃতি ইহাদের কীর্ত্তি আজও দেদীপ্যমান।

"এই সময় আমি উৎকল ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লোক যত এক হয় ততই ভাল। আমার এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা উঠাইয়া দিয়া, এ প্রদেশে হিন্দী প্রচলন করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে বঙ্গভাষা সম্প্রতি অনেক উন্নতি করিয়াছে, হিন্দী করে নাই। চৈতন্যচরিতামৃত লেখার কালে, ও কাজ অনায়াসে হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, উৎকল ভাষা উঠাইতে কৃতকার্য্য হই নাই; লোকের কেবল বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। কটকে থাকিতে সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাধারণীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা ৺গঙ্গাচরণ সরকারও আমাকে অতিশয় আদর করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে বলিতেন, 'যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।'

"একদিন কটকের কাছারির বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন। সে স্থান হইতে আমরা দুই জনে রোমান কাথলিক গির্জ্জায় একটি বিবাহ দেখিতে যাইলাম। পরস্পরে সদ্ভাব হইল। সাহেব কলিকাতা হইতে কটকে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সার উইলিয়ম হণ্টার। তাঁহার তুল্য দয়াবান্ ভদ্রলোক

আমি দেখি নাই। বিলাতে থাকিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত ভারতের দীন দরিদ্রের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে ইংরেজের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তেজস্বী বাক্যে তিনি ইংলণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হণ্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। অল্প দিন পরে তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। ১২৫৲ টাকা বেতনে তিনি একটি চাকরি দিয়া কলিকাতা আসিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে হণ্টার সাহেবের আফিসে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।* হণ্টার সাহেব ও তাঁহার মেম আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। আমি ঠিক তাঁহাদের ঘরের লোকের মত ছিলাম। তাঁহারা আমার কত আবদার, কত উপদ্রব যে সহ্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ১৮৭৫ সালে হণ্টার সাহেব বিলাত গেলেন। তিনি আমাকে বিলাত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায় আমি সে বার বিলাত যাইতে পারিলাম না। যদি যাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

"ইংলিশম্যান আফিসে সণ্ডার্স ও বার্কেলে সাহেব আমাকে লইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সদাশয় হণ্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য

---

*1870-75 : Served as Second Literary Assistant and Head Clerk in the office of Compiler of Bengal Gazetteers, subsequently Director-General of Statistics to the Government of India.

Assisted in the Statistical Survey of Bengal.........Assisted in the compilation of the *Bengal MS Records*.

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনে 'আর্য্যাবর্ত্ত-রীতি-বোধিকা' নামে ১৬ পৃষ্ঠার একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক এবং আমাদের আলোচ্য ত্রৈলোক্যনাথ অভিন্ন হওয়া সম্ভব।

আফিস হইতেছিল। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখানে হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করি।* সার এডওয়ার্ড বক্ এই আফিসের কর্ত্তা। পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা সুহৃৎ আমার আর নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দুই তিন ইংরেজের কাছে কাজ করিয়াছি, তাহারা সকলেই উদারচরিত্র। বক্ সাহেবের আফিসে থাকিতে আমি দেশের উপকারের নিমিত্ত নানারূপ কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিই ;—

"উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য্য গঠিত হইত। যথা—কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা পিত্তলের কাজ ইত্যাদি ; লক্ষ্ণৌয়ের—গোটা, চিকণ, সূচের কর্ম্ম, সোনারূপার কাজ, বিদরীর কাজ ; মুরদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম ; নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন ; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, ও কিরূপে পাওয়া যায় তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্নকষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষিকার্য্যে অগ্রসর হইতেছিল। এই কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক্ সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম। বক্ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ

---

* 1875-81 : Served as Head Clerk, Department of Agriculture and Commerce, N.-W. Provinces and Oudh ; subsequently, promoted to Head Superintendentship ; finally made Personal Assistant to the Director.

Assisted in the compilation of the N.-W. Provinces Gazetteer.

সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্য ক্রয় করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম। আমি নিজে হোটেল-স্বামী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই হোটেলে বিলাতযাত্রী সাহেব-মেমগণ দুই এক দিন অবস্থিতি করিতেন। দেশে বন্ধুবান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব-বিবিরা এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেল-স্বামী এক জন ধনবান্ লোক। তাঁহার চক্ষু ফুটিল, গবর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে লাগিলেন।"

…১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়।…এই সময়ে [১৮৭৮] ত্রৈলোক্যবাবু জানিতে পারিলেন, গাজোরের চাষ করিয়া ও গাজোর খাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণ প্রাণে বাঁচিতে পারে। প্রতি বিঘায় কত গাজোর হয়, চাষাদের ক্ষেত খুঁজিয়া তাহা স্থির করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বদিন কে কি খাইয়া দিনপাত করিয়াছিল, ত্রৈলোক্যবাবু তাহার তত্ত্ব লইলেন ; দুর্ভিক্ষ-সময়ে গাজোর যে অতি উপকারী সামগ্রী, তাহা স্থির করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা গেজেটে ছাপাইলেন। দুর্ভিক্ষ-সময়ে, যাহাতে তাড়াতাড়ি গাজোরের চাষ করিয়া লোকে প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট জেলায় জেলায় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। দুই বৎসরের পরে রায়বেরেলী, সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল। সেই সময় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া যাইত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে, এই গাজোরের জন্য সে-বার জনপ্রাণী মরে নাই।…

১৮৮১ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগে ত্রৈলোক্যবাবুর চাকরি হয়। উত্তর-পশ্চিমের শিল্পের উন্নতির জন্য পূর্ব্বে ইনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমুদয় ভারতের শিল্পকার্য্যের যাহাতে, উন্নতি হয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম, ভারতে কি কি দ্রব্য হয়? দ্বিতীয়—এই সব দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়? তৃতীয়, কি মূল্যে পাওয়া যায়?—এই সকল কথা লিখিয়া তিনি সামান্য একখানি পুস্তক ছাপাইলেন। এই সামান্য পুস্তকের তালিকার গুণে ইউরোপীয়গণের চক্ষু ফুটিল। ইহার প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের লোক লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। সাহেবরা আপনাদের কারুকার্য্য বিক্রয় করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে টাকা লন, কিন্তু আমাদের কারুকার্য্য বেচিয়া সাহেবদের নিকট হইতে কিরূপে টাকা লইব, সে বিষয়ে ত্রৈলোক্যবাবুর বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তিনি এ পর্য্যন্ত অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৮২ সালে হলাণ্ডদেশে আমষ্টার্ডাম্ নগরে এক মহামেলা হয়। গবর্ণমেণ্ট ত্রৈলোক্যবাবুকে ঐ মহামেলায় যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায়, তিনি যাইতে পারিলেন না। এই সময়ে অকারাদি বর্ণানুক্রমে ত্রৈলোক্যবাবু ভারতে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন।*

---

*1881-87 : Transferred to the Revenue and Agricultural Department of the Government of India in September, 1881. Served as 2nd Grade Assistant : officiated as 1st Grade Assistant ; gazetted as "Officer in charge of the Indian Exhibits for the Amsterdam International Exhibition" (24 Aug. 1882), and again

১৮৮৩ সালের কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কোন কোন বিষয়ের অধ্যক্ষভার ত্রৈলোক্যবাবুর প্রতি অর্পিত হয়। নানা দ্রব্যাদি বিচার করিয়া মেডেল দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক জন বিচারকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এইবার ত্রৈলোক্য-বাবুকে বাধ্য হইয়া বিলাত যাইতে হইল। দেশের বহু উপকারের সম্ভাবনায় তিনি গেলেন। বিলাতে সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিল। মহারাণী ও রাজপুত্রগণ এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে অনেক আদর করিয়াছিলেন। বিলাত গমনকালে কয়েক জন উদারহৃদয় সন্ন্যাসী সাধুর নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিলাত গিয়া নিজের স্বার্থের দিকে তিনি একেবারে দৃষ্টি রাখিবেন না। বিলাতের কোন কোন বড়লোক তাঁহাকে উচ্চ পদ পাইবার নিমিত্ত ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের নিকট চিঠি দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহা লইলেন না। এবার বিলাতে তিনি দশ মাস কাল অবস্থিতি করেন।···

ইংলণ্ড হইতে ত্রৈলোক্যবাবু স্কটলণ্ডে গমন করেন। স্কটলণ্ড হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, পরে ফ্রান্স, জার্ম্মণী—তথা হইতে অষ্ট্রিয়া, পরে ইটালী গিয়া ভারতে

---

subsequently gazetted as "Officer in charge of the Exhibition Branch of the Government of India." (16 March 1883.)

1881-82 ; At the request of the Honourable Member (Sir Rivers Thomson ?) then in charge of the Department, published for Government a work entitled "A Rough List of Indian Art-manufactures."

প্রত্যাগমন করেন। অল্প দিন পরেই কর্ম্মোপলক্ষে পুনরায় তাঁহাকে তিন সপ্তাহের জন্য বিলাতে যাইতে হয়। ত্রৈলোক্যবাবুর *Visit to Europe* গ্রন্থে সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

বিলাত হইতে আসিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে জয়পুর আসেন। তথায় তিনি তাঁহার আত্মীয় জয়পুরের দেওয়ান পরলোকগত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

ত্রৈলোক্যবাবু ১৮৮৬ সালে রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে চাকরি গ্রহণ করেন।* এই চাকরি করিতে করিতে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে *Art Manufactures of India* নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে দেশের অনেক শিল্পীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থ হওয়ায়, ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে তিনি পেন্সন লন।

মৃত্যু

ভগ্নস্বাস্থ্য ত্রৈলোক্যনাথ শেষ জীবনে পুরীর সমুদ্রতীরে, বাস করিতেছিলেন। তথায় ৩ নবেম্বর ১৯১৯ (১৭ কার্ত্তিক ১৩২৬) তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

*1887-96 : Service in the Indian Museum. Assistant Curator in charge of the Bengal Economic and Art Museum collections (1 April 1887).

During the last two years, under the special order of the Government of Bengal, I prepared two Monographs, viz., one on the "Brass and Copper manufactures" and the other on the "Pottery and Glassware" of Bengal.

গ্রন্থাবলী

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ বাংলা রচনা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ও বঙ্গবাসী-কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পাদি ছাড়া ভারতে স্বর্ণ, লৌহ পাথুরে কয়লা, ইস্পাত, এড়ী রেশম, গজ-দন্ত প্রভৃতির তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ তিনি 'জন্মভূমি'তে প্রকাশ করিয়া পাঠক-সমাজকে উপকৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **কঙ্কাবতী** (উপকথার উপন্যাস, সচিত্র)। ১২৯৯ সাল (১৪ নবেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ৩০১।

২। **ভুত ও মানুষ** (গল্প, সচিত্র)। (১৩ জানুয়ারি ১৮৯৬)।

স্থচী :—বাঙ্গাল নিধিরাম ('জন্মভূমি,' অগ্রহায়ণ ১৩০০),* বীরবালা ('জন্মভূমি,' পৌষ ১২৯৯—সচিত্র), লুল্লু ('জন্মভূমি,' পৌষ ১২৯৮—সচিত্র), নয়নচাঁদের ব্যবসা ('জন্মভূমি,' শ্রাবণ ১৩০২—সচিত্র)।

৩। **ফোকলা দিগম্বর** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০৭ সাল (৪ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ১৯৫।

---

* ইহার উপসংহার-স্বরূপ ত্রৈলোক্যনাথ "রূপসী হিরণ্ময়ী" ('জন্মভূমি,' মাঘ ১৩০০) লিখিয়াছিলেন। এইটি এবং "আমার সেই অমূল্য মণি" ('জন্মভূমি,' শ্রাবণ ১৩০৫) তাঁহার কোন গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

৪। **মুক্তা-মালা** (উপন্যাস)। ইং ১৯০১ (৭ জানুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ৩২০।

৫। **ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা।** ইহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ও অভাব। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। পৃ. ২৪+১৪৬।

অমৃতলাল সরকারের সহযোগে সঙ্কলিত।

৬। **ময়না কোথায়!** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩১১ (১৬ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১৫৪।

৭। **মজার গল্প।** ১৩১২ সাল (১৩ এপ্রিল ১৯০৬)। পৃ. ১৭২।

সূচী :—সোনা-করা জাদুগরের গল্প, ভানুমতী ও রুস্তম, জাপানের উপকথা, পূজার ভূত, পিঠে-পার্ব্বণে চীনে ভূত, বিদ্যাধরীর অরুচি, মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি, একঠোঙা ছকু।

৮। **পাপের পরিণাম** (উপন্যাস)। ১৩১৫ সাল (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ২৯৯।

৯। **ডমরু-চরিত** (গল্প)। ইং ১৯২৩ (১০ আগষ্ট)। পৃ. ১৯৭।

ত্রৈলোক্যনাথ 'বিজ্ঞানবোধ' (ইং ১৮৯৬), 'নীতিশিক্ষা,' 'বিজ্ঞান শিক্ষা' প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরেজী গ্রন্থ : ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

1. *A Descriptive Catalogue of Indian Products* contributed to the Amsterdam Exhibition 1883, Cal. 1883, pp, 190.

2. *A Hand-Book of Indian Products* (Art Manufacturers and Raw Materials). Cal. 1883, pp, 175.

3. *A List of Indian Economic Products* compiled from the Catalogue of Economic Products of India, exhibited in the Economic Court, Calcutta International Exhibition, 1883-84, Cal. 1884, pp. 93.

4. *Art-Manufacturers of India* (specially compiled from the Glasgow International Exhibition 1888) Cal. 1888, pp, 451.

5. *A Visit to Europe* (with a Preface by N. N. Ghose, Bar-at-Law), Cal. 1889, pp, 404.

ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

ত্রৈলোক্যনাথকে আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে ব্যঙ্গ ও আজগুবি রসের ক্ষেত্রে কয়েক জন সাহিত্যিক খ্যাতনামা হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং তাঁহার যথাযোগ্য আসন পান নাই। এইরূপ হইবার কারণ, সাহিত্যিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়। বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে এক জন প্রবীণ কৃতবিদ্য অধ্যাপক কিছু কাল পূর্ব্বে যে সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁহারও পাকা দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা, আধুনিক বিচারকদের দরবারে পুনর্বিচারের জন্য ত্রৈলোক্যনাথ যথেষ্ট নথিপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। বসুমতী-কার্য্যালয় সুলভে তাঁহার গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ তাঁহার 'কঙ্কাবতী,' 'ভূত ও মানুষ,' 'ডমরু-চরিত' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠ করেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বাংলা-সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন রসের সন্ধান পাইবেন। বাংলা ভাষায় এমন আজগুবি ও ভূতুড়ে গল্প আর কেহ রচনা করিতে

পারেন নাই। ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত এমন এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি যে কেমন করিয়া এমন সহজ সরল সরস বাংলা গল্প লিখিতে পারিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহার কর্ম্মোদ্যম ও পাণ্ডিত্য এক দিন 'বিশ্বকোষ' রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনিই বাংলা দেশের বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসর-বিনোদনের জন্য এমন বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার জুড়ি আজ পর্য্যন্ত মিলিল না। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সরস হইয়াও নির্দ্দোষ। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ নির্দ্দোষ রসিকতা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৭

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২. ৮. ৫৬

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৭—১৮৮৭

জন্ম : বংশ-পরিচয়

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাল্‌নার সন্নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস রামেশ্বরপুর। রামনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরসুন্দরী দেবীর গর্ভে গণেশচন্দ্র,* রঙ্গলাল ও হরিমোহনের জন্ম হয়।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, আট বৎসর বয়সে, রঙ্গলাল পিতৃহীন হন। তিনি সহোদরগণের সহিত মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল অপুত্রক রামকমল মুখোপাধ্যায় অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে

---

* গণেশচন্দ্র ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণের কনিষ্ঠা কন্যা বরাঙ্গী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। গণেশচন্দ্রের এই তিনখানি কবিতা-পুস্তকের নাম জানা যায়:— ১। **চিত্তসন্তোষিণী**। শ্রীকৃষ্ণলীলা। ১২৭০ সাল। ১৯২০ সংবতের শ্রাবণ-সংখ্যা 'রহস্য-সন্দর্ভে' সমালোচিত। ২। **কৃষ্ণবিলাস**। ইং ১৮৬৪। হরিমোহন ভ্রাতা রঙ্গলালকে ১২-৯-৬৪ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"দাদার 'কৃষ্ণবিলাস' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক বাহির হইয়াছে।" ৩। **ঋতুদর্পণ**। ইং ১৮৬৪। ১৯২১ সংবতের মাঘ-সংখ্যা 'রহস্য-সন্দর্ভে' সমালোচিত।

রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবেশ করেন। কিছু দিন পরে তিনি স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে, উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে রামকমল ভাগিনেয়দিগকে চুঁচুড়ায় নব-প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসীনের কলেজে (হুগলী কলেজে) ভর্ত্তি করাইয়া দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

বিবাহ

আনুমানিক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, পঠদ্দশায় রঙ্গলাল মালিপোতার সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী ৺দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখালদাসী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। রঙ্গলালও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সহোদরগণের সহিত মাতুল রামকমলের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

সরকারী চাকরী

রঙ্গলাল দীর্ঘকাল রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার চাকুরীর বিবরণ দিতেছি :—

১৮৬০, মার্চ ... ছয় মাসের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা-সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপক।

১৮৬০, নবেম্বর ... নদীয়া জেলায় ইন্‌কম্ ট্যাক্স অ্যাসেসার ও ডেপুটি কলেক্টর।

১৮৬৩, প্রথম ভাগ ... বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কলেক্টর।

১৮৬৪, ১৫ নবেম্বর … ২০০৲ বেতনে কটকের স্থায়ী ডেপুটি কলেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৬৭, ৭ই ফেব্রুয়ারি ৩০০৲ বেতনে ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত।

১৮৬৯, ১৩ ফেব্রুয়ারি … হুগলী, জাহানাবাদে স্থানান্তরিত। ১৮৭০, ২৫ নবেম্বর হইতে বেতন ৪০০৲।

১৮৭৩, ২১ এপ্রিল … দ্বিতীয় বার কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর।

১৮৭৯, ৬ মার্চ … হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর। ১৮৮১, ১১ জানুয়ারি হইতে এক বৎসর তিন মাসের ছুটি।

১৮৮২, ১১ এপ্রিল … অবসর গ্রহণ।

মৃত্যু

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর রঙ্গলালের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিবার পর ১৩ মে ১৮৮৭ তারিখে, গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি কাটাইয়া পরলোক গমন করেন।

১৩৩০ সালে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি অমৃতলাল বসু তাঁহার অভিভাষণে রঙ্গলাল সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঈশ্বর গুপ্তের "মিউটিনী" প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশ-হিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।

সাহিত্য-সেবা

প্রাথমিক রচনা।—তরুণ বয়সে রঙ্গলাল অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কাঞ্চীকাবেরী' পুস্তকে (পৃ. ১০৩, পাদটীকা) প্রকাশ:—"আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতাচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।" শৈশবে তিনি যাত্রা-গান শুনিতে ভালবাসিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি নিজেও কোন কোন যাত্রার পালা ও গান রচনা করিয়াছিলেন; এই সকল রচনার কিছু কিছু নিদর্শন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'রঙ্গলালে' পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় আসিয়া রঙ্গলাল কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন। গুপ্ত-কবির 'সংবাদ প্রভাকর'ই তখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাংলা সংবাদপত্র। রঙ্গলাল ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

> কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার

সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।

রঙ্গলাল 'সংবাদ প্রভাকরে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ১৪ এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহাতে প্রকাশ :—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহাঁর সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহাঁর মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রাথমিক গদ্য-পদ্য রচনাগুলি বর্ত্তমানে সংগ্রহ করা দুরূহ। আমরা 'সংবাদ প্রভাকরে'র যে-সকল পুরাতন সংখ্যা দেখিয়াছি তাহা হইতে রঙ্গলালের রচনাগুলি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবারও উপায় নাই; কারণ, রচনার শেষে সচরাচর লেখকের নাম মুদ্রিত হইত না। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত (৩০ অক্টোবর ১৮৫৬) রঙ্গলালের একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

রূপক।

প্রভাত।

ত্রিপদী

মৃণালাভা ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা,
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি॥
কিবা তরুলতাচয়, ঢলঢল রসময়,
নীহারের হার শোভে গায়।
ভানু সহ সরলতা, করি সরোরুহলতা
অন্তরের অনল নিবায়॥
কুমুদ মুদিল আঁখি, জাগিল যতেক পাখি,
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।
মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে,
সুশীতল করিল পরাণ॥
প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর,
নিনাদ নীরদ করে শোভা।
কালিন্দী প্রবাহে যেন, কোকনদবৃন্দ হেন,
মধুকর মত্ত মনোলোভা॥
কাননে ডাকে পাপিয়া, করি পিয়া২ পিয়া,
প্রিয়া প্রিয়গণেরে জাগায়!
বিধু আর নাহি রবে, নিধুবনে জাগ সবে,
অনুভব, এই রব গায়॥

সুসার উষার কাল, বালরূপে ভানু ভাল,
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার।
তাহে দূতী [দ্যুতি ?] দূতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে,
ধরণীতে করিছে প্রচার॥
বিভা গতে বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
চলেছেন অতি দ্রুতগতি।
বিকাশে কুসুম কলি, সৌরভ গৌরবে অলি
মাতিয়াছে সচঞ্চল গতি॥
দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাঁতি
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে।
অথবা সুবর্ণ শরে, যামিনীরে বিদ্ধ করে,
কার্য্য সিদ্ধ করণ আশয়ে॥
অরণ্যে অরুণ আস্য, দেখিয়া বিলাসে লাস্য,
আমোদে মাতিল মৃগকুল।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, নাচিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
কত খায় তৃণাদির মূল॥
যামিনী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ,
আর চোর পেচক প্রভৃতি।
কুণ্ঠিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন,
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি॥
শিশিরে করিয়া স্নান, শস্যক্ষেত্র হাস্যবান,
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ।
আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন,
অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ॥

কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোপিতেছে চারা,
কেহ হল করিছে ধারণ।
গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,
মাঠে মাঝে [মাঠে ?] করে গোচারণ ॥
ঝিল্লি হোয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে।
বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী,
পিকবর ললিত কুহরে ॥
হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি,
সারা রাত্রি ছিল দীপ্তিমান্।
যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,
অনুরাগে মোহিত পরাণ ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা, স্বতনু তনুর আধা,
পরস্পর করে হেন জ্ঞান।
কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে,
মনে তাই করয়ে ধ্যায়ান ॥
হেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন,
তরঙ্গে স্বরঙ্গে কেলি করে।
মরাল করাল স্বরে, কিবা সন্তরণ করে,
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে ॥
ডাহক ডাহকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাঁকে,
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ।
কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল,
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ ॥

হেরিয়া বালার্ক মুখ, অন্তর্ধান হোলো দুখ,
সুখ আসি আবির্ভাব কত।
ব্রহ্ম আরাধনে রত, ব্রহ্ম উপাসক যত,
হেরি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত আগত॥
মোহন প্রণব শব্দ, কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন, গর্ব্ব পর্ব্বত ভঞ্জন,
পৃথিবী পূরিল ভাববশে॥

র, ল, ব,

জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী ও বহুবাজার দত্ত-পরিবারের উমেশচন্দ্র দত্ত গোল্ডস্মিথের ও পার্নেলের "The Hermit" নামক কবিতাদ্বয়ের উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য ১০৲ ও ৩৫৲ টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেন। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ (১৩ মে ১৮৫৮) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, রঙ্গলাল উভয় পারিতোষিকই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা "সর্ব্বতোভাবেই উত্তম" হইয়াছিল ; উহা 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়।

রঙ্গলাল বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সেই সংবাদপত্র সম্পাদনে ব্রতী হন। তাঁহার পরিচালিত পত্রিকাগুলির পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি :—

'সংবাদ সাগর'ঃ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে, 'সংবাদ রসসাগর' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২৫ জুন ১৮৪৯ তারিখে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' লেখেন :—

We were not aware of the existence of a weekly publication in Bengalee, under the designation of *Rusa Saagara*, till last Tuesday, when we had the pleasure of receiving the fifteenth number of the paper,...It is published at Molunga in the house of the editor Baboo Khettermohun Banerjea.

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'সংবাদ রসসাগর' সাপ্তাহিক হইতে বারত্রয়িকে পরিণত হয়। ইহার অল্প দিন পরে—১৫ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হইলে রঙ্গলালই 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন।*

রঙ্গলালের সম্পাদনায় 'সংবাদ রসসাগর' খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল পত্রিকার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সংবাদ সাগর' রাখেন। 'সংবাদ সাগর' ১২৫৯ সালের চৈত্র মাস (এপ্রিল ১৮৫৩) পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। রঙ্গলাল "কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত 'সংবাদ সাগর' পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ" হন।

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ': ইহার পর আমরা রঙ্গলালকে কিছু দিন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' সম্পাদন করিতে দেখি। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—"The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone." রেঃ ও'ব্রায়েন স্মিথ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার সহকারী হইলেও রঙ্গলালই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং লেখেন:—

* রঙ্গলালের চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, "ক্ষেত্রমোহন 'রসমুদ্গার' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন,...রঙ্গলাল প্রথম হইতে উক্ত পত্রের ['রসসাগরে'র] সম্পাদক ছিলেন।"

The Government Education Department have issued, during the last four years, a weekly newspaper ; the *Education Gazette*, edited by Rev. W. Smith, and Baboo Rangalal Banerjea, which has a circulation of 550 copies in different Zillahs of Bengal.—Returns relating to Publications in tie Bengali Language, in 1857...(1859), p. v.

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে রঙ্গলাল অন্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, অন্ততঃ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

Education Gazette.—We are glad to perceive that His Honor the Lieut. Governor has sanctioned for another year, increased contribution of Rs. 270 per mensem towards the support of this really useful journal which has been conducted with great ability by Mr. O'Brien Smith, and Baboo Rung Lall Banerjee.—*The Indian Field* for Septr. 20, 1862.

'উৎকল দর্পণ' : পরবর্ত্তী কালে উড়িষ্যায় প্রবাসকালে রঙ্গলাল 'উৎকল দর্পণ' নামে একখানি ওড়িয়া সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া- ছিলেন। বলা বাহুল্য, ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল।

গ্রন্থাবলী : রঙ্গলালের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি।—

১। **ঋতুসংহার** (পদ্যানুবাদ)।

৮ মার্চ ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—"ঋতু সংহার। মহাকবি কালিদাস প্রণীত ঋতুসংহার যাহা মৎকর্ত্তৃক বঙ্গীয় পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া প্রকটিত হইবেক। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

পুস্তকখানি শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহা আমাদের জানা নাই।

২। **বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ।** ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯ (ইং ১৮৫২)। পৃ. ৫১।

"এই প্রবন্ধ বীটন সভয়ে [১৩ মে ১৮৫২] পঠিত হয়; সুতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে।" ১০-সংখ্যক 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'য় পুনর্মুদ্রিত।

৩। **ভেক মূষিকের যুদ্ধ।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ৩৩।

"এই উপকাব্য, পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছিল।...ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃস্বরূপ আদি মহাকবি হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু ঈলিয়ড্ ও অডেসি খ্যাত অনুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রণেতা হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক প্রবোধের পথ আছে, যে, যে মহাসমুদ্র প্রবাল মৌক্তিকাদি রত্ননিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধান হইয়াছেন, সেই রত্নাকর শক্তি শম্বূকাদি সামান্যতম জলজন্তুনিকরেরও আকর স্বরূপ! ফলত ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ শুক্তি শম্বুকাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি সামান্যতর নয়নমনোহনুরঞ্জনকারি নহে। ভেক মূষিকের মূলকাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার মাধুর্য্যরসে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মর্ম্মানুবাদ তাঁহাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব ছটার প্রতিবিম্ব, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত।"—ভূমিকা।

৪। **পদ্মিনী উপাখ্যান।** আষাঢ় ১২৬৫ (ইং ১৮৫৮)। পৃ. ১১৫।

Padmini, / *A Tale of* / *Rajasthan* / পদ্মিনী উপাখ্যান। / রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ। / শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত। / কলিকাতা: / সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৫।

"১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, 'বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।' প্রত্যুত, স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা ;—

'আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মন-পদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥'

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্য নিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।—আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম। তদনন্তর উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কল্প পরিহার করি। কিন্তু কাল সহকারে ইহ জগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সন্তাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল পুনর্ব্বার পদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তি পরে শ্রীযুত রেবরণ্ড ডবল্যু ওব্রাএন স্মিথ তথা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি,—তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাক্যুলর লিটরেচর সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থে বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমোদ্যোগ পদবীতে আমি

পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ত্তস্থ।...

কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি; তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা প্রসূত নহে। আমার এস্থলে একথা লিখনের তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ, ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষাবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক। পরন্তু এই উপলক্ষ্যে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাবগ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশমতে

কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে।” —ভূমিকা।

৫। **শরীর-সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন।** ? (ইং ১৮৬০)। পৃ. ৬০।

“নূতন গ্রন্থ।—শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীরসাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হেঅর বার্ষিক সমাজের পুরস্কার ফল।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২০ আগষ্ট ১৮৬০।

৬। **কর্ম্মদেবী।** ইং ১৮৬২। পৃ. ১১১।

“রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চরিত্র।…বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুকীর্ত্তিত।”

৭। **শূরসুন্দরী।** ইং ১৮৬৮ (১৬ নবেম্বর)। পৃ. ৮৬।

“রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র।”

৮। ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ **প্রবাদমালা।** ২য় ভাগ। ইং ১৮৬৯ (১২ ডিসেম্বর)। পৃ. ৯৬।

এই পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ রেঃ জে. লং যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

The following contains a free Translation into Bengali by Babu Ranga Lal Banerjea of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badagar, Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages...Calcatta, November, 15, 1869.

৯। **কুমার-সম্ভব**। ১ ভাদ্র ১২৭৯ (১৫ নবেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ১১৯।

ইহাতে কুমার সম্ভবের প্রথম সাত সর্গ ও অষ্টম সর্গের সন্ধ্যা-বর্ণনাটি "বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুবাদিত" হইয়াছে। রঙ্গলালই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ করেন। পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

"আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতিনীতি আচার ব্যবহারাদি পরিহার পূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষি-মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণ করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে; প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই।...

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দো-বিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি, অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয়; জলযন্ত্র-নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নিদ্রাকর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত।"

১০। **কবিকঙ্কণ চণ্ডী।**

হিতবাদী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত 'রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী'র "রঙ্গলালের জীবনী" অংশে (পৃ. ২৫০) লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্গলাল "মেদিনীপুর হইতে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।" অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রকাশকালে "বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ" ব্যবহার করিয়াছিলেন ('সাধারণী,' ২৮ চৈত্র ১২৮২ দ্রষ্টব্য)।

১১। **কাঞ্চীকাবেরী।** ইং ১৮৭৯ (১২ জানুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ১৫৫।

"উৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান-বিশেষ।…বিবিধ ছন্দো-বন্ধে বিরচিত।"

১২। **রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী।** ১৩১২ সাল। পৃ. ২৫২। (হিতবাদী)

সূচী :—পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী, কুমার-সম্ভব, কাঞ্চীকাবেরী, নীতি-কুসুমাঞ্জলি, রঙ্গলালের রচনা, রঙ্গলালের জীবনী, কবির বংশ-তালিকা।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রঙ্গলালের যে-সকল রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহার কয়েকটির নির্দ্দেশ দিতেছি :—

উৎকল বর্ণন (প্রবন্ধ)	'রহস্য-সন্দর্ভ'	১ম পর্ব্ব, ৫ম-৭ম খণ্ড।	ইং ১৮৬৩।
দীনকৃষ্ণদাস (প্রবন্ধ)	"	২য় পর্ব্ব, ১৫ খণ্ড।	ইং ১৮৬৪।
উপেন্দ্রভঞ্জ (প্রবন্ধ)	"	ঐ ১৬ খণ্ড।	ঐ
উদ্ভট সঙ্গ্রহ	"	ঐ ১৮ খণ্ড।	ঐ

স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ (কবিতা) 'রহস্য-সন্দর্ভ' ৩য় পর্ব্ব, ২৬ খণ্ড। ইং ১৮৬৫।
কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী
সভায় শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা " ৪র্থ পর্ব্ব, ৪২ খণ্ড। ইং ১৮৬৬।
পদ্ম পুষ্পের প্রতি (কবিতা) " ঐ ৪৭ খণ্ড। ইং ১৮৬৭।
ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ
প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি
ভারতভূমির অভ্যর্থনা ... 'বঙ্গদর্শন,' আশ্বিন ১২৮২।
নীতিকুসুমাঞ্জলি ... ঐ পৌষ-চৈত্র ১২৮২।

পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রথম অঞ্জলি"তে ১০৩টি ও ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় "দ্বিতীয় অঞ্জলি"তে ৯৯টি শ্লোক আছে। ইহার সূচনায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন :—"এই শিরোনামাযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "...বঙ্গদর্শনে ইনি নীতিকুসুমাঞ্জলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর পরিষ্কার ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ। ('বাঙ্গালা সাহিত্য' : 'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ. ৫০৫)

রঙ্গলালের মৃত্যুর পর তাঁহার কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে ; সেগুলি :—

"কাল," "চিন্তা" ... 'প্রয়াস,' ডিসেম্বর ১৯০০
"শরৎ" [ঋতুসংহারের শরদ্বর্ণনা অবলম্বনে] 'মানসী,' আষাঢ় ১৩১৮
"দুর্গা-স্তোত্র" ... 'নারায়ণ,' আশ্বিন ১৩২৩
"বিরহ-বিলাপ" ... 'নারায়ণ,' কার্ত্তিক ১৩২৩

১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ প্রকাশিত রাম শর্ম্মার (নবকৃষ্ণ ঘোষ) Hymn to Durga ও Willow-Drops কবিতাদ্বয়ের অনুবাদ।

ইংরেজী রচনা।—ইংরেজী-সাহিত্যেও রঙ্গলাল পারঙ্গম ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত ডি. এল. রিচার্ডসনের 'লিটারারি গেজেটে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলি তাঁহার নামের আদ্য-অক্ষর 'R' চিহ্নিত :—

Calcutta Literary Gazette.

The Native Aristocracy of Bengal...7 June 1856 ; 30 July 1856.
An Indian Jack Sheppard ...12 July 1856.

(১১ জুন ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার গুরুচরণ মাজীর বিবরণ)

সংস্কৃত-সাহিত্যেও রঙ্গলালের পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংস্কৃত হইতে অনেক সামগ্রী ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিনে' তিনি কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক অনুবাদ করেন :—

Mookerjee's Magazine.

3. The Indian Anacreon being Translations from the Latter-day Sanskrit Poets... Decr. 1873.

কটকে দ্বিতীয় বার অবস্থান কালে রঙ্গলাল পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৯ মে ১৮৭৫ তারিখে তিনি ভ্রাতা হরিমোহনকে

লিখিতেছেন—"I have been contributing papers to the *Indian Antiquray* and other Journals and recived very flattering letters both from Caluctta and Bombay." এই সকল প্রবন্ধের যে-কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা :—

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

4. Identification of certain Tribes mentioned in the Puranas with those noticed in Col. E. T. Dalton's Ethnology of Bengal. By Babu Rangalala Banergee, Deputy Magistrate, Cuttack. ...Jany. 1874, pp. 7-16.

The Indian Antiquary.

5. Copper Plate Grant from Kapilesvara, in Orissa—Forwarded by John Beames, B. C. S., M. R. A. S. etc.

   The transcription and translation of these plates have been made by my friend Babu Rangalal Banerjia, a well-known Sanskrit Scholar. ...Feb. 1876.

   Note on a Copper plate Grant found in the Record Office of the Cuttack Collectorate,—By Babu Rangalala Banerjea, Deputy Collector, Cuttack...Vol. XLVI (1877), pp. 149-57.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র *Antiquities of Orissa* রচনাকালে, এবং কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর বীম্‌স্ সাহেব *A Comparative Grammar of the Indian Vernaculars* প্রণয়নকালে রঙ্গলালের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যজগতে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা গদ্য-

সাহিত্যে যাঁহারা নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অনেকেই কাব্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও বাংলা কাব্যে যাঁহারা নূতনত্ব সম্পাদন করেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন না। মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। রঙ্গলাল মধুসূদনের মত পণ্ডিতও ছিলেন না এবং অতখানি কবি-প্রাতভার অধিকারীও ছিলেন না, তৎসত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শে বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে নূতন শ্রীমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী ওজস্বী কবিতা পরবর্ত্তী কালে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্ত্তক। ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য-রচনার কাজেও তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। আদর্শ পরিবর্ত্তনে রঙ্গলাল আজ উপেক্ষিত হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন তিনি অধিকার করিয়া থাকিবেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৯২১ সংবতের মাঘ (ইং ১৮৬৫) সংখ্যা 'রহস্য-সন্দর্ভে' গণেশচন্দ্রের 'ঋতুদর্পণ' সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "অধুনাতন বঙ্গীয়-কবিবৃন্দ-মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।"

রঙ্গলাল বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে সদ্ভাবকুসুম চয়ন করিয়া স্বদেশের মাটিতে দেশীয়রূপেই তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, একেবারে মোহান্ধ হইয়া দেশীয় ভাবধারার সর্ব্বনাশসাধন করেন নাই। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রণয়নের কারণ সম্বন্ধে তিনি 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই স্বদেশীয়

সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

> ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।"... আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি।

রঙ্গলালের সর্ব্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত অক্ষম রচনা, কিন্তু ইহার পরেই নিরন্তর সাধনা করিয়া তিনি কাব্য-সাহিত্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পান এবং দেশপ্রেমমূলক কাহিনী কবিতায় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয়। আজ "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" প্রভৃতি কবিতার কবি রঙ্গলাল বাংলা আধুনিক কবি-সমাজের পথপ্রদর্শকরূপে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে রঙ্গলালের রচনার কালানুক্রমিক নিদর্শন দিয়া তাঁহার কাব্যপাঠে সকলকে উৎসাহিত করিতেছি।

'ভেক মুষিকের যুদ্ধ' ঃ

দুই দল, মহাবল, ধরাতল, কাঁপে।
থর থর, খরতর, যুড়ি শর চাপে ॥
ঝল মল, কি উজ্জ্বল, সুবিমল, অস্ত্র।
সেনাগণ, সুশোভন, সন্নহন, বস্ত্র ॥

প্রবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শব্দ।
মূষাগণ, বিঘোষণ, ত্রিভুবন, স্তব্ধ॥
তড়াগের, ধারে ঢের, মণ্ডূকের তাম্বু।
শেহালার, ডেরা তার, খাগ্ড়ার বাম্বু॥
আগে তার, আগুসার, সার সার, যোদ্ধা।
উর্দ্ধশির, রণবীর, অতি ধীর, বোদ্ধা॥
রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক পংক্তি।
হুহুঙ্কার, চীৎকার, যত যার, শক্তি॥
ছেয়ে মাঠ, মূষা ঠাট, কাট কাট, শোরে।
মহা জাঁক, ডাক হাঁক, রহে থাক, ধোরে॥
রণশৃঙ্গ, হল্যো ভৃঙ্গ, নহে রিঙ্গ, কাযে।
কি আহব, মহোৎসব, ভোঁ ভোঁ রব, বাজে॥
শুনি রব, সুভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ।
দ্রুত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে যুদ্ধ॥ (পৃ. ১৫-১৬)

'পদ্মিনী-উপাখ্যান':

অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসীসমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে॥
কোন মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মধুলোভা?

কষিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু-দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি, গজমুক্তাফলরাজী,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যূথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
কেন নহে সকলি লাঞ্ছিত॥

* * *

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে?
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহু-বল তার।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান ?
ক্ষত্রিয়দের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই যে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।

স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥

'কর্ম্মদেবী' ঃ

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্ফূর্ত্তি ॥
চল্যে যায়, পদ-ঘায়, বসুধায় কম্প।
কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প ॥
টিট্‌কার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে।
গর গর, কলেবর, পরস্পর-রোধে ॥
জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে।
লুটপুট, দেয় ছুট, কালকূট, নেত্রে ॥
মাতামাতী, হাতাহাতী, যেন হাতী দ্বন্দ্ব।
করে জোর, মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ॥
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে।
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, যুঝে পঞ্চ দণ্ডে ॥
নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বেদ অঙ্গ।
দুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল ভঙ্গ ॥
হাঁস ফাঁস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাগে।
দুই জন, পরায়ণ, বাহু-রণ-রাগে ॥
দুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে।
করে জারি, ভূরি ভারী, ধেয়ে চারি ভিতে ॥
কত রোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোক, বৃন্দে।
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিন্দে ॥ (পৃ. ৫৫-৫৬)

'কাঞ্চীকাবেরী' ঃ

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ-অচলে গজাননে।
যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক প্রস্রবণে ॥
পূর্ব্বে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
বহুকাল আবৃত তমসে।
নদীপ্রবাহিত পল্লী, পঙ্কে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,
নরের অসাধ্য তথা পশে ॥
ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন
আশীবিষ কত অজগর।
নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল,
বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥
যূথে যূথে বন-হস্তি, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি,
মহানন্দে ফিরিত কাননে।
বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দ্দম জলে,
করাল দশন যুক্তাননে ॥
শিরে খড়্গ সুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
দৃঢ় দেহ পাষাণ সমান।
ঘোড়াশিঙ্গা বন্য হয়, গয়াল গবয় চয়,
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥
কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
দীর্ঘদেহ বৃষভ সোসর।

বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
আঁখি দুটি দেউটি প্রখর ॥
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শিহরে প্রাণী,
হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী।
তর্জ্জন গর্জ্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
লম্ফে ঝম্ফে কম্পিত মেদিনী ॥
ভগ্ন-হনু উচ্চ-হনু, শীর্ণতনু ফুলতনু,
কত জাতি বানর বিহরে।
কুম্ভীর হাঙ্গরচয়, সুখে চলে জলাশয়,
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥
বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জ্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বটতরুবর।
হরিতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥
সপ্তপর্ণ উডুম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর,
মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
নীপ লোধ্র অরুস্কর, পিয়াল পিপাসাহর,
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল ॥
পলাশ পুন্নাগ চারু, ব্রহ্মদারু দেবদারু,
তিনিশ শিরীষ সুকুমার।
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গ চয়, গান করে মধুময়,
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়।

স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্ঝরের জল,
বিলসিত তরু লতিকায় ॥
শূন্যে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
থেকে থেকে জাগাইত ঘনে ।
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
চাতক ডাকিত ঘন বনে ॥
বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে,
করিত খগণে সুখে বাস ।
কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
আহা মরি কি মধুর ভাষ ॥
না ছিল বন্ধন ত্রাস, সুখে বিহরিত চাষ,
দিবানিশি ডাকিত দাত্যূহ ।
লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
প্রসারিয়া কলাপসমূহ ॥
কুক্কুভ চকোর লাব, খঞ্জনের কিবা ভাব,
রমণীর নেত্র অনুকারী ।
তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জীবঞ্জীব গুড়গুড়,
বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥
কিবা নদী গর্ত্তময়, চরিভ কাদম্বচয়,
চক্রবাক সারস শরাল ।
মৃণাল লইয়া মুখে, সন্তরিত মহাসুখে,
দল বল বাঁধিয়ে মরাল ॥
রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,
কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ ।

নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্বেষি চলে,
মাজে মাজে ভীষণ গর্জ্জন ॥
কোটী কোটী হীরাচূর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিঙ্গন নিকর।
যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল,
অগ্নিময় পুষ্পের আকর ॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য পশু শাল,
মহারণ্য-ময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদি মূর্ত্তি, কাননে পাইত স্ফূর্ত্তি,
মনুষ্য না করিত প্রবেশ ॥
পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদ-বাতি,
এল পঞ্চনদ পার হয়ে।
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ।
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্য-ভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ।
দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস ॥
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।

সেইরূপ আর্য্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য-ভয়ে ওঢ, ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে, রণজয়-অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য কতগুলি ॥
ক্রমে যত অনাচার, ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ ॥
কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেব দেবীগণের প্রবেশ ॥ (পৃ. ৭-১৪)

'নীতি-কুসুমাঞ্জলি' ঃ

মাণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায় ॥
* * *
বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটী সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতি পক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল জ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥
* * *
কোকিল গর্ব্বিত নহে চুতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্দম খাইয়ে ॥
* * *

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপার্জ্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

* * *

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন ॥

* * *

বরং অসিধারে কিবা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস ॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়ো না গর্ব্বী জ্ঞাতির শরণ ॥

* * *

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর ॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ॥

* * *

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার॥

* * *

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জ্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ॥

* * *

বিশেষ যত্নের সহ, নিঙ্গড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার॥
কদাচিৎ পর্য্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে॥

* * *

সিংহ-নখে বিদারিত, করিকুম্ভ-বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তাফলে।
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়া নিল করতলে॥
দেখি তায় শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন॥

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৮

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২৩.৭.৫৬

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

১৮৫৪—১৯০৫

জন্ম ; ছাত্র-জীবন

৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্ত্তী ইলসবা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—মাধবচন্দ্র বসু ; নিবাস—দামোদর-তীরবর্ত্তী বেড়ুগ্রামে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে এফ. এ. পড়িতে থাকেন, কিন্তু পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় তিনি জনাই স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কিন্তু চাকুরীতে তাঁহার মন বসিল না ; দুই-আড়াই মাস পরেই তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদে গিয়া আইন পড়িতে লাগিলেন। তিনি আইন-পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেন নাই।

সাহিত্য-কীর্ত্তি

'বঙ্গবাসী'ঃ এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র সংবাদপত্র-সম্পাদন-ব্রত গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি চুঁচুড়ার 'সাধারণী' পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট সংবাদপত্র সম্পাদন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ২৬ বৎসর বয়সে, বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সহযোগে তিনি কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

'বঙ্গবাসী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ (১০ ডিসেম্বর ১৮৮১)। প্রকাশকরূপে উপেন্দ্রবাবুর নাম পত্রে মুদ্রিত হইত। 'বঙ্গবাসী' শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্র-রূপে পরিণত হইল। ইহা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মফস্বলে সংবাদপত্র বলিতে 'বঙ্গবাসী'কেই বুঝাইত। কয়েক বৎসর পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে; উপেন্দ্রবাবু বঙ্গবাসীর সংস্রব ত্যাগ করিলে 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

কেবল 'বঙ্গবাসী' কেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন; এগুলি—'হিন্দী বঙ্গবাসী,' বাংলা 'দৈনিক' ও ইংরেজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ'।

'জন্মভূমি'ঃ একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশও যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। ১২৯৭ সালের পৌষ মাসে 'জন্মভূমি' "বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" হয়। এই মাসিকপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়ঃ—

> সূচনা।—...আমরা অনেক দিন হইতে একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম;—কারণ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস ভাল মাসিকপত্র ব্যতীত লোকশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সংবাদপত্রে লোকের অর্দ্ধ শিক্ষা হয়, মাসিকপত্রে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামনা অন্তরে রাখিয়া, আমরা মাসিকপত্র প্রকাশার্থ প্রথম কল্পনা করি;...

৯ম ভাগ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র ১৩০৫) পর্য্যন্ত 'জন্মভূমি' বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর উহা হস্তান্তরিত হয়, এবং নবপর্য্যায়ের 'জন্মভূমি' ৯ম ভাগ—৯ম বর্ষ (১৩০৭ শ্রাবণ—১৩০৮ আষাঢ়) নরেন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

শাস্ত্রপ্রকাশ ঃ যোগেন্দ্রচন্দ্রের আর একটি কীর্ত্তি—বাঙালীর প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ সুলভে প্রচার। মহাভারত রামায়ণ, পুরাণ-উপপুরাণ, স্মৃতিতন্ত্রাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ সহ তিনি নাম-মাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বহু ইংরেজী গ্রন্থও বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী ঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বরচিত কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক গল্প ও উপন্যাসও বেনামীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **মডেল ভগিনী ঃ**

১ম ভাগ ... ৪ শ্রাবণ ১২৯৩ (২৯ জুলাই ১৮৮৬)। পৃ. ১৪১
২য় ভাগ ... ১২ আশ্বিন ১২৯৩ (১ অক্টোবর ১৮৮৬)। পৃ. ১৭৩
৩য় ভাগ, ১ম অংশ ১ আষাঢ় ১২৯৪ (২৫ জুন ১৮৮৭)। পৃ. ২৩১-৪১৭
২য় অংশ (১০ অক্টোবর ১৮৮৭)। পৃ. ১৪৬
৪র্থ ভাগ ... ১২৯৫ সাল (?)

১২৯৩ সালে ইহার প্রথম দুই ভাগ, এবং ১৮৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম তিন ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারি ভাগ একত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন ১২৯৭ সালের পৌষ-সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে দেখিতেছি।

২। **বাঙ্গালী চরিত ঃ**

প্রথম ভাগ, ১২৯২ সাল (২৮ মার্চ ১৮৮৫)। পৃ. ১০৮।
দ্বিতীয় ভাগ, ১২৯২ সাল (১০ ডিসেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ১০০।
তৃতীয় ভাগ, ১২৯৩ সাল। পৃ. ১১৮।

৩। **চিনিবাস চরিতামৃত।** ? (২৭ জুন ১৮৮৬)। পৃ. ২৭০।

৪। **মহীরাবণের আত্ম-কথা।** ১২৯৫ সাল। পৃ. ৫৭।

৫। **কালাচাঁদ :**

১ম-২য় পর্ব্ব। (২ ডিসেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ১৮২।

৩য় পর্ব্ব। (২০ জানুয়ারি ১৮৯০)। পৃ. ১৮৩-৩১৫।

৪র্থ পর্ব্ব। ১২৯৬ সাল (২২ মার্চ ১৮৯০)। পৃ. ৩১৭-৫৩৭।

৫ম পর্ব্ব। অসম্পূর্ণ (১৭ মে ১৮৯০)। পৃ. ৫৩৯-৬৮২।

'কালাচাঁদে'র এই পাঁচ পর্ব্ব পরে একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। **পঞ্চানন্দ।** (১ অক্টোবর ১৮৯৮)। পৃ. ৩২২।

ইহাতে 'মহীরাবণের আত্মকথা'ও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। **কৌতুক-কণা।** ১৩০৭ সাল (১ নবেম্বর ১৯০০) পৃ. ৯৬।

সূচী :—মোহন বাঁশী, আমার উপন্যাস, দার্জলিঙ যাত্রা, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা, ৺পূজার বাজার, নূতন উপন্যাস, পঞ্চানন্দ। (নহে।)

'কৌতুক-কণা' যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই রচনা ; 'চিনিবাস চরিতামৃত' পুস্তকের (৬ষ্ঠ সং, ১৩০৯) আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—"শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ, বাঙ্গালী চরিত, নেড়া হরিদাস, কৌতুক-কণা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত।"

৮। **নেড়া হরিদাস।** অগ্রহায়ণ ১৩০৮ (৯ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৮১।

"নেড়া হরিদাস, বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্ভাগবত ;—পাষণ্ড-দলনের নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকাশিত।

অপধর্ম্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে, সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

মায়াবি-নিশাচরের মায়াজাল,—হরিণ-শিশুকে চিনাইয়া দিবার জন্যই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের মর্ত্ত্যে আবির্ভাব।

পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মচন্দ্রের কলঙ্ককালিমা মোচনার্থ এ নেড়া হরিদাস গ্রন্থ বিরচিত।

নানা স্থানে ধর্ম্মের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-দোকানদারের দোকান বন্ধ করিবার নিমিত্তই এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উৎপত্তি।"
—মুখবন্ধ

৯। **শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।**

'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র ৩য় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'জন্মভূমি'তে (পৌষ ১৩০২—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) মুদ্রিত হয়। ইহা পুস্তকাকারে খণ্ডশঃ প্রচারিত হইয়াছিল ; প্রথম তিন ভাগ একত্রে (পৃ. ৫২৮) প্রকাশিত হয়—১৫ই জুন ১৯০২। পরে ইহার আরও তিনটি ভাগ মুদ্রিত হইয়াছিল।

মৃত্যু

কঠিন পরিশ্রমের ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। ১৮ আগস্ট ১৯০৫ (২ ভাদ্র ১৩১২) তারিখে, ৫০ বৎসর ৭ মাস বয়সে, মধুপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

যোগেন্দ্রচন্দ্রের গ্রন্থগুলি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। এগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন :—

…তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্ধর্ম্মসংস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকগুলি বিদ্রূপাত্মক। অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির বিশ্বাস যে, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল নরনারীকে দন্তবিকাশে পটুতালাভ করাইবার জন্য ; কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস। ধর্ম্মোপদেষ্টা অন্বয়মুখে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন, ব্যঙ্গরসিক ব্যতিরেকমুখে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করেন। উভয়ের একই সাধু উদ্দেশ্য, প্রণালী স্বতন্ত্র।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্মে ভেল, আমাদের কর্ম্মে ভেল, আমাদের সমাজ-সংস্কারে ভেল, আমাদের সাহিত্যসাধনায় ভেল, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভেল, আমাদের বিজ্ঞাপনে ভেল, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ভেল, আমাদের দেশহিতৈষণায় ভেল। তাই তিনি সাহিত্যগুরু ইন্দ্রনাথের ন্যায়, এই ভেল নিবারণের জন্য, এই ভেল উড়াইবার পুড়াইবার তাড়াইবার ছাড়াইবার জন্য, সুতীব্র বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেন। সেই চোখা চোখা শরে অনেক রকম ভণ্ডামি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও বোধ হয় অনেকগুলি ভেল 'মরিয়া না মরে'। শুনিয়াছি, ফরাসী নাটককার মোলিয়ার একটি একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে এক একখানি বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখিতেন। আর বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জর হইয়া কুপ্রথাটি প্যারিস-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইত। ডিকেন্সের নভেলেও ইংরাজ-সমাজের অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে ; কিন্তু ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ লেখনী আমাদের চক্ষু ফুটাইতে পারে নাই। ইহা কি মোলিয়ার ডিকেন্সের তুলনায় ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের অক্ষমতার পরিচায়ক ? শতবার বলিব, কখনই নহে। আমরা যে 'গন্তীরবেদী'

তাই আমাদের সমাজে পড়িয়া হীরার ধারও ভাঙ্গিয়াছে।... ('সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র')

যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রধান কীর্ত্তি 'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; এই 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠান বাংলা-সাহিত্য ও সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সাহিত্যে বঙ্গবাসী একটি স্বতন্ত্র রচনার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত আদর্শ হইতে ইহা স্বতন্ত্র ; বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের আদর্শ গোঁড়ামি-দোষদুষ্ট হইলেও ইহাতে খাঁটি বাঙালিয়ানার প্রতি নিষ্ঠা আশ্চর্য্য রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। 'বঙ্গবাসী' স্কুলের এই সকল রচনা ব্যঙ্গে ও হাস্যে সমুজ্জ্বল, বাঙালীর হৃদয়মনের সহজবোধ্য ; গল্প বলার এরূপ অপরূপ ভঙ্গী পরবর্ত্তী কালে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি বহু সক্ষম লেখক এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালী পাঠকের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। আমরা এখানে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া তাঁহার রচনারীতির পরিচয় দিতেছি।

'মডেল ভগিনী ঃ জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব-পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে ; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নিগুর্ণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে, তপনসোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী, জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মহান্তের হাতীটা অতি গরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে

লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল,…ঘাম বাহিরিল,—কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর তো আগুনের খাপ্‌রা। টীনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চুণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হল্‌দে রঙ, সেগুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তা-চাপা-অসূর্য্যম্পশ্য-নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর-ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড় সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ী যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু "নিকন পোঁছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ী পড় পড়; বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটী হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি কতকগুলা রাজমিস্ত্রি, সেই হরিতালী রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হুহু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে দিব্য ফুটফুটেটী হইল। তখন বাড়ীর কর্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশ টাকা বাড়াইয়া চল্লিশ টাকা করি। গিন্নী বলেন তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার

ও-বাড়ী ছাড়া হবে না।” পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রঙে ছোপান পুরাণ কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবল বিজিটের দাবী করে।

* * *

সেই প্রকাণ্ড হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবার যো নাই। উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয় ঈষৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত এবং নিতম্বপ্রদেশ নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত। ফল কথা, শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আঙরাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুমসুকুমার, মাখমে-গড়া, গৌরাঙ্গখানি, কার অভিশাপে, কি দোষে ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেন;—না জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে।

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এষ্টাকিন্!! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, এষ্টাকিন্ এঁটে ব'সে থাকৃতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওর কোন একটা বিলাতী ব্যারাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদের শরীরে একটা না একটা রোগ লেগে আছেই। আহা! বড় ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের

একতিল বিচ্ছেদ নাই ; কাজেই ওঁদের একটুতেই অসুখ করে। মা-লক্ষ্মীর দোষ কি ? দোষ যত, তা আমার পোড়া কপালের !

হুহু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে জানালায় জলময়ী খস্‌খসের পরদা ! তবু কেন তিনি পায়ে এষ্টাকিন্ এবং গায়ে জামা দিয়ে ঘাম বাড়াইতেছেন ?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন ! তাই কি ? তবে ধনুকের ছিলার মত স্বতীক্ষ্ণটানবিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন ? মাথায় কাপড়ও তো নাই। কেশকলাপ কেদারা ডিঙ্গাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্ব্বাঙ্গে ঘেরাটোপ ; মাথাটী খোলা ; এই বা কেমন লজ্জা ? আর, এ নির্জ্জনে লজ্জাই বা কাকে ? বিধাতার বিচিত্র লীলা বুঝিতে পারিলাম না !

* * *

দূরেই সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি। নিকটে গেলেই খেঁদা নাক, মুখে বসন্ত-খেকো দাগ, ঠোঁট পুরু, দাঁত উঁচু, চোখ বসা—এ সমস্ত স্বভাবের শোভাই দৃষ্টিগোচর হয়। শেষে ঘৃণা উপস্থিত হয়। মনে হয়, এঃ, এর জন্যেই এত যত্ন, এত পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা মরিলাম !—ছি ! ছি ! অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে কি ছোট, কি বড়, কি মাঝারি, কি উত্তম, কি অধম—সর্ব্ববিষয়েই এ নিয়ম খাটে !

দূর হইতে চাদর ধরিয়া টানাটানি দেখিয়া, এই যে আমরা মনে মনে কতই সুখ-কল্পনা করিতেছিলাম, কতই আনন্দ-কৌতূহল উদ্দীপিত হইতেছিল, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম, সব ভোঁ-ভোঁ !—কোথাও কিছুই নাই,—তিনটি লোক পরস্পর হাসি তামাসা করিতেছে ! আমরা মারামারির মজা দেখিব বলিয়া দৌড়িয়া আসিলাম।—দেখিলাম কি না, —হাসি-তামাসা, ভাব-ভালবাসা ! ভাবিয়াছিলাম, মারামারিতে একটা লোক আধখুন হবে,—কনষ্টেবল এসে দুটাকে চালান দিবে, একটা ছট্‌কে

পালাবে,—আর আমরা এই আশদ্ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখ্‌বো!—এমন ধারা ঘটনাটি হ'লে ত মনে সুখ হতো! —তাই ছাই না হয়, একটু কম করেই মারামারি হোক!—কিন্তু এ যে মূলে ফাঁক! উল্টাস্রোত! পোড়া অদৃষ্টে কি বিধাতা সুখ লেখেনা নাই?

* * *

উনবিংশ শতাব্দী—বন্ধুত্বের কাল;—প্রীতি, পবিত্রপ্রণয়, ভাব-ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু, কাহন-কাহন মেয়ে; মেয়ের বন্ধু, কাহন-কাহন পুরুষ। কাহারো কথাটি কহিবার যো নাই,—ভবের হাটে বন্ধুত্বের বেচা-কেনা একৃসা চলিয়াছে। চলুক। এই চরম সভ্যতার ঢেউ কোথা গিয়া লাগে, দেখা যাক।

কমলিনী চরম সভ্যা। মার্কিন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গূঢ় রস একত্র মিশাইয়া কমলিনী এক নিশ্বাসে পান করিয়াছেন। তাই কমলিনীর অগাধ বন্ধু; অসংখ্য সুহৃদ্; অপরিমেয় মিত্র। আকাশের তারা, মরুভূমির বালি, বটগাছের পাতা গণিতে পারি,—কিন্তু কমলিনীর বন্ধু গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।

কমলিনীর নানাজাতীয় নানাশ্রেণীর বন্ধু! হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, বেম্ম—সকলেই তাঁহার বন্ধু-দলভুক্ত। তাঁহার ছোক্‌রা বন্ধু, যুবা বন্ধু, বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু, বারিষ্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, ডেপুটী বন্ধু, বি. এ. পাস বন্ধু, কলেজের এল. এ. ক্লাসের ছাত্র বন্ধু, দেওয়ান বন্ধু, পণ্ডিত বন্ধু, মূর্খ বন্ধু। তাঁহার খান্‌সামা বন্ধু, দোকানদার বন্ধু, দারোয়ান বন্ধু। তাঁহার ঘোষ-বসু-মিত্র বন্ধু, চাটুয্যে-মুখুয্যে-বাঁড়ুয্যে বন্ধু, রায়-সরকার-দে বন্ধু। তাঁহার তেলী-মালী-তামুলী বন্ধু, তাঁতী-জোলা-যুগী বন্ধু, হাড়ী-ডোম-চণ্ডাল বন্ধু, মুচি-মুদ্দফরাস-মুড়ুইপোড়া বন্ধু।

তাঁহার কুকুর-শেয়াল-বিড়াল বন্ধু, ছাগল-ভেড়া-গরু বন্ধু, হাঁস-মুর্গী-বক বন্ধু। তাঁহার হাতী-ঘোড়া-উট বন্ধু, মহিষ-গণ্ডার-হরিণ বন্ধু, বাঘ-ভালুক-সিংহ বন্ধু। তাঁহার কলা-মূলা-বেগুন বন্ধু, ফুটী-তরমুজ-শশা বন্ধু, ঝিঙে-উচ্ছে-করলা বন্ধু। তাঁহার ওল-কচু-মান বন্ধু, বাঁশ-বাবলা-শেয়াকুল বন্ধু, অশ্বথ-বট-ঝাউ বন্ধু। তাঁহার পাহাড়-পর্ব্বত-পাথর বন্ধু, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল বন্ধু, ঘোপ-ঘাপ-গুহা বন্ধু। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বন্ধুময়। কত আসে কত যায়, কত থাকে—তাহার নির্ণয় করে কে?

একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ গণৎকার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,—এই কলিকাতা সহরমধ্যে কমলিনীর এক শত আট জন বারমেসে বাছাই বন্ধু আছেন। তন্মধ্যে আজ বত্রিশ জন মাত্র নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম জালে ছাঁকিয়া, অদ্য এই বাছায়ের বাছাই বন্ধুগুলি মিলিত হইয়াছেন।

কমলিনীর তিন রকম মূর্ত্তি আমরা দেখিলাম। হুগলীতে গঙ্গা-উপকূলে এক মূর্ত্তি, শ্রীবৃন্দাবনে এক মূর্ত্তি, আর অদ্য কলিকাতায় এই অপরূপ মূর্ত্তি। চরম!

'বাঙ্গালী-চরিত'ঃ সেই একদিন, আর এই একদিন। সে দিন সেই পূর্ণিমা তিথি, ষোলকলা শশী, সারদ-কৌমুদীরাশি; আর আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকার, মেঘের হুঙ্কার, বিদ্যুতের বিকট হাসি, উনপঞ্চাশ পবনের বিষম বিক্রম,—আর বাঁচি না, আর তিষ্ঠিতে পারি না। সে দিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ-প্রতিমা দেখিয়াছি,—মূর্ত্তিমতী সরলতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, মূর্ত্তিমতী গৃহকর্ম্ম, মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী, সে দিনও দেখিয়াছি—কিন্তু আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজড় হয় কেন? কেন এমন হইল? বাঙ্গালীর ঘরণী বিলাসিনী কেন? আড়-নয়ন খেমটা নাচে কেন?

চারু হাসিতে বিষ মাখাইল কে? কথামৃতে ছাই ফেলিল কে? ঘোমটা লুকাইল কে? গৃহলক্ষ্মীকে বাইজী সাজাইল কে?

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে, কালবশে, যুগধর্ম্মে, সমাজ-শরীরে মহাবিষ পশিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না—চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, সংজ্ঞা থাকিতে অচেতন। যেন দিগ্বিজয়ী যাদুকরের অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ায় দেশ মজিয়াছে! অহো কি বিড়ম্বনা! সিংহ শৃগালের ডাক শিখিতেছে, স্বয়ং সুরভি শৃগালের পন্থা অনুসরণ করিতেছে, দেবতা পিশাচের খেলা খেলিতেছে।

ম্লেচ্ছ-অধিকারে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে! এই "স্ত্রীশিক্ষাই" সর্ব্বনেশে জিনিষ; তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের শখের, সোহাগের, সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল-প্রসবিণী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ;—ইহাই যেন হাতের নোয়া, সীঁথির সিন্দুর; ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম; ইহাই সংসারের সার-সর্ব্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্যা। বরং একদিন, দশ দিক্ উজ্জ্বলীকৃত, কোহিনুরবিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তথাচ এ "শিক্ষা"-টুকু ছাড়িতে পারি না। অধিক কি, বরং বিধবা হইয়া বার মাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না।

এমনি ঝোঁক, এমনি মোহ, এমনি উন্মত্ততা!

পুরুষেরই কি, আর স্ত্রীলোকেরই কি,—কাহারও সুশিক্ষার বিরোধী আমরা নহি। তবে সু-শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝি না,—বিকৃত ভাবে বুঝিয়াছি,—ইহাই রোগের প্রধান মূল কারণ। বীভৎস শিক্ষাকে সুশিক্ষা

বলিয়া বুঝিয়াছি, কণ্টক-তরুকে চন্দন-বৃক্ষ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছি, পাথরকুঁচাকে চারু-চিন্তা মাণিক বলিয়া বাক্সে তুলিয়াছি! তাই দুর্দ্দশার আদি, অন্ত, মধ্য নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে,—অদ্য এ বিষয় লইয়া সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি,—কেবল অক্ষর চিনিয়া বই পড়িলেই "শিক্ষিত" হয় না। বর্ণজ্ঞান-শূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন; আবার এ দিকে, ইংরেজী-বাঙ্গালায় আউট হইয়াও, অনেক নরনারী নিদারুণ অশিক্ষিত। শিক্ষার অর্থ,—বস্তুর স্বরূপজ্ঞান,—পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মে নাই, অক্ষর পরিচয় না হইলেও তিনি শিক্ষিত। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে—আইসলণ্ডস্থ হেক্‌লা পর্ব্বতে উঠিয়া X. Y. Z. পাস করিয়া আসিলেও—অশিক্ষিত! শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহ লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হইয়াও, শিক্ষিত নামে বাচ্য হইতে পারেন। তথাচ কেবল এম. এ. বি-এল. পাস করিয়াও আমাদের ঘোষ, বসু, মিত্র,—বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, চাটুয্যেগণ নিতান্ত অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষার অর্থ—কার্য্যশিক্ষা,—শিক্ষা, পুথিগত বিদ্যা নহে;—টেঁয়াপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্য্য শিক্ষায় বুঝে;—ইহা ব্যতীত হিন্দুর অন্য শিক্ষা নাই—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম—ইহাই হিন্দুর একমাত্র কথা। যিনি বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী, তিনি বেদ পাঠ করুন—ইহাই হিন্দুর উপদেশ। অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? অধিকারিভেদে শিক্ষাভেদ। নচেৎ ভস্মে ঘৃতঢালাবৎ শিক্ষা নিষ্ফলা হয়। (পৃ. ২৫৭-৫৯)

'কালাচাঁদ' : কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন, "এ সংসারে জুয়াচোর, শঠ, প্রবঞ্চক কে নয় ?—কেবল আমিই কি ধরা পড়িয়াছি ?—চুরি কে না করে ? মিথ্যা কথা কে না কয় ? বঞ্চনা কাহাতে নাই ? তবে বড়লোক ধরা পড়ে না ; আমার মত ছোট লোকেই ধরা পড়ে। দূর-সম্পর্কীয় আমার মেসো, নাজীর ; ঠাকুরদাদা, সেরেস্তাদার ; এ দুজনের পসার প্রতিপত্তি, ধুমধাম দেখে কে ? লোকে উভয়কেই ধর্ম্মাবতার বলিয়া নমস্কার করে, প্রণাম করে। কিন্তু এ দুজনেই কি জুয়াচোর, বঞ্চক নহে ? মেসোর মাহিনা ৩০৲ টাকার অধিক নয় ; কিন্তু তাঁহার বাসায় দুই বেলা ৪০ খানি পাত পড়ে। মাসীর গায়ে প্রায় দুই হাজার টাকার গয়না। বাটিতে প্রতি বৎসর দোল-দুর্গোৎসব হয়। মেসো সম্বন্ধীর নামে তালুক কিনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি মেসো এত টাকা পান কোথায় ? নিশ্চয়ই চুরি-করা ধন। ছোট-লোকে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, আর বড়-লোকে কথার কৌশলে, বুদ্ধির জোরে চুরি করে। আমরা অসভ্য চোর ; তাঁহারা সভ্য চোর। মেসোর বাসায় দুই জন নাপিত, পেয়াদা, খানসামা ;—দুইজন ব্রাহ্মণ-পেয়াদা, রসুয়ে। তাহারা মাহিনা খায়—কোম্পানির ; কিন্তু কাজ করে মেসোর। এ সব কথা সকলেই জানে—অথচ, মেসোর জেল হয় না কেন ? ঠাকুরদাদার অবস্থাও তথৈবচ। তাঁহার গ্রাম্য খড়ো ঘর আমার ত অবিদিত নাই,—আজ তাঁহার চকমিলন বাড়ী! প্রত্যহ সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির সময় নহবদ বাজে। কেহ কেহ বলে, ঠাকুরমার নামীয় কোম্পানির কাগজ আড়াই লক্ষ উপচাইল। জুয়াচুরি ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আইসে ? ঠাকুরদাদা ত আর পরেশপাথর কুড়াইয়া পান নাই যে, ঠেকাইলেই সব সোণা হইয়া যাইতেছে !! ঠাকুরদাদা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কাছারি হইতে আসিবার সময় চাপকানের বুকপকেট-

পূর্ণ টাকা এবং নোট লইয়া আইসেন, হাকিম বাহাদুর কি তাহা দেখিতে পান না? তবে সে কিসের হাকিম? সে কিসের বিচারক? যে এত অন্ধ, তাহাকে উচ্চ বিচারাসনে বসান কেন?

"আর উকিল মোক্তারই বা কি? যত ফেরেফ ফন্দি,—সব ইহাঁদেরই হাতে। এমন অ-কথা কু-কথা নাই যে, ইহাঁরা মক্কেলকে উপদেশ দিয়া না থাকেন। একই আইনের একদিন একরকম অর্থ হইল,—আবার সুবিধামত, অন্য দিন সেই আইনের অন্যরূপ অর্থ হইল। হাকিমকে ঠকানো, হাকিমের চক্ষে ধূলা দেওয়া, ইহাদের ব্যবসা। মনে করুন, আমি উকীল, আমার হাতে মোকদ্দমা কম,—একটি মোকদ্দমা লইয়া হাকিমের কাছে বাজে বক্তৃতা করিয়া, সেই একদিনের মোকদ্দমায় দশ দিন করিলাম। মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, মক্কেল দোষী, এ দিকে বক্তৃতার সময় হাকিমকে বুঝাইলাম, মক্কেল নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! এ কি রকম কাজ বুঝি না,—এ কি রকম ধর্ম্ম জানি না, এ কি রকম সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম হয় না!

"আর বিচারপতি হাকিমই বা কি?—নাজির তাঁহার বাজার-সরকার। নাজিরবাবু যেমন সস্তায় জিনিষ কিনতে পারেন, এ ত্রিভুবনে তেমনটি আর কেহই পারেন না। ঘৃত টাকায় দেড় সের, —কিন্তু নাজির কেনেন, এক টাকায় তিন সের। বাজারে চারি আনা মাছের সের; কিন্তু নাজির মহাশয় দশ সের মাছটা অনায়াসে এক টাকায় লইয়া আসেন। হাকিমের চক্ষে সাক্ষী দুই প্রকার,—দুয়ো আর সুয়ো। কোন সাক্ষীকে ধমক দিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাহার এজেহার লইতেছেন; সাক্ষী এক কথা বলিলে অন্য কথা লিখিতেছেন, অথবা তাঁহার মনোমত কথা না বলিলে তাহা লিখিতেছে না। বিচার ঠিক হউক, আর নাই হউক,—সে দিকে বিচারকের দৃষ্টি নাই;—

কিসে উপর আদালতে তাঁহার রায় বজায় থাকে,—ইহাই তাঁহার চেষ্টা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কে বুঝে, জাল-জুয়াচুরি কে বুঝে,—রায় বজায় থাকিলেই, চাকুরি, বজায়,—পদোন্নতি!—সেইটা ঠিক থাকিলেই হইল।

"ব্যবসায়িগণের ত মিথ্যা কথার ব্যবসা। কাপড়ের দোকানে যাও, লম্বোদর ভদ্র দোকানদার বলিবে, "মহাশয়! গঙ্গাদরিমানে বলিতেছি এ কাপড় জোড়াটী ৩৵১০ টাকায় খরিদ—তা, আপনার নিকট চারি গণ্ডা পয়সার বেশী লাভ লইব না।" শেষে, এক ঘণ্টা—কষাকষি, মাজামাজি, হেস্তাহেস্তিতে ২৸০ টাকায় দোকানদার কাপড় বিক্রয় করিল। দশ গজ থান কোনো—ঘরে আসিয়া মাপো, সাড়ে নয় গজের অধিক হইবে না। ইহারা কি চোর বঞ্চক নয়?—তবে আমি একলা কালাচাঁদ ধরা পড়ি কেন? সমাজের অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি যে কি অধিক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা ত আমি বুঝি না। সকলেই জানে, গোয়ালা দুধে জল দেয়; এ তত্ত্ব হাকিম, উকিল, জমীদার, রাজা সকলেই অবগত আছেন। এ প্রবঞ্চনা-অপরাধের জন্য সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না কেন? প্রকাশ্যত পথে পথে ফেরিকর অবিরত চীৎকার করে, 'চাই, ভালো আম্! খাসা মিষ্টি আম্'; ফেরিকর ডাকিয়া, আম কাটিয়া, চাকিয়া দেখ,—টক্ আমড়া তার কাছে কোথায় লাগে? এইরূপ কত শত মূর্ত্তিমান্ প্রবঞ্চক প্রত্যহ রাজপথে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রবঞ্চনা-গীত গাহিতে গাহিতে হেলিয়া-দুলিয়া হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যায়,—তাহার সংখ্যা কে করিবে?—কিন্তু ইহাদিগকে কারাগারে পাঠান হয় না কেন?"

'মহীরাবণের আত্ম-কথা': কি করি? কোন্ দিকে যাই? কোন্ পথ ধরি?

গ্রন্থকার হইব, না পেটেণ্টঔষধের বিজ্ঞাপন দিব? উঁহু,—খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র প্রকাশ করি না কেন? তাতে কি সুবিধা হবে?

আচ্ছা,—রাজনৈতিক-বক্তৃতা এবং সেই সঙ্গে একটী ইংরেজী-স্কুল স্থাপন করিলে চলে না কি? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিয়া ধর্ম্মনৈতিক সন্ন্যাসী সাজা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নয় কি? আমার চলে কিসে? আমি করি কি?

বেশী বয়স বলিয়া গবর্ণমেণ্ট চাকুরি দিল না; হাতের লেখা খারাপ বলিয়া সওদাগর আফিসে স্থান পাইলাম না; ব্যাকরণে কম-দখল-হেতু মাষ্টারি হইল না; জমাখরচ বোধ না থাকায় গোমস্তাগিরি হইল না; একটু হাতটান বলিয়া বিল-সরকারী জুটিল না; টেরি কাটি বলিয়া খানসামাগিরি মিলিল না। অল্প উপর-নজর আছে বলিয়া কাহারও বাসায় স্থান পাই না; বিষম অভিমান এবং লজ্জাবোধ আছে বলিয়া, মুটেগিরিও করিতে পারি না। (পৃ. ১-২)

'কৌতুক-কণা': বাবু মোহনবাঁশী বি, এ,-ফেল মহোদয়ের নিবাস আপাতত কলিকাতায়। পিতা সব্‌জজ ছিলেন,—কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান,—সুতরাং বাঁশীবাবুর অন্নচিন্তা ছিল না। সংসারে তাঁহার মা, স্ত্রী এবং এক কন্যা ছিল। বাঁশীবাবু বহুকাল হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন;—কিন্তু সে পরীক্ষা-সাগর কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এমতে প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাকে 'বি. এ-ফেল' উপাধি প্রদান করেন। সুতরাং অধুনা তাঁহার নাম দাঁড়াইয়াছিল,— "বাবু মোহনবাঁশী বি. এ.-ফেল।"

মোহনবাঁশীর ধারণা ছিল,—তিনি পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণবান্, জ্ঞানবান্ এবং বুদ্ধিমান্। সেকেলে পিতা কেরাণীগিরি হইতে মাষ্টারি, মাষ্টারি হইতে মুন্সেফী, অবশেষে মুন্সেফী হইতে ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া সব্‌জজরূপে দপ করিয়া জলিয়া উঠেন। অল্পবুদ্ধিধারী পিতা যখন এত উচ্চপদ পাইয়াছিলেন,—অগাধ-বুদ্ধিধারী পুত্র তখন সহজেই যে হাইকোর্টের জজ হইতে পারিবেন,—তৎপক্ষে বাঁশীবাবুর কোনও সংশয়

ছিল না। সংশয় ছিল না বলিয়াই, বাঁশীবাবু পঠদ্দশায় বন্ধুবান্ধবগণকে বলিতেন,—"মনে কর, হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া মাসে আমি আট নয় হাজার টাকা করিয়া পাইতেছি;—এমন সময় বড়লাট আমাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বল দেখি এ সময় আমি কি উত্তর দিব? হাইকোর্টের জজের মাসিক মাহিনা বড়-জোর না হয় চারি হাজার টাকা। কিন্তু আমি এদিকে ওকালতীতে মাসে আট নয় হাজার টাকা রোজগার করিতেছি। করি কি? তবে জজিয়তিতে সম্মান অধিক। কি বল—হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণ করা উচিত নয় কি?"

শুধু বন্ধু বান্ধবকে এ কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। পঠদ্দশায় একবার তিনি ইংরেজীতে একটী "এসে" লেখেন—"উচ্চপদের সম্মান অধিক না, টাকার সম্মান অধিক?" এ প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করেন উচ্চপদেরই সম্মান অধিক। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "যথা,—হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিলদের ও বারিষ্টারদের অপেক্ষা জজদের সম্মান অধিক। কেন না, জজ সাহেব বেলা এগারোটার সময় আদালত-গৃহে উপস্থিত হইলে, যত উকীল এবং বারিষ্টার তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না জজ বসেন, ততক্ষণ তাঁহারা কেহ বসিতে পান না।"

ক্রমশঃ কিন্তু মূলে ফাঁক হইয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষক মুষিকগণ, মোহনবাঁশীরূপ মহান্ মহীরুহের মূল-শিকড় কাটিয়া দিল। উপর্য্যুপরি সাত বার তিনি বি. এ. ফেল হইলেন। ঘুড়ি, সদম্ভে আকাশ-পথে উড়িতেছিল—হঠাৎ কে যেন তাহার স্থতা কাটিয়া দিল। ঘুড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিকলাঙ্গ হইয়া, ভূতলে পড়িয়া গেল। মোহনবাঁশী মনে মনে ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন স্থায়িরূপে

বসিবার উদ্যোগে ছিলেন,—কিন্তু পিচ্ছিল পর্ব্বতে বসিতে সক্ষম না হইয়া, ক্রমশঃ গড়াইয়া গড়াইয়া নাকে মুখে চোকে বুকে আঘাত পাইয়া, ধড়াস্ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার উপরপাটীস্থ সম্মুখের দুইটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহনবাঁশী, বি, এ,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, সুতরাং বি-এল. পাস দিয়া হাইকোর্টের উকীল হইবেন কিরূপে? মোহনবাঁশী ফেল হইলেন বলিয়া যে, আপন বিদ্যাবুদ্ধির প্রভা কিঞ্চিৎ কম উজ্জ্বল মনে করিতেন,—তাহা নহে। তিনি কাহাকেও বলিতেন,—"পরীক্ষায় পাস হওয়া আর স্ফূর্ত্তি খেলায় অর্থলাভ করা—এ দুইই সমান। এখানে গুণের বিচার নাই। পড়িল পাশা, তো জিতিল কোদালের বাঁট।" কাহাকেও আবার বলিতেন,—"পরীক্ষকগণ মহা মূর্খ। তাহারা আমার প্রশ্নোত্তরের মহিমা বুঝে না। বানর মুক্তামালার অর্থ কি বুঝিবে?"

মোহনবাঁশী মুখে দড় হইলেও, মনে মনে মনকে বুঝাইয়া এক রকম ঠাণ্ডা করিলেও, হৃদয়ের অন্তস্তলে কিন্তু তিনি নিদারুণ কেমন এক আঘাত পাইলেন। সংসারে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিলেন না,—হাইকোর্টের জজ হইতে সক্ষম হইলেন না,—ইহজগতে সম্মানরূপ সার সুখ পাইলেন না,—কাজেই তিনি ধরাধাম শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মন কেমন 'উদাস' হইল। কিছুই ভাল লাগে না। ক্ষুধাও মন্দ হইয়া আসিল। লোক দেখিলেই,—বিশেষতঃ শ্বশুরবাটীর লোক দেখিলেই—, কেমন এক অনির্ব্বচনীয় লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি সহজে লোপ পায় না। শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, মোহনবাঁশী সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিলেন। বলিতেন,—"সঙ্গীতের ন্যায় সুখ আর কিছুতেই নাই।

সঙ্গীত ব্রহ্ম। সঙ্গীতে একবার মন মজিলে, সংসারের সমগ্র সামগ্রীরই শুভদর্শন হয়। সু-সঙ্গীতে এবং সু-সঙ্গতে পুত্রশোকও তিষ্ঠিতে পারে না।"

বাবু; মুখে ঐরূপ বক্তৃতা করেন এবং ওস্তাদ রাখিয়া গান শেখেন। কয়েক মাস পরে, সঙ্গীতও আর তাঁহাকে ভাল লাগিল না। কেন না, গলায় সুর তাঁহার আদৌ আসিল না। তালেও তথৈবচ জ্ঞান জন্মিল। ওস্তাদ, তালবোধের কথা বাবুকে বলিলে, তিনি বড়ই বেজার হইতেন।

সঙ্গীত ছাড়িয়া, অনন্যোপায় হইয়া, তিনি শেষে কবিতা-দেবীর সেবা আরম্ভ করিলেন। বলিতেন,—"ধন্বন্তরির কলসের অমৃত, শারদীয়া চন্দ্রের সুধা, প্রফুল্ল-পঙ্কজের অনাঘ্রাত মধু,—এ সমস্ত কবিতা-রসের কাছে কিছুই নহে। হাইকোর্টের জজিয়তিপদ পার্থিব, নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর এবং জলবিম্ববৎ; কিন্তু কবিতা-রস পান করিয়া বাল্মীকি অমর, কালিদাস মৃত্যুঞ্জয়, বেদব্যাস চারি যুগেই সমভাবে বর্ত্তমান। বিশেষ হাইকোর্টের জজ স্বদেশেই পূজ্য; কিন্তু কবি সর্ব্বত্রই সমাদৃত।"

মোহনবাঁশী, মৃত্যুঞ্জয় এবং সর্ব্বত্র পূজিত হইবার জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়াছিলেন, স্বভাব-কবিই শ্রেষ্ঠ কবি। আরও শুনিয়াছিলেন, মহাকবিগণ কখন ভাষার জন্য ভাবিত হন না; শুদ্ধাশুদ্ধ, ষত্বণত্ব হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রতি মহাকবিকুলের দৃষ্টিপাত নাই; তাঁহাদের লেখনীমুখে যাহা নির্গত হইবে, তাহাই ভাষা, তাহাই শুদ্ধ, তাহাই ব্যাকরণ।

একদিন তালগাছ দেখিয়া মোহনবাঁশী কবিতা লিখিলেন,—

রে তালগাছ! কেন এত লম্বা, যেন প্রেম-কাম্বা,
নাহি কিছু ঢম্বা তব।
দেখি এই আম্বা, ভীত জগদম্বা,
আকাশ স্পর্শম্বা হব॥

নাহি শাখা নাহি প্রশাখা নাহি সখা নাহি বিসখা,
সংসারে দেখি তোর সকলি ফাঁকা।
তোর দোয়ারে নাইক আকা, তোর মাথায় বসি কাক ডাকে কা-কা,
যেন মূর্ত্তিমান দুঃখের ছবি আঁকা॥
আমি শুনেছি পুরাণে, নারিকেল গাছ সনে,
আছে তোর মাথা-মাথি ভাব।
সেই তোর কেবা হয়,—সহোদর ভাই নয় ?
তোর তাল ভাল কিংবা ভাল তার ডাব ?
খর্জ্জুর সুপারি, দুই গাছ ভারি,
সম্বন্ধি কি ভায়রা-ভাই বুঝিবারে নারি।
রূপ মনোহারি, যাই বলিহারি,
তাল গাছ কাছে কিন্তু উভয়েরই হারি॥
তাল ! তোর নাইক মাতা, নাইক পিতা, মাথায় দিবার নাইক ছাতা,
নহিলে, বর্ষায় এত ভিজিস্ কেন ?
তাল ! তোর ভাত খাইবার নাই কলাপাতা, পায়ে দিবার নাইক বুটজুতা,
নহিলে তোর, গোড়ালীতে এত কাদা কেন ?
তাল ! তোর জমা খরচের নাইক খাতা, শয়নের তোর নাইক কাঁথা,
নহিলে দিন রাত এত দাঁড়ায়ে কেন ?
সত্য করে বল্ রে তাল, কেন তোর এই বদ্‌হাল ?
চোরে কি লুঠেছে তোর সব মালামাল ?
তোর তাল-শাঁসে কি নাইক রস, তাই তুই হয়েছিস এত বিরস,
আমি থাক্‌তে দুঃখ কিরে ওরে কানাইলাল॥

শ্রীমোহনবাঁশী বি. এ.-ফেল
(অঙ্কশাস্ত্রে সিকি নম্বরের জন্য)

এই মহাকবিতা প্রকাশিত হইবামাত্র, সমগ্র জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ জগতের অর্দ্ধেক লোক মোহনবাঁশীর "তালগাছ" পাঠে মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গেটে, বার্জিল, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, পাতঞ্জল, বা আবুলফজলে এরূপ কবিত্বপূর্ণ পদ্য দেখা যায় না। মোহনবাঁশী বাবু তালগাছ ব্যতীত ইহজীবনে যদি আর একটিও পদ্য না লেখেন, তাহা হইলেও সংসারে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবেন। কোহিনূর হীরক এক খণ্ড মাত্র পাওয়া যায়; সিংহ একটী সন্তান প্রসব করে; মনুমেণ্ট কলিকাতায় একটীই আছে। সার-সামগ্রী পৃথিবীতে একটী করিয়াই হয়। যেমন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।" (পৃ. ২-৭)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ঃ "অধিকাংশ পুস্তক আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি, উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি। কয়েকখানি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি, মালাকার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও সমাহরণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি।" "কয়েক বৎসর ব্রজেন্দ্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াত-কলম হউক।"—'প্রবাসী,' চৈত্র ১৩৫০।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৯

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২. ৮. ৫৬

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৮৪৬—১৯১৭

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া কদমতলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬ (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৫৩) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—গঙ্গাচরণ সরকার। গঙ্গাচরণ হুগলী কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র, সে-যুগের সিনিয়র-বৃত্তিধারী।* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সরকারী কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে অনেক দিন নদীয়া জেলায় কাটাইতে হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের শৈশব উলা বা বীরনগরে কাটিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন প্রায় দশ বৎসর, সেই সময় তিনি উলা ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় আসেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

> ১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা ছাড়িয়া আসি। তখন আমার বয়স পূরা দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনবারকার

---

* গঙ্গাচরণও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। পুত্রের সম্পাদিত 'সাধারণী' ও 'নবজীবনে' তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত এই তিনখানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি :—(১) ঋতুবর্ণন (কবিতা), ইং ১৮৭৪। (২) হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা, ইং ১৮৭৯। (৩) বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা, ইং ১৮৮০।

বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম; অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি মুখস্ত করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে অন্নদামঙ্গল, তিন খণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ও শেক্সপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান, পাল-বর্জ্জিনিয়া প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম।...

উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাজী অতি অল্পই পড়িয়াছিলাম; কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পড়িয়াছিলাম, ফাষ্ট নম্বর ও সেকেণ্ড নম্বর স্পেলিং, ফাষ্ট নম্বর রিডারের বার আনা, সেকেণ্ড নম্বর রিডারের অর্দ্ধেক। ইংরাজী ঐ পর্য্যন্ত; অঙ্ক বিষয়ে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুভঙ্করী ও ইংরাজী মতে সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ। বাঙ্গালায় পিয়ারসনের ভূগোল আর ইয়েট্সের পদার্থবিদ্যা; বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।—"পিতা-পুত্র": 'বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৪৮৭, ৫০৮।

ছাত্র-জীবন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন অক্ষয়চন্দ্র "হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্ত্তি" হন। ১৮৬৩ খীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়, ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি হুগলী কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে অক্ষয়চন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন:—

আমাদের কলিকাতার কালেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাংলায় আর নাই।… আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেল অবস্থায়, সংসার প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে, এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া, একেবারে চরিতার্থ হইলাম। প্রেসিডেন্সী কালেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম।…

এখন যেখানে সিটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতলা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কালেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী-গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমাজ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না।…আমাদের কাহারও সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই।…('বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৫৩৩-৪)

ওকালতি

আইন পরীক্ষা দিয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান। তাঁহার পিতা তখন বহরমপুরেই সদর মুন্সেফ। এই বহরমপুরেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়; সেই পরিচয় কালক্রমে গভীর

বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। বহরমপুরে তখন সাহিত্যিকমণ্ডলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন :—

৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার নিকট বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলাম।...তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা-সাহিত্য-চর্চ্চার বড় স্থবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের 'ইতিহাস লেখক' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার 'ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময় বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ; আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ-স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। স্থতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মহেন্দ্রক্ষণের স্থযোগ অবহেলা করি নাই।—"পিতা-পুত্র," পৃ. ৫৩৬।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৭৯। এই সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের "উদ্দীপনা" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বহরমপুর পাঁচ বৎসর ওকালতি করিবার পর অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর, মাতাঠাকুরাণীর বায়ু রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম।—"পিতা-পুত্র," পৃ. ৫৪৭।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

'সাধারণী' : প্রধানতঃ সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ই কার্ত্তিক ১২৮০। তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন :—

কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়ব্রত সংকল্পে পালন করিবে।…

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে ; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না ; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না। ঐ ধর্ম্মই উহার বল ; ঐ অধর্ম্মেই উহার ভয় হয় ; আর স্বদেশীয়েরাও ইহার ভরসা,—তাহারাই ইহার আশ্রয়।…

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পত্রিকা বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই

ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় করিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।...

অক্ষয়চন্দ্র "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'সাধারণী' প্রচারের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন :—

সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই। সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন ; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভর্‌ৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া, সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য,—সাধারণীর জন্ম। (পৃ. ৬৪৩)

'সাধারণী' জন্মাবধি ২য় ভাগ, ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পর্য্যন্ত কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বসতবাটীর সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ত্রালয় স্থাপন করেন। 'সাধারণী'র ২য় ভাগ, ১৫শ সংখ্যায় (১১ শ্রাবণ ১২৮১) প্রকাশ :—

আজি সাধারণীর নূতন যন্ত্রে সাধারণী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আজি আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা পাঠক

কখনই বুঝিতে পারিবেন না ; যিনি মনের ভাব বুঝিবেন না, তাঁহার কাছে মনের ভাব বলিবও না। তবে একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে,—এত দিন পরে সাধারণীর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিতে গ্রাহক-পাঠককে আমরা প্রশান্ত মনে অনুরোধ করিতে পারি। সংসারে যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র-পরিবার-পরিবেষ্টিত, তাহাকে যেমন অধিকতর বিশ্বাস হয়, অধিকতর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, তেমনই আমাদের সাধারণী যখন এক্ষণে কল, কারখানা, ছাপাখানা লইয়া জড়ীভূতা হইয়া পড়িল, তখন সকলের ইহাকে অধিকতর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

চুঁচুড়ায় ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্র ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্রিকা 'সাধারণী'র সহিত সংমিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র 'নববিভাকর—সাধারণী' সম্পাদন করিতে থাকেন। চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়।* 'সাধারণী' ১৭ বৎসর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। 'সাধারণী'র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের "জাতিবৈর" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই

---

* 'বিশ্বকোষে'র "অক্ষয়চন্দ্র সরকার" প্রবন্ধের লেখক বলেন, "১২৯৭ সালে অকালে অক্ষয়চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হইলে পাঁচ মাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্য ছয়টি সন্তানকে লইয়া তিনি অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নববিভাকর—সাধারণী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া চুঁচুড়ায় গিয়া বাস করিতে হয়।" ইহা ঠিক নহে। অক্ষয়চন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়—২ পৌষ ১২৯৭ তারিখে; ইহার অনেক আগেই—১২৯৬ সালের ভাদ্র মাসে 'নববিভাকর—সাধারণী' ও 'নবজীবন' লোপ পাইয়াছিল।

'সাধারণী' পত্রেই 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর হাতেখড়ি হয়।

'নবজীবন'ঃ সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার অব্যবহিত পরেই ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'নবজীবন' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

সেই সময় কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট্-রূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে বৰ্দ্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্যসঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বসু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের দুই মহাত্মা—কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোমৎশিষ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ,—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবু ত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবর্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই, জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই

আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের সূচনাতেই লিখিলাম "যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজতত্ত্বাদির আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বনস্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,—সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব—সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বে একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সাম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোনও তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম—**ধর্ম্ম**।" (পৃ. ৬৪৫-৪৬)

'নবজীবন' পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার শেষ সংখ্যা—৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬। 'নবজীবন' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতেখড়ি এই 'নবজীবনে'; তাঁহার প্রথম রচনা—"মহাশক্তি" ১ম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

দেশানুরাগ

'ভারত-সভা'ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশভক্তগণের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ব্যবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার এই রাজনৈতিক সমাজের সভাপতি, আনন্দমোহন বসু সম্পাদক, এবং অক্ষয়চন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

চতুষ্পাঠী ও 'সাধারণী-স্কুল' প্রতিষ্ঠাঃ "দেশে ক্রমেই নিষ্ঠাবান্ সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অভাব ঘটিতেছে, কাজেই হিন্দুর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং দেশমধ্যে যাহাতে ধর্ম্মচর্চ্চা এবং শাস্ত্রানুশীলন বহুবিস্তৃতি লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র দুইটি বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়াছিলেন 'অমর-চতুষ্পাঠী'। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অমর-চতুষ্পাঠী বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গলার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুদয়ের জন্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য অক্ষয়চন্দ্র চিরদিন নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি 'নবজীবন' প্রচারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।'

"চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষাবিস্তার-

কল্পে অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরেজী উচ্চ-বিদ্যালয় পরিচালনা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 'হিন্দু-স্কুল' উঠিয়া গেলে অক্ষয়চন্দ্র ইহার যাবতীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন এবং 'সাধারণী-স্কুল' স্থাপিত করিয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালনা করেন। সাধারণ তত্ত্বাবধান করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে তিন চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধারণী-কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল উঠিয়া যায়।" ('বিশ্বকোষ,' ২য় সং., পৃ. ৮৮)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সহ-সভাপতি: ১৩০৪, ১৩০৫ ও ১৩২০ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন: সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ১৩১৮ সালের ১৯-২১এ ফাল্গুন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি ১৩১৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যা 'বসুধা' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পর-বৎসর ৯-১০ই চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়চন্দ্র মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি ১৩১৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-বৎসরের সভাপতির অভিভাষণ দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ১৩২০ সালের ২৭-২৯এ

চৈত্র তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ভূতপূর্ব্ব সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত্যু

২ অক্টোবর ১৯১৭ (১৬ আশ্বিন ১৩২৪) তারিখে, ৭১ বৎসর বয়সে, চুঁচুড়ার বাড়ীতে অক্ষয়চন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাবলী

অক্ষয়চন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **শিক্ষানবিশের পদ্য।** ভাদ্র ১২৮১ (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৫৬।

"শিক্ষানবিশের পদ্য প্রকাশিত হইল। ইহা উভয়তঃ শিক্ষানবিশের ; কেন না যখন লিখি তখন আমি শিক্ষানবিশ, এবং এক্ষণে শিক্ষানবিশের জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। বিষয় কার্য্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বায়রণ হইতে একটু আধটু অনুবাদ করিতাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবদ্ধ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা ; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্ত্তন ;···অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।···কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রসপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ

হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধা উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা শিক্ষানবিশের পদ্য হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে। আর একটি কথা আছে। এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিরেন। আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।...'বন্দীর বিলাপ,' 'ভারতবর্ষ' ও 'সাগর' বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। 'নারী,' মহাভারত হইতে। 'একদিন', কোন ইংরাজি সাময়িক পত্রের অনুকরণে লিখিয়াছিলাম; সে পত্রের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ নাই। 'হাসি কান্না' ও 'মৃত্যু' স্বরচিত। শিক্ষানবিশের ছন্দোবন্ধ পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী নহে; ত্রয়োদশ বর্ণ সমষ্টিকে অর্দ্ধ পয়াররূপে গণ্য করিয়াছি, আবার অনেক স্থানে সেই অর্দ্ধ পয়ারে ষোলটি অক্ষর আছে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একত্র মাখামাখি করিয়াছি।"...ভূমিকা।

২। **প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।** অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৪ (ইং ১৮৭৪-৭৭)।

১। বিদ্যাপতি (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪), ২। চণ্ডীদাস, ৩। গোবিন্দদাস, ৪। রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, ৫। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। এগুলি সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালে এগুলি দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। **সমাজ-সমালোচন**। পৌষ ১২৮১ (২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৪৭।

ইহাতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "উদ্দীপনা" ও "গ্রাবু" নামে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। **গোচারণের মাঠ** (কাব্য)। বৈশাখ ১২৮৭, ইং ১৮৮০। পৃ. ২৪।

যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত পয়ার ছন্দে লিখিত পল্লীচিত্র।

৫। **হাতে হাতে ফল** (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২৯ মে ১৮৮২)। পৃ. ৫৯।

হাতে হাতে ফল। /(হসন-হাসন)/শ্রীবঙ্গবিলাস সমজ্‌দার/ প্রণীত। /"যেদিকে ফিরাই আঁখি, /কৃষ্ণময় সকলি দেখি।" /১২৮৯/

এই পুস্তিকার ভিতরের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১২৮৮" আছে। ইহা অক্ষয়চন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মিলিত রচনা।

৬। **সংক্ষিপ্ত রামায়ণ**। ইং ১৮৮২ (৩১ মার্চ)। পৃ. ১৬। মূল ও গদ্যানুবাদ।

৭। **আলোচনা**। ইং ১৮৮২ (১ আগষ্ট)। পৃ. ১৯৮।

সূচী :—পশুবৃত্তি, বাণিজ্যে পর-প্রত্যাশা, ধর্ম্ম, মাংসাহার, শক্তি, বাঙ্গালির বিজ্ঞান চর্চ্চা, একতা, রাজনীতি শিক্ষা, অর্জ্জনস্পৃহা বিদেশ ভ্রমণ, আভিজাতিক গৌরব, সংখ্যার দাসত্ব, অহঙ্কার, শিক্ষিত অশিক্ষিতে পার্থক্য, কোন্‌টি নিকটে কোন্‌টি দূরে স্থির করা আবশ্যক, কৃপণ, ভারতমধ্যে বৈষম্য অন্তরে সাম্য আছে, সোনা রূপার কথা, ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিতেছি, উল্কাপাত, বারইয়ারি, দান করে নাম কেনা, মরীচ দ্বীপে আকের চাষ ও চিনির কারবার,

সাধারণের উন্নতি, শরীর পালন, প্রাচীন মিউনিসিপল প্রথা, দেশভক্তি, শক্তিসেবা, ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে রোমরাজ্যের পরিশ্রমের মূল্য ও আহারীয় সামগ্রীর দর কত ছিল, সমগ্র ভারত, সামাজিকতা, মামলাবাজ, রাজনীতিবাজ, হৃদয়ের দান, আপনার অবস্থা অগ্রে বুঝা আবশ্যক।

৮। **সনাতনী**। ১ মাঘ ১৩১৭ (২০ মার্চ ১৯১১)। পৃ. ১৮৬।

সনাতন ধর্ম্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধমালা।

৯। **কবি হেমচন্দ্র**। অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (১৫ মার্চ ১৯১২)। পৃ. ৮৩।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হেমচন্দ্রের সংক্ষীপ্ত জীবনী ও কাব্য-সমালোচনা।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১০। **মোতি-কুমারী**। কার্ত্তিক ১৩২৪, (১০ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৩০।

ইহাতে অক্ষয়চন্দ্রের এই কয়টি লঘু ও সরস রচনা স্থান পাইয়াছে ঃ—১। মোতি-কুমারী, ২। বদরসিক, ৩। কুঞ্জ সরকার ৪। সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার, ৫। হলধর ঘটক, ৬। পূজার গল্প ৭। মশক। প্রথমটি ১৩১৫ সালের 'পূর্ণিমা'য়, ২য়-৪র্থটি প্রথম বর্ষের (১২৯১) 'নবজীবনে', ৫ম ও ৬ষ্ঠটি যথক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'নবজীবনে' এবং সপ্তম বা শেষটি ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১১। **মহাপূজা**। আশ্বিন ১৩২৮, ইং ১৯২১। পৃ. ৪৮।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "মুখবন্ধ" সহ। ইহাতে 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' হইতে সঙ্কলিত দুর্গাপূজা বিষয়ক এই চারিটি

প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে :—১। শারদীয়া মহাপূজা, ২। শক্তি-সেবা, ৩। স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব, ৪। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব।

১২। **রূপক ও রহস্য।** জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ (৪ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ২১৭।

"এই পুস্তকের মধ্যে যে ছত্রিশটি রচনা মুদ্রিত হইল, তাহার সকলগুলিই ১২৭৯ হইতে ১২৯৭ সালের লেখা; অর্থাৎ পিতৃদেবের জীবনের মধ্যভাগের রচনা,—প্রায় ৩২ হইতে ৫০ বৎসর আগের রচনা। সকল লেখাই রূপক ও রহস্য শ্রেণীর, সেই জন্য পুস্তকের নাম 'রূপক ও রহস্য' দেওয়া হইয়াছে।"—গ্রন্থ-পরিচয়।

সূচি :—১। শুধুই রহস্য, ২। নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা, ৩। চারিটি চুটকি, ৪। গ্রন্থ-রহস্য, ৫। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য, ৬। চণকচূর্ণ (ভক্তি), ৭। তুলনায় সমালোচন, ৮। নব মাথুর সংবাদ (কবিতা), ৯। তালতলার চটি, ১০। নবজীবনের আটকৌড়ে (ছড়া), ১১। তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা অনার্য্য, ১২। নাম, ১৩। চণকচূর্ণ (প্রহেলিকা), ১৪। চুল্লি না নির্ব্বাণ হয়, ১৫। নূতন বেতাল পঁচিশ, ১৬। শিরোবচন নাটক, ১৭। ভাই হাততালি, ১৮। পদ্য-পত্র (কবিতা), ১৯। সম্পাদকের নানা জালা, ২০। বিজ্ঞাপন, ২১। বিষম বাজার বা সম্মার্জ্জনী-মেলা, ২২। চণক-চূর্ণ (চুঁচুড়ার সং), ২৩। উপন্যাস, ২৪। মতিচুরের সঙ্গে চেনাচুর, ২৫। নব বাণিজ্য (ছন্দ), ২৬। চণকচূর্ণ (সংবাদ-পত্র), ২৭। ক্রোটনের কথা, ২৮। সাধারণীর প্রশ্নোত্তর, ২৯। ক্ষুদ্রের নিবেদন, ৩০। মহৎ—ক্ষুদ্রের প্রতি, ৩১। সিংহের উপাধি বিতরণ, ৩২। চণকচূর্ণ (অনাদায়), ৩৩। জন্তুধর্ম্মী মানব, ৩৪। শুক-সারী-সংবাদ (গান), ৩৫। গ্রাবু, ৩৬। নব বোধোদয়।

ইহার ৭ম ও ৩৫ সংখ্যক রচনা 'বঙ্গদর্শন' হইতে, ১৮শ সংখ্যক রচনা 'প্রতিমা' হইতে এবং বাকীগুলি 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' হইতে গৃহীত।

১৩। **সাহিত্য-সাধনা**। ১৩৩০ সাল।

কিশোর-পাঠ্য সাহিত্যবিষয়ক রচনাবলী।

১৪। **সাহিত্য-পাঠ**। (পাঠ্য পুস্তক)। (২৪ ডিসেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৭০।

অক্ষয়চন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য-সংসারে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এক দিন অমিত প্রতাপ ছিল। বঙ্কিম-সূর্য যখন মধ্যগগনে, অক্ষয়চন্দ্র তখনই 'সাধারণী' মারফৎ বঙ্কিম-পরিমণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্করূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কমলাকান্তে' অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান দিয়া চিরসম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে যখন অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রধানতঃ তাঁহার হাতে রাজ্যভার দিয়া সাহিত্য-জগৎ হইতে প্রায় বিদায় লইয়াছেন। এই 'নবজীবনে' এবং নবজীবনে'র পনর দিন মাত্র ব্যবধানে প্রকাশিত 'প্রচার' মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; অক্ষয়চন্দ্রই একপ্রকার সাহিত্য-জগতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কার্য্য যে তিনি বিশেষ সক্ষম ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সমসাময়িক প্রমাণ আছে।

অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অকৃত্রিক দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ-প্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন,

তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন ; ইহা শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা জেদে দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল নূতনদের কাছে অক্ষয়চন্দ্র গোঁড়া বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"…অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে।" বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কারকে অক্ষয়চন্দ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাহার ভাল দিক্‌টিকে যুক্তি দিয়া সকলের গ্রাহ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চেষ্টা সে-যুগে অংশতঃ সফল হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁহার বক্তব্য তিনি উকিলের মত যুক্তি দিয়া পাঠকের মর্ম্মে গাঁথিয়া দিতে পারিতেন, ভাবের উচ্ছ্বাসও তাঁহার রচনার আর একটি বিশেষত্ব ছিল। বাংলার প্রাচীন পদাবলী প্রচারেও তাঁহার উদ্যম স্মরণীয়। রচনার নিদর্শন স্বরূপ অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ভাই হাততালি।—ভাই হাততালি! তোমার দুটী হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,—তোমার চট্ চট্ গর্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটুপটু চট্‌চটিতে সেহেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদ স্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর

অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হয়! কালামুখ হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জ্জনের তাড়নায় দুর্জ্জয় কেশবচন্দ্রের তীর্য্যক্ গমনের কথা ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়। প্রথম সেই সুন্দর, গৌর সাম্য, শান্ত মূর্ত্তির ছদচ্ছাদিত সেই বেবব্রত, উপাসনারত, নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কূট-দর্শন-তর্ক-ভেদকারিণী তীক্ষ্ণা বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্ম্মালোচনা, সেই উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণকারিণী উদ্দীপনা—সকলই মনে আসে। তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণে, সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে দূরে বিদূরে হিমপরি-পূরিত নীহারিকাময় গগনপ্রান্তে পরিভ্রমণ—সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি, তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃত কার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আর তুমি একটির পর একটি তাহার পর আর একটি এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভ গ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ;—তোমার শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, শান্তি নাই। বরং জয়োন্মাদে উল্লসিত হইয়া দিন দিন আরও বল সঞ্চয় করিতেছে—এই সকল কথা ভাবিয়া মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি-তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাততালি, তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন

বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্র ভ্রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন। একদিন যে কেশবচন্দ্র য়ুদীয় অবতার খ্রীষ্টের পূর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতিঃ উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জ্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন (Father forgive them ; they know not what they do.)—"পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" সেই দিনের সেই ভক্তিহুঙ্কারে উপস্থিত 'সাক্ষণের' পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয় ইংরাজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিক তাঁহারা যে কি করিতেছেন, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন—আর সেই কেশবচন্দ্র কয় বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই জনতামধ্যে, তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকী! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—Yet I am a singular man) —"তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব"। য়ুদীয় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর এই 'গৌরীভার' সেন-বংশের ধরাতলস্থ কেশবচন্দ্র; সুমেরু কুমেরু ব্যবধানেও এই দূরত্ব পরিমাণের মানদণ্ড হয় না। পোড়া হাততালি! তোমার কলঙ্কের কীর্ত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে কন্যার সুখাভিলাষে বৈষয়িক করিলে, তাঁহার বক্ষঃ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিলে,—এখন সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শরীর সিহরিয়া উঠে। তাই হাত ধরে, ভাই হাততালি তোমাকে বলিতেছি—ভাই দিন কতক তুমি ক্ষান্ত হও। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী, দুঃখিনী, বিদুষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতা সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিতা, ভাগবতে ব্যুৎপন্না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রমনিরতা ও কার্য্যে পটীয়সী। এ হেন স্ত্রীরত্ন ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী আরাধ্য বস্তু, পূজনীয় দেবতা। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা; সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমারী-পূজা ভারতে চির-প্রচলিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চিরপ্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা করিল না; বুঝিল না। তুমি হাততালি! বালক সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলে তোমাকে সহায় করিয়া রমার তোষামোদ করিল। রমা বিদুষী হইলেও অবলা, পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমতি। কাজেই রমার মাথা ঘুরিল; মন টলিল; হৃদয় গলিল; আগুন জ্বলিল।—সে আগুন এখনও নিবে নাই।

একদিন ছিল,এক সময়ও ছিল, তখন রমার অগ্রজ সস্নেহ অথচ কর্কশ কণ্ঠে "এ এ রমা" বলিয়া ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্দুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রজের পার্শ্বে সলজ্জভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোর বায়ুবিগুণে বৈদেশিক আসুরিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যেদিন দয়ানন্দ স্বামীকে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন,—ভারতের গৌরবশ্রী যে দিন সেই উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল; সেই আর একদিন— আর, আর—যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচল চিত্তে বিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—সেই একদিন, সেই এক দুর্দ্দিন। তাই বলিতেছিলাম

পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়ই আমাদের কেবল অহিত সাধন করিবে? তোমার কি শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই।

ভাই হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা দুই তিনি লোককে স্থির থাকিতে দাও। স্থির হইতে দাও। দোহাই তোমার হাসি মুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের, দোহাই তোমার দশ আঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহস্র জিহ্বার, দিনকতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও—তিষ্ঠিতে দাও।

একজন এই সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল; স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয়-তালের জন্য লালায়িত। তবু ত সুরেন্দ্রনাথ দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাবেন—আজিকার দিনে সে কি কম কথা? স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। অপরাধ লইও না, সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্ত দান করিয়া উর্দ্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর নও। স্বীকার করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর, কিন্তু স্বার্থানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থে একেবারে ভুলিয়া যান? তাঁহার চরিত্র যে এরূপ বিসদৃশ, তাহা তো স্বীকার করিতে পারিলাম না,—তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? না—ভালতে মন্দতে এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব; জাতির গৌরব; দেশের গৌরব। যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়, তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে। আর কলঙ্কী হাততালি! তোমার দোষে হইবে।

রাজনীতির অকূল-সাগরে সুরেন্দ্রনাথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই

বিক্ষোভিত হইতেছে,—যে পার সে রক্ষা কর। পাঠ্যাবস্থা শেষ হইতে না হইতে তিনি সিবিল সার্ব্বিস কমিশনারগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত; রাজসেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক জীবনের পাঁচ বৎসর না গত হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী—যে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক,—আমরা তাহা করিব না। না সুরেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই দেশ-হিতৈষী—এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে। তবে যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়—সে আমাদের দোষেই হইবে—আর কালামুখ তুমি, তোমার চটচটির খরতালে হইবে।

আর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ান্‌গণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই;—তাই হাততালি, তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারি দিক্ আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দু সুগন্ধি তৈল নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভাসমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ-

লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণীবিনায়িত চিকুর ঝলমল মুখমণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধরপ্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গসন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে? ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,—তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি? ('নবজীবন,' মাঘ ১২৯১)

———

রামগতি ন্যায়রত্ন

১৮৩১—১৮৯৪

জন্ম

৪ জুলাই ১৮৩১ (২১ আষাঢ় ১২৩৮) তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে রামগতি ন্যায়রত্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর চূড়ামণি।

বাল্য-জীবন

রামগতি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সে সময় সংস্কৃত কলেজে তাঁহার ন্যায় মেধাবী ছাত্র খুব কমই ছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বার জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দেন ও ৮৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। পর-বৎসর তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ৮৲ জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বার সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দেন ও মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-পরীক্ষায় জি. টি. মার্শেল মন্তব্য করেন :—

> **Among the students, special praise is due to Ram Kumal Sharma (1st) and Ramgati Sharma of the Senior dept ;...Ramgati Sharma gave, on this occasion, his first examination in the Senior dept., and yet he stands second on the list,—*General Rep. on Pub. Instruction* for 1850-51, p. 45.**

১৮৫২-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া রামগতি প্রতি বারই ১৬৲ সিনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :—

> Ramkamal Bhattacharjee and Girish Ch. Mookarjee of the 1st class, Shome Nath Mookerjee of the 2nd class, and Ramgati Banerjea of the third class, deserve special notice. Of these again Ramkamal and Ramgati stand pre-eminently superior having attained great success in every branch of their respective studies. (p. 27.)

চাকুরী

ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

২৫ আগষ্ট ১৮৫৬ : দ্বিতীয় অধ্যাপক, হুগলী নর্মাল স্কুল, বেতন ৫০৲।
ডিসেম্বর ১৮৬২ : প্রধান শিক্ষক, বর্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরু ট্রেনিং স্কুল, বেতন ১০০৲।
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ : সংস্কৃতাধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ, বেতন ১৫০৲।
২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯* : হেড মাষ্টার, হুগলী নর্মাল স্কুল।
জুলাই ১৮৯১ : অবসর গ্রহণ।

মৃত্যু

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন বৎসর তিন মাস পেন্সন্ ভোগ করিয়াছিলেন। ৯ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে চুঁচুড়ার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* Hist. of Services of Gazetted Officers....(1891). p. 305.

গ্রন্থাবলী

ন্যায়রত্ন যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।**

মাঘ, ১৯১৪ সংবৎ (ইং ১৮৫৮)। পৃ. ৯৩+১ শুদ্ধিপত্র।

"শ্রীযুক্ত কাপ্তেন্ রিচার্ডষন্ সাহেব প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে এই গ্রন্থখানি অনুবাদিত।"

২। **বস্তুবিচার।** পৌষ, সংবৎ ১৯১৫ (ইং১৮৫৯)।

"এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহে বস্তুবিদ্যার অনুশীলন অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ঐ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই। এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সচরাচর-প্রচলিত ও শুশ্রূষা-জনক-গুণসম্পন্ন কতিপয় বস্তুর আকার প্রকার, প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিলাম।" বিজ্ঞাপন।

৩। **বাঙ্গালার ইতিহাস,** ১ম ভাগ। ১ বৈশাখ সংবৎ ১৯১৬ (ইং ১৮৫৯)।

"ইহাতে বৈদ্যবংশীয় হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অধিকারকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল সঙ্ক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

৪। **রোমাবতী** (আখ্যায়িকা)। ২৫ পৌষ, সংবৎ ১৯১৮ (ইং ১৮৬২)।

৫। **বাঙ্গালা ব্যাকরণ।** ইং ১৮৬৪। পৃ. ৯২।

৬। **ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস**। ইং ১৮৬৫। পৃ. ২০৪।

"কিছু স্বল্পায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষাপ্রদানোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসখানি সঙ্কলিত হইল। ইহাতে হিন্দু রাজগণের অধিকার হইতে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রাকের আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের স্থূল স্থূল বিবরণ সকল সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে।"—বিজ্ঞাপন।

৭। **ঋজু ব্যাখ্যা**। ইং ১৮৬৬ (?)

৮। **শিশুপাঠ**। (১৮ মার্চ ১৮৬৮)। পৃ. ৩৬।

৯। **দময়ন্তী**। (২৫ জানুয়ারি ১৮৬৯)। পৃ. ৫৮।

দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা "A Tale in Sanskrit Prose rendered from the Mahabharat."

১০। **চণ্ডী**। (৫ জুন ১৮৭২))। পৃ.১০৯।

১১। **বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব**, ১ম ভাগ। শ্রাবণ, ১৯২৯ সংবৎ (১৫ জুলাই ১৮৭২)। পৃ. ১৬৮।

এই গ্রন্থখানি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ। "এই ভাগে বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর রচনার সময় পর্য্যন্ত এই কালমধ্যে উক্ত ভাষার যে যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে—ঐ কালে রচিত প্রধান প্রধান বাঙ্গালাগ্রন্থ সকলের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সহকারে—তাহার উল্লেখ, এবং তত্তদ্-গ্রন্থকারগণের কিঞ্চিৎ জীবনবৃত্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

ইহার ২য় ভাগ (পৃ. ১৬৯-৭৩) কয়েক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (পৃ. ৩৭৩)

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে (আষাঢ়, সংবৎ ১৯৩০) প্রকাশিত হয়। "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশ করিয়া উভয় ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম।"

১২। **ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।** (১০ জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ২০৫।

১৩। **গোষ্ঠী কথা** (মজলিসি গল্প)। (৭ জুন ১৮৭৭)। পৃ. ৯৩।

"আকারেই ব্যক্ত।—মহাদেব তর্কভূষণের পুত্র ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনার সাংসারিক ক্লেশের কথা জানাইয়া কহিল, মহাশয়! আমার পিতা দেশবিখ্যাত লোক ছিলেন, কিন্তু আমি উদরান্নের জন্য লালায়িত—আমার বড় দুরাদৃষ্ট। বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন—তাহা আকারেই (!) ব্যক্ত হইতেছে।"

১৪। **কুপিতকৌশিক নাটক।** ১২৮৫ সাল (২৮ জুন ১৮৭৮)। পৃ. ৮৫।

"...যদি কোনও নাটকে অধিক সঙ্খ্যায় গীত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যাত্রাকারকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সেই সুবিধাকরণের অভিপ্রায়েই আর্য্যক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক অবলম্বন করিয়া এই কুপিতকৌশিক নাটক লিখিত হইল। ইহাতে ৩০টি গীত আছে।"

১৫। **নীতিপথ।** ১৭ আষাঢ় ১৯৩৮ সংবৎ (২০ জুলাই ১৮৮১)। পৃ. ৯৬।

১৬। **রামচরিত**। ১২৮৯ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ১০১।

" "পরিণত-প্রজ্ঞ" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীর চরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই স্থূল বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের যৎসামান্য আভাসমাত্রই পাইবেন নাই।"

১৭। **ইলছোবা**। অথবা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান। ১২৯৫ সাল (১০ অক্টোবর ১৮৮৮)। পৃ. ১৪৪।

"ইলছোবা-নিবাসী যে ব্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বসিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন "স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র!"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪০*

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৮২২—১৮৯১
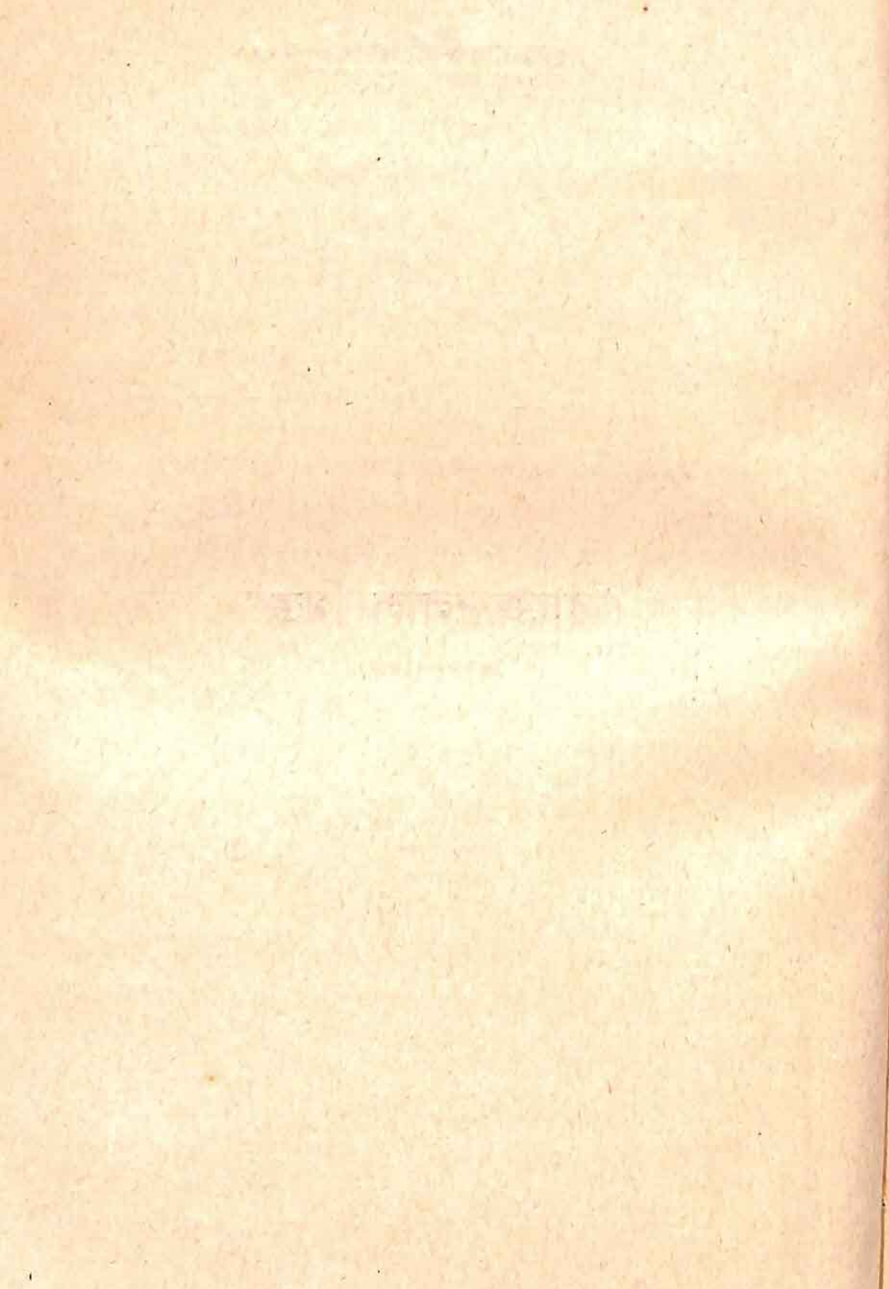
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

রাজেন্দ্রলাল মিত্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের একজন দিক্‌পাল পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিৎ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শুধু বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও ছড়াইয়া পড়িয়া সেখানকার বিদ্বজ্জন-সমাজে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার গভীর অধ্যয়ন এবং অক্লান্ত গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির বহু অজানা অন্ধকার কক্ষ অভিনব আলোকসম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য নহে, আর একটি কারণেও রাজেন্দ্রলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়—সেটি মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ। ইহার কল্যাণ, পরিপুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতেন এবং কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও সাধ্যমত এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদন, বাংলা পুস্তক-সমালোচনায় নব ধারার প্রবর্ত্তন, ভৌগোলিক পরিভাষা গঠন প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্য-প্রচেষ্টার অন্যতম পথিকৃৎরূপে তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। পরিমাণে স্বল্প হইলেও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দান উপেক্ষণীয় নহে। দুঃখের বিষয়, যথাসময়ে পুস্তকাকারে সেগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় রাজেন্দ্রলালের অন্য কীর্ত্তির আড়ালে তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি চাপা পড়িয়া আছে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

কলিকাতা, শুঁড়ায় এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ-কুলে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—জনমেজয় মিত্র। জনমেজয় ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং একাধিক গ্রন্থ বাংলায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

রাজেন্দ্রলালের জন্ম—১৮২২ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী।† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রাজেন্দ্রলালের একখানি নোট-বই রক্ষিত

* জনমেজয়ের প্রকাশিত এই তিনখানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি:—১। নারদ পুরাণোক্ত অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় অনুক্রমণিকা (১৭৭৭ শক); ২। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা (২ সং, ১৭৮১ শক); ৩। সংগীত রসার্ণব (১৭৮২ শক)।

† ১২৯৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী" প্রবন্ধে (পৃ. ৫৪৪) রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৫ তারিখের স্বীয় রোজনামচায় লিখিত নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে:—"আমার বয়স যত বিবেচিত হয়, তাহা অপেক্ষা আমি এক বৎসরের ছোট। জন্ম-পত্রিকায় ১৭৪৩।১০।৫।৬।২।৩০ লিখিত আছে; ইহাতেই বুঝি, ১৭৪৩ শকের ৬ই ফাল্গুন (ইহা ভুল, ৫ই ফাল্গুন হইবে।) শনিবার ৬ দণ্ড, ৫২ পল, ৩০ অনুপল, তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষ। ইহাতে আমার বয়স ৫৩ বৎসর হয়। ইহার প্রকৃত পাঠ কিন্তু এইরূপই হইবে, ১৭৪৩ শকের পর ১০ মাস ৫ দিন, ৬ দণ্ড ৫২ পল এবং ১ পলের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৭৪৪ শকের ১১ মাসের ৬ষ্ঠ দিন। 'প্রিন্সেপ টেবিলে'র অনুসারে ইংরাজি বৎসর হইবে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। আগামী মাসের ১৪ই তারিখ আমার ৫২ বৎসর পূর্ণ হইবে।"

রাজেন্দ্রলালের গণনায় ভুল আছে। তিনি প্রথমতঃ ১৭৪৪ শকের ফাল্গুন মাসকে "ইং ১৮২৩" না ধরিয়া "ইং ১৮২৪ ধরিয়াছেন। আবার, ১৮২৩ বা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি "কৃষ্ণাদশমী শনিবার" হয় না,—হয় "শুক্লা-পঞ্চমী শনিবার" ও "পূর্ণিমা রবিবার"। এই কারণে আমরা তাঁহার নোট-বইয়ে প্রদত্ত জন্ম-তারিখ—১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ নির্ভুল বলিয়া মনে করি।

আছে ; তাহাতে তিনি স্বয়ং তাঁহার জন্ম-তারিখ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্য তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ শকীয় ১২২৮ ফালগুন সৌরস্য ষষ্ঠ দিবস শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে বেলা ৩০ অনুপলাধিক ষষ্ঠ দণ্ড ৫২ পল সময়ে ইং ১৮২২ সালে ফিবরেওারি মাসস্য ষোড়স দিবসে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয় ॥—"

ছাত্র-জীবন

শৈশব ও ছাত্র-জীবনের কথা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নোট-বইয়ে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"১২৩৩ সালের মাঘ মাসে বঙ্গভাষা শিখিতে আরব্ধ করি।—শ্রীর মিত্র।

১২৩৫ সালে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ নন্দীর নিকট ইংরাজি পাঠ করিতে আরব্ধ করি।—শ্রীর মিত্র।

১২৪৮ সালে [পাথুরিয়াঘাটাস্থ] শ্রীযুক্ত ক্ষেমচন্দ্র বসুর স্কুলে (ইংরাজি বিদ্যালয়) যাই।—

১২৪০ সালে উক্ত স্কুল ত্যাগ করি।

১২৪১ সালে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাকের [হিন্দু ফ্রি] স্কুলে যাই এবং দুই বৎসর পরে ত্যাগ করি। ১২৪৩ সালে প্লীহা আদি রোগ ভোগ করি।

১২৪৪ সালে ইং ১৮৩৭ সালে ৩ ডিসেম্বর দিবস মেডিকেল কালেজে যাই এবং ইং ১৮৪১ সালের মে মাসস্য ১২ দিবসে

কালেজেস্থ প্রধান সাহেবদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত কালেজ ত্যাগ করি ॥—শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র"

রাজেন্দ্রলাল মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

After a careful exmination the Examiners were of opinion, that the five following students whose names are written in the order of their merit, deserved the Prizes.

Satcowree Dutt
Rajender Mittre
... ...

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি এই পুরস্কার বিতরিত হয়। রাজেন্দ্রলাল একটি রৌপ্যপদক ও ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।*

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া রাজেন্দ্রলাল অল্প দিন আইন পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি একাগ্রচিত্তে ভাষানুশীলনে রত হন। ফার্সী তিনি ভালই জানিতেন, ক্রমে সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাতেও পারদর্শী হইয়া উঠেন।

বিবাহ

মেডিক্যাল কলেজে পঠদ্দশায় রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা নিমতলার দত্ত পরিবারে বিবাহ করেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত নোট-বইয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

---

* *The Friend of India* for 25 Feb., 1841.

"১২৪৬ সালের শ্রাবণ মাসস্য, ২১ দিবসে রাত্র দুই প্রহর একটার পর শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস দত্তজর তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীকে বিবাহ করি॥—শ্রীর মিত্র

১২৫১ সালের ১৫ই ভাদ্র ইং ১৮৪৪ সালের ৩০ আগষ্ট রাত্র ২॥ প্রহর সময়ে অস্মদ্গেহিনী পরলোকপ্রাপ্তা হয়।—শ্রীর মিত্র

১২৫১ সালের ১ অগ্রহায়ণ রাত্র ৮টার সময় আমার প্রথমা কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা হয়।—শ্রীর মিত্র"

আনুমানিক ৩৮ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। পাত্রী—ভবানীপুর-নিবাসী কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনী। ইঁহার গর্ভে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র—রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন।

অন্ন-সংস্থানে

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি।—১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৲ বেতনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৪ নবেম্বর ১৮৪৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> The Committees recommended that *Baboo Rajender Mittro* be appointed *Librarian* and *Assistant Secretary*, on a salary of 100 Rs. per mensem. The appointment to be on trial for six months; that the Librarian be required to attend in the Library from 10 to 4 daily, Hindu Holidays included; and that in his capacity of *Assistant Secretary* he correct all proofs, and prepare all routine letters for the Secretary's office.

এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত রাজেন্দ্রলালের গবেষক-জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এখানে কর্ম্মগ্রহণ করিবার পর যেন তিনি তাঁহার নিজের পথ খুঁজিয়া পাইলেন—সংস্কৃত-সহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল, বহু প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি পুরাতত্ত্বের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। সোসাইটির বিপুল গ্রন্থসংগ্রহ এক দিকে যেমন তাঁহার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিল, অন্য দিকে তেমনি সংস্কৃত-সাহিত্য মন্থন করিয়া লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের প্রেরণাও দান করিল। অধ্যয়ন ও অনুশীলনে ক্রমেই তিনি পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং সোসাইটির জর্ণালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ইত্যাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্রলাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটিতে কার্য্য করিয়াছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সোসাইটির অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> Chairman announced to the meeting that Babu Rajendralal Mittra had notified to the Council his resignation from the 1st proximo of the office of Assistant Secretary and Librarian to the Society, and after paying a high compliment to the industry and the ability of that valuable officer,...

এই অধিবেশনেই রাজেন্দ্রলাল যথারীতি সোসাইটির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত এবং পরবর্ত্তী জুন মাসে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন।—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় অ্যাক্ট ২৬ পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য—'কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উন্নততর

ব্যবস্থা।' সাক্ষাৎভাবে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালকদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন খোলা হয়।* রাজেন্দ্রলাল মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন উঠিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রলালও মাসিক ৫০০৲ পেন্‌সনে অবসর গ্রহণ করেন।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।—রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। মাসিকপত্রের সম্পাদক-রূপেও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাময়িক-পত্রের সহিত প্রথম তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে।

১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র (১৬ আগষ্ট ১৮৪৩) তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর-জ্ঞান প্রচারই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম-বিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বাদিও আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৭০ ও ১৭৭২ শকে রাজেন্দ্রলাল যে পত্রিকার প্রবন্ধ-

* চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে প্রথমে ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহা মাণিকতলা আপার সারকুলার রোডে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

নির্ব্বাচনী সভা বা পেপার কমিটির পাঁচজন সভ্য বা গ্রন্থাধ্যক্ষের অন্যতম ছিলেন, তাঁহার প্রমাণ আছে। "সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ, কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।"*

"গ্রন্থাধ্যক্ষ"গণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ছিলেন। রাজেন্দ্রলালও এই গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'।—রচনা নির্ব্বাচনে রাজেন্দ্রলাল কিরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহার প্রমাণ তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকায় জাজ্জল্যমান। নিজে এত বড় পণ্ডিত হইলেও সাধারণ পাঠকের মনের চাহিদা কোন্ শ্রেণীর রচনায় মেটে সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেই জন্য তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' তখনকার দিনে সাধারণ পাঠক-সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও জনপ্রিয় হইয়াছিল।

ভার্ণাকিউলার লিটারেচর কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যম এই পত্রিকা প্রকাশের মূলে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—" to publish translations of such works as are not included in the design

---

* নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : 'অক্ষয়-চরিত,' পৃ. ১৯-২৫।

of the Tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other, and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal."* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হজসন্ প্র্যাট্, সীটনকার, পাদরি লং ও রবিন্সন-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। রাজেন্দ্রলালও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) বিলাতী 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে "পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক" একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন।† বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এবং কেন ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইত তাহা বুঝা যাইবে :—

---

* Long's *Returns*...(1859), p. liv. মৌলিক রচনার জন্যও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ দুই শত টাকার কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও ভাষানুবাদক-সমাজের সহ-সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'সুশীলার উপাখ্যান' রচনা করিয়া এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। (*Ibid*., p. xix.)

† পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিকট হইতে মাসিক ৮০৲ টাকা সাহায্য পাইতেন। (*Ibid*. p. lv.)

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্বাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?… সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না।"

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ৭ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করেন—রাজেন্দ্রলাল। ৭ম পর্ব্বের (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক) সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিভিন্ন পর্ব্বের প্রকাশকাল এইরূপ :—

১ম পর্ব্ব ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক—১৭৭৪ শক, আশ্বিন।
২য় পর্ব্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ —১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ।
৩য় পর্ব্ব ১৭৭৫ শক, চৈত্র —১৭৭৬ শক, ফাল্গুন।
৪র্থ পর্ব্ব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র।
৫ম পর্ব্ব ১৭৮০ শক, বৈশাখ—চৈত্র।
৬ষ্ঠ পর্ব্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ—চৈত্র।

'রহস্য-সন্দর্ভ'।—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভার্ণাকিউলার লিটারেচর কমিটি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সমাজের আনুকূল্যে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র অভাব পূরণার্থ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালই ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> …অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম-দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশ্যে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে ;…

রাজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখান সম্পাদন করেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি পঞ্চম পর্ব্বের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ৬ষ্ঠ পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র "বিজ্ঞাপনে" রাজেন্দ্রলাল জানাইতে বাধ্য হইলেন যে—

> সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

ইহার পর প্রাণনাথ দত্ত দুই বৎসর 'রহস্য-সন্দর্ভ' পরিচালন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভে'র বিভিন্ন পর্ব্বগুলির প্রকাশকাল এইরূপ :—

হইল। ইহাতে শিল্পশাস্ত্রের আদ্যোপান্তের সমালোচন করিবার কিছুমাত্র আয়াস করা হয় নাই,...। কয়লার খনিবিষয়ক প্রস্তাব ভিন্ন অপর সকল প্রস্তাবগুলি এক ব্যক্তিকর্তৃক রচিত হয়।"

ইহাতে "ঢাকাই বস্ত্র," "চর্ম্ম পরিষ্কার করণের প্রথা," "রেশম," "কাগজ," "লবণ," "তামাক," "লৌহ," "সাবান" প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে।

৩। **শিবজীর চরিত্র** অর্থাৎ যবনপ্রমর্দ্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানদের জীবন বৃত্তান্ত। নবেম্বর ১৮৬০। পৃ. ৭৮।

"গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ"-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ:—"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকর্তৃক যে সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন করা প্রথম সঙ্কল্পিত হয়, তন্মধ্যে শিবজীর চরিত্র লিখিত ছিল। তৎকালে বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রের সম্পাদক ঐ পুস্তক প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশাভাব-প্রযুক্ত তিনি অতি অল্পমাত্র লিখিয়াই বিরত হন। পরে কতিপয় সল্লেখকের সাহায্যে তাহার অবিশিষ্ট লিখিত হইয়া বিবিধার্থ-সংগ্রহে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছে। অধুনা সেই আদর্শ হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইল।"

৪। **মেবারের রাজেতিবৃত্ত**। ইং ১৮৬১ (?)। পৃ. ১৩২।

ইহাও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমরা এই পুস্তকখানি দেখি নাই।

৫। **ব্যাকরণ-প্রবেশ** অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ। ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০।

অল্পবয়স্ক বালকদিগকে গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ দিবার উপযুক্ত কোন সুলভ গ্রন্থ না থাকা প্রযুক্ত কলিকাতা-স্কুলবুক-

সোসাইটীর আদেশে শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবকৃত 'বাঙ্গলার ব্যাকরণ' গ্রন্থের পরিশোধন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা হয়, কিন্তু কএক পৃষ্ঠার পর আর সে আদর্শের অবলম্বন করা বিহিত বোধ না হওয়ায় সমস্তই স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে বিরচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বালকদিগকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্যের উপদেশ দেওয়া অভিপ্রেত। ঐ তাৎপর্য্যের বোধ হইলে পর প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারিবেক। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৪।—"বিজ্ঞাপন"

৬। *Prayer of St. Niersis Clajensis.* Translated into Bengali and Sanskrita. ইং ১৮৬২। পৃ. ২০।

"হে দেবপুত্র! হে সত্যদেব! তুমি পিতার হৃদয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত পবিত্রকুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলে, সমাধিস্থ হইয়াছিলে, এবং তথাহইতে উত্থান করিয়া পিতার নিকট গমন করিয়াছিলে। আমি স্বর্গের নিকট এবং তোমার নিকট পাপ করিয়াছি; যখন তুমি আপনার রাজ্যে আগমন করিবে তখন অনুতাপী তস্করের ন্যায় আমাকে স্মরণ করিও। তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী আমার প্রতি দয়া কর ॥ ৪ ॥ (পৃ. ২)

* * *

হে দেবপুত্র! হে সত্যদেব! ত্বং পিতৃহৃদয়াৎ অবতীর্য্য অস্মৎ-পরিত্রাণায় পবিত্রায়াঃ মেরীকুমার্য্যা গর্ভাৎ অবততর্থ, ত্বং ক্রুশ-বিদ্ধোঽভবঃ, ত্বং সমাধিস্থোঽভবঃ, তস্মাৎ উত্থায় পিতুঃ সমীপেঽগমঃ। তব স্বর্গস্য চ সমীপেঽহং পাপমকার্ষং। যদা ত্বং স্বরাজ্যং আগমিষ্যসি

তদা অনুতাপিতস্করমিব মামনুস্মর। তদীয়জীবান্ প্রতি এনমুৎকট-পাপিনঞ্চ প্রতি সদয়ো ভব। (পৃ. ১২)

৭। **পত্রকৌমুদী** নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশক গ্রন্থ। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১০০।

"শ্রীযুক্ত অনরেবল্ ওয়ালটর্ স্কট্ সিটেন্‌কার তথ্য শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।"

'পত্রকৌমুদী'র প্রথম খণ্ডে গুরুজন, স্নেহভাজন, অধীনস্থ ব্যক্তি প্রভৃতিকে পত্র লিখিবার আদর্শ আছে। "দ্বিতীয় খণ্ডে পাট্যা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধীয় লেখন, তৃতীয় খণ্ডে জমীদারী ও অন্য হিসাব ও চতুর্থ খণ্ডে বিচারালয়ের প্রচলিত লেখন কএক খানির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে।"

৮। **অশৌচ ব্যবস্থা**। ইং ১৮৭৩। পৃ. ৯২

এই পুস্তকখানি এখনও আমরা দেখি নাই।

৯। **মানচিত্র**। ইং ১৮৫০-৬৮।

১৮৫০-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ কয়েকখানি ছোট-বড় মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গাক্ষরে সর্ব্বপ্রথমে এ দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গাক্ষরে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সকল জেলার মানচিত্র (ইং ১৮৬৮), এবং Physical Chart বা ভৌতিক মানচিত্রও (ইং ১৮৫৪) প্রকাশ করেন। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের রাজসরকারের জন্য তিনি ১৮৫৩-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগরী অক্ষরে ভারতবর্ষের এবং ফার্সী অক্ষরে ভারতবর্ষের ও এশিয়ার মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত :

রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটি-প্রবর্ত্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় যে-সকল প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নিম্নে সেগুলির তালিকা দেওয়া হইল। এই সকল গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয় ; আমরা যে প্রকাশকাল দিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ গ্রন্থের আখ্যা-পত্র হইতে গৃহীত।

১। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ... ইং ১৮৫৪

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১-৩ খণ্ড। ... ১৮৫৯,-৬২, -৯০

৩। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ... ১৮৭১

ইংরেজী ভূমিকার তারিখ—সেপ্টেম্বর ১৮৭২

৪। গোপথ-ব্রাহ্মণ ... ১৮৭২

৫। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ... ১৮৭২

৬। অগ্নিপুরাণ, ১-৩ খণ্ড ... ১৮৭৩,-৭৬,-৭৯

৭। ঐতরেয় আরণ্যক ... ১৮৭৬

৮। ললিতবিস্তর ... ১৮৭৭

৯। বায়ুপুরাণ, ১-২ খণ্ড ... ১৮৮০,-৮৬

১০। নীতিসার, কামন্দক-কৃত ... ১৮৮৪

১১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ... ১৮৮৮

১২। বৃহদ্দেবতা, শৌনক-কৃত ... ১৮৯২

ইহা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল আথর্ব্বণোপনিষদ্ ৯ খণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে।

British Indian Association ; A Vote of Thanks to Sir John Budd Phear ; The Indian Civil Service Examination ; The Disestablishment of the Church in India ; The Twenty-fifth Annual Meeting of the British Indian Association ; Maharaja Roma Nath Tagore Memorial Meeting ; The Hon'ble Dr. Sircar and the Faculty of Medicine ; The Doorga Pooja Holiday Question ; The Parsis of Bombay , Dr. Hœrnle's Appointment and Romanization ; The Education Commission, etc. ; The Bengal Tenancy Bill ; The Ilbert Bill, etc. ; Amalgamation of the Calcutta and Suburban Municipalities ; Adulteration of Ghee, etc. ; The Queen's Jubilee ; The Second National Congress ; The Hindu Marriage Question ; The Thirty-seventh Annual Meeting of the British Indian Association ; Isolation of Lepers. APPENDIX : Report of the Entrance Examination Committee : The Age of Consent Bill.

সাময়িক-পত্রে ইংরেজী রচনা ঃ

পুরাতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে তাঁহার লিখিত গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; *Centenary Review* of the Asiatic Society পুস্তকে (পৃ. ১৬০-৬২) এই সকল প্রবন্ধের তালিকা (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) আছে। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল, Transactions of the Anthropological Society of London, Journal of the Photographic Society of Bengal, *Calcutta Review*, *Mookerjee's Magazine* প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত *Englishman*, *Daily News*, *Statesman*, *Phoenix*, *Citizen*, *Friend of India*, *Indian Field*,

Hindoo Patriot প্রভৃতিতে তাঁহার লিখিত পুস্তক-সমালোচনা, পত্রাবলী ও সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

পত্রাবলী

পুরী স্কুলের হেড মাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল এগুলি লিখিয়াছিলেন। কয়েকখানি পত্রের অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহাশয়েষু—

আপনার পত্র পাইয়া পরম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এতন্নিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের মস্তকের কথা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী, তবে আপনি অনুমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুঁড়িকাষ্ঠ, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাদ্রিমহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব যাহারা ভদ্রাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কি না ?…

কোণারকের মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, আমার বোধ হয় তদ্দৃষ্টান্তেই পূর্ব্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ অশ্বমূর্ত্তি উত্তর পূর্ব্ব দ্বারে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্ত্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাকেই জয়া বিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে পূর্ব্বে উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। আমার অনুভবানুসারে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, উহাই এক্ষণে জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্নাথের মূর্ত্তি সমাহিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমি শুনিয়াছি, উক্ত কার্য্য ৫০।৬০ বৎসর অন্তরে সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্য পুরী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে জগন্নাথের করযুগল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টির অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

মদাত্মীয়েষু—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গত কল্য আপনার ৯ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত

উড়িষ্যার মুদ্রাকার্য্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হয় এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য্য সমাধা হইবে। ইতোমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল তাহা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু পরে জমি বসিয়া তাহা পড়িয়া যায়; এই এক্ষণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আবুল ফাজল এবং জগমোহনের অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পারিত না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নির্ম্মিত নহে। নিলাদ্রি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অট্টালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়, সুতরাং বসিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এবং তাঁহার সময় হণ্টার সাহেব নিদিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দ্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ অংশ দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ ঐ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই ; স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই অপর স্থানে কর্ষিত হইয়াছে সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই।...

মাণিকতলা
২২শে নবেম্বর

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

মদাত্মীয়েষু—

২২শে দিবসীয় আপনার পত্র গতকল্য অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছি। বীজকগুলির পাঠে বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।...

আমি উড়িয়া ভাষায় কোন মতে পটু নহি। অতএব আপনি যে অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নাম দিয়া ছাপাইব এই মনস্থ করিয়াছি।...

মহারাষ্ট্র ভাষায় 'চা' শব্দটি সম্বন্ধ প্রত্যয় বটে ; পরন্তু 'গুণ্ডিচা' শব্দ প্রাচীন ; উহা বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভাষা হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে।

জগন্নাথ দেবের অন্তরে যে একখানি অস্থি স্থাপিত করা হয়, তাহাতে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই স্থির হয় না। অনুভবে কাহারও আস্থা হইবার নহে। বৌদ্ধদন্তের উল্লেখ আমি করিয়াছি। কনিংহাম সাহেবের Geography of Ancient India গ্রন্থে উড়িষ্যার বৌদ্ধদিগের উল্লেখ আছে ; কিন্তু কি তাহাতে কি অন্যত্র ধারাবাহিক কিছুই লেখা নাই।...

সারস্বত সমাজ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরু গবেষণা এবং নানা জনকল্যাণকর কর্ম্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকিলেও, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চিন্তা রাজেন্দ্রলালের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। সেই জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলা পরিভাষা নির্ণয়াদির উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তিনি সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> "বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদয় হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।"

রাজেন্দ্রলাল "উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি এই সারস্বত সমাজের সভাপতি ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সমাজের প্রথম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ অন্যতর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, রাজেন্দ্রলাল বাংলা পরিভাষিক শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি যথাযথ পারিভাষিক শব্দ নির্ম্মাণেও বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বাংলা পরিভাষিক শব্দ গঠনের কার্য্যে যাঁহারা

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সারস্বত সমাজের নিম্নোদ্ধৃত কার্য্যবিবরণটি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন ঃ—

"১২৮৯ সালে শ্রাবণমাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গ ভাষার সাহায্য করিতে হইলে কি কি কার্য্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ বানানের উন্নতি সাধন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দ বিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষর বিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম সকল বাঙ্গলায় কি রূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে ভিক্টো [রিয়া বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্ত্যস্থ "ব" সহজেই [? প্রয়োগ] হইতে পারে। ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাঙ্গলায় বিস্তর [গোল]যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরেজী isthmus "ডমরুর-মধ্য" কেহ বা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের

মধ্যে কোনটাই হয়ত সার্থক হয় নাই।—অতএব এই সকল শব্দ নির্ব্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন—এই সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে—যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। স্থির হইল—বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।"*

ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদনে করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

* "রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ," 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' কার্ত্তিক—পৌষ ১৩৫০, পৃ. ২১৮-১৯।

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানবচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরু-মধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus channel mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsulaকে বাঙ্গালায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। "প্রায়দ্বীপ" শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি

অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তি সুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White Mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারি জন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।"*

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজের অন্যতম সহযোগী সভাপতি ছিলেন, "কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না" ('জীবন-স্মৃতি', পৃ. ২৪১)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু এই সভার নাম ইংরাজীতে 'Academy of Bengnli Literature' রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"

সারস্বত সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাজেন্দ্রলালের মনীষা এবং কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই

---

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,' পৃ. ১১২-১৬।

আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।...বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোন কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।...তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।"

প্রতিভার সম্মান

বিদেশে সম্মান।—ভাষাতত্ত্ববিৎ ও পুরাতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি (ইং ১৮৬৫) ও ভিয়েনা, ইটালী প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে নিজেদের "সম্মানিত সভ্য" (অনরারি মেম্বর) নির্ব্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। নিজের অতুলনীয় প্রতিভাবলে রাজেন্দ্রলাল দেশ-বিদেশের সমসাময়িক প্রাচ্যতত্ত্ববিৎদের মধ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, মহামনীষী ম্যাক্সমূলার পর্য্যন্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য যুক্তি বিচারনৈপুণ্য এবং সংস্কৃত জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ ভারতের সমকালীন পুরাতত্ত্ববিৎদের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

their researches into the literary treasures of his country. His English is remarkably clear and simple, and his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in England.'

And again :—

'Our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard, if, with such men as Babu Rajendralala in the field, they are not to be distanced in the race of scholarship'—*University of Calcutta Convocation Addresses*, Vol. I. 1858-79. pp, 34-42.

রাজসম্মান।—রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর," ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "সি. আই. ই" ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা" উপাধি দান করেন।

জনহিতকর কার্য্য

পৌর-সেবা।—রাজেন্দ্রলালের কর্ম্মশক্তিও ছিল অসীম। বাস্তবিকই তিনি একজন কর্ম্মবীর ছিলেন। শুধু অধ্যয়ন ও গবেষণাতেই তিনি জীবনপাত করেন নাই, বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পৌর-সেবায়ও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব কম নহে। ১৮৬৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পৌরকার্য্য যে কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, তাহার সভ্যগণ 'জষ্টিস-অব-দি পীস' নামে অভিহিত হইতেন। রাজেন্দ্রলালও একজন জষ্টিস-অব-দি পীস ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন আইন মতে পুনর্গঠিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মপরিচালক-সভার সভ্যগণ করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতে আরম্ভ হন; এই সময় রাজেন্দ্রলালও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাচিত

সদস্যরূপে পৌরসভায় কলিকাতাবাসীর সুযোগ-সুবিধাকল্পে অবিরত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া করদাতাদের করভার লাঘব করিবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পৌরসভা মারফৎ অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

হাণ্টার কমিশনে সাক্ষ্য।—তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌রূপেও রাজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠা ছিল। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সেন্ট্রাল টেক্সট-বুক কমিটির সভাপতি, কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সভ্য ইত্যাদি নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ভারতের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় শিল্পবিদ্যালয় বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল (বর্ত্তমানে গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রথমাবধি বহু বৎসর উহার যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।* শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত রাজেন্দ্রলালের যোগাযোগ ছিল বলিয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখে ভারত-সরকার যখন সার্ উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে কুড়ি জন সদস্যকে লইয়া একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন, তখন তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয়—"With a view to enquiring into the working of the existing system of Public Instruction, and to the further extension of that system on a popular basis."

---

* এই প্রসঙ্গে ১৩৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

এই কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গদেশের কমিটি এই কয় জনকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল : এ. ডবলিউ. ক্রফ্ট (চেয়ারম্যান), ডবলিউ. আর. ব্র্যাকেট, আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইহারা মূল কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। কমিশনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে রাজেন্দ্রলালের ও পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রাজেন্দ্রলাল কমিটির নিকট দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেন ; উহা ঐ কমিশনের রিপোর্টে (পৃঃ ৩২৯-৪৭) মুদ্রিত আছে। রাজেন্দ্রলাল তাঁহার বিবরণের শিরোভাগে বলিয়াছেন :—

> I am a fellow of the Calcutta University of twenty years' standing and President of the Central Text-book Committee. I was Director of the Government Wards' Institution for five and twenty years ; Secretary to the Vernacular Literature Society for some years ; and a member of the Calcutta School-book Society for twenty-seven years ; and Joint Secretary and Treasurer to the Industrial Art School for several years. I have studied the problem of Indian education for nearly forty years. (p. 329)
>
> ...Thirty years ago I prepared a map of India in the Bengali character, and in a few years cleared Rs. 12,000 by the speculation. The same map was rendered into Uriya letters at the cost of Rs. 2,000 paid by Government...I prepared a similar map in the Nagari character, at the request of the late Mr. John Colvin, then Lieutenant Governor of the North-

Western Provinces, and it is, I think, still current. (p. 334).

প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষালয়ের তুলনা করিয়া তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

The departmental schools are mostly relics of the old village system ; but they have neither the vitality nor the usefulness of their originals. The old village school was a part of the village municipality, and was the object of solicitude to the heads ef the community. It had, in many instances, rent-free lands, and was so far self-supporting. The rent-free lands have since been resumed by Government or by the Zeminder ; the village panchayats are either non-existent, or powerless for good or for evil, having no control over the village school ; and that which thrived under the immediate inspection and control of the resident village head-men deeply interested in its welfare, now depends solely on the exertion of the Guru, or looks to the Deputy Inspector of Schools, for its existence....

The subjects taught were not many—writing and arithmetic completed the whole course ; but the writing included letter-forms and ordinary business forms, and the arithmetic included a great deal of mental arithmetic and ready reckoning and Zemindery, mercantile and trade-accounts.

The old school was useful, because it supplied what was wanted ; the new one teaches much that is subservient to no immediate useful purpose to the

এই সভার সহ-সভাপতি (১৮৭৮-৮০, ১৮৮৭-৮৮, ১৮৯০-৯১) এবং চারি বৎসর সভাপতি (১৮৮১-৮২, ১৮৮৩-৮৪, ১৮৮৬ ৮৭, ১৮৮৯-৯০) ছিলেন। সভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তিনি এইরূপ উক্তি করেন :—

> ...The position of the Association was that of a Vigilance Committee watching the action of the Government towards the people and serving as the mouth-piece of the people by representing their wants, wishes and feelings to Government, and this was by no means a pleasant one.

রাজেন্দ্রলাল স্বকর্ত্তব্য সাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজনীতিতে তিনি ধীরপন্থী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ধীরভাবে যুক্তি প্রমাণ সহযোগে নিজ দাবী পেশ করিলে তাহা কখনও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয় না। তিনি ঐ বক্তৃতাতেই বলেন :—

> ...At the same time the only proper course for the Association was to follow that which it had hitherto followed—that straight course of duty, which required it to serve as the interpreter of the people to Government and of Government to the people, and this it should do with the sole object of securing good Government without any fear of consequences, or any sinister view of favours. It should always, invariably, and on all fitting occasions say its say modestly, respectfully, and constitutionally, but at the same time firmly and unflinchingly. It can justify its existence solely by so doing, and will well deserve to be abolished when it failed to do

so. Some obloquy, some misrepresentation, some abuse it must be prepared to withstand, idle impatience and official arrogance will always denounce it as middlesome and obstructive, but there was always a sufficient number of men in high places who were willing to consult the wishes, wants and feelings of the people, and from such men the Association is sure to have its due for its honesty, straightforwardness and disinterested devotion to duty, and what was true of the Association collectively was equally true of the members individually. They could often serve their own ends—obtain situations for themselves or their relatives, favours and smiles from men in power, honours and rewards from high quarters, by adopting the policy of *apkawaste* and *johakam*, but by subscribing for the sake of radiant smile or hearty shake of the hand to every thing they hear from men in power without refercnce to the peculiar exigencies and condition of the people of this country, they will betray the interests of their fellow-men, forfeit the respect of the good, deprive themselves of the approbation of their conscience, and in every way render themselves unworthy of the position they hold in society.

সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক সভাতেও সভাপতিরূপে তিনি বলেন :—

Fight; to the last of your resources fight, and when I use the word I mean fight constitutionally, loyally and faithfully with the single object of improving the Empire of Her benign Majesty the

Queen under whom we live, and that is the only way by which you can secure success. Bear in mind another thing and that is to be prudent and cautious. Never use any thing in your arguments or methods which may be construed into disloyalty, or opposition to the interests of the Government.

রাজেন্দ্রলাল সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য কায়মনে কামনা করিতেন। রাজনীতিক সুযোগ সুবিধলাভের পক্ষে যে ইহা একান্ত আবশ্যক, তাহাও তিনি পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম্মীদের পক্ষে সততা যে আবশ্যক, তাহাও তিনি এই সঙ্গে বলিয়াছেন। তিনি বলেন :—

It was of all others the most vital requirement for political greatness ; and next to it was honesty of purpose, No political Association would prosper whose members did not identify their interests with those of their countrymen. Self would be subordinated to the community and the good of the community should be the good of the individual. Those, who sought their own individual interests only, were not good citizens. They were as bad as Bazaine who sold a part of the patrimony of one of the noblest nations on the face of the earth to serve his own object. They should be denounced as enemies of the community. They could never help the amelioration of their country's cause. The speaker was sorry that he was led to allude to them, but he felt strongly that it was the want of unity and honesty of purpose which stood in the way of their success,

and those who wished for the good of their country should be the first to secure those requirements.

কংগ্রেস।—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বেই শাসক জাতির নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশায় রাজনৈতিক আন্দোলন স্থরু হইয়াছিল। কিন্তু এই সব খণ্ড প্রচেষ্টা মিলিত রূপ ধারণ করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাল হইতে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতার টাউন-হলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-৩০এ ডিসেম্বর। ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন—রাজেন্দ্রলাল। তিনি ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশ্যনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও যোগসূত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন ; এই সময় তিনি ছিলেন ইহার সভাপতি। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে তিনি প্রথম দিনের অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন। তিনি যে কংগ্রেসের মধ্যে ভারতের ভাবী স্থদিনের সূচনা প্রত্যক্ষ করিতেন, এই বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> In the name of the citizens of Calcutta I beg to tender you our most cordial greeting....It has been the dream of my life that the scattered units of my race may some day coalesce and come together ; that instead of living merely as individuals, we may some day so combine as to be able to live as a nation. In this meeting, I behold the commencement of such coalescence...I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India...The most important of them is the reconstitution of the

Legislative Conncils. I look upon them as the corner-stone of all the topics of political condition....Let your speakers speak moderately ; let your schemes be moderate.*

মৃত্যু

১৮৯১ সনের ২৬এ জুলাই রাজেন্দ্রলাল পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ৫ই আগস্ট তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি শোক প্রকাশ করেন। এই সভায় সভাপতি ক্রফ্‌ট (A. W. Croft) তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে গিয়া, তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাংলায় নহে, শুধু ইউরোপখণ্ডেও যে শোকের ছায়াপাত হয় সে-কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যেখানেই জ্ঞানের চর্চ্চা হয় সেখানেই রাজেন্দ্রলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাঁহার বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

It is with great regret that I have to make to the Society the formal announcement of the death of one of its most distinguished members, Raja Rajendralala Mitra. It is not only within the walls of this Society, or even in Bengal, that his loss will be deplored ; it will be felt throughout Europe ; for wherever learning is cultivated, there the name of Rajendralala Mitra is held in honour. His connection with this Society, extending over nearly half a

---

* *Speeches by Raja Rajendralala Mitra, LL.D., C.I.E.* Ed. by Raja Jogeshur Miter. Pp. 192-201.

century, was of a quite exceptional character. Entering it, when a young man, as Assistant Secretary and Librarian, his commanding abilities and untiring industry soon brought him into prominence; and while we may congratulate ourselves that it was this Society which first gave him the opportunity of satisfying his inexhaustible craving for knowledge, we must gratefully admit that he has amply repaid the debt by the contributions that he has made to Oriental learning and by the lustre that his name and attainments have shed upon the Society, of which he was one of the most distinguished in the long roll of Presidents.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাজেন্দ্রলাল মানুষ হিসাবেও বড় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়াছেন—"তাঁহার মূর্ত্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।" তাঁহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল প্রখর, কেহ তাঁহার আত্মসম্মানে ঘা দিলে তাহা তিনি সহ্য করিতেন না—উদ্ধত উক্তি এবং আচরণের সমুচিত প্রতিদান দিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার তেজোদৃপ্ত বিক্রান্ত মূর্ত্তি প্রতিপক্ষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। এই দিক্ দিয়া রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বিদ্যাসাগরের সগোত্র। নিম্নোক্ত ঘটনায় তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হইবে:

কাশীর বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ Fitz-Edward Hall ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস ধরিয়া রাজেন্দ্রলালের নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষিয়াছিলেন।

১৮৬১ সনে রাজেন্দ্রলাল এক প্রবন্ধের পাদটীকায় (*J. A. S. B.*, xxx, pp. 269-70) ঐ অতি-সাবধানী সাহেবের একটি শাসনলিপির পাঠোদ্ধারে মারাত্মক ভ্রম প্রদর্শন করেন ("It is remarkable that a critic so fastidiously exact as Mr. Hall...")। ইহাতে সাহেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া এক দীর্ঘ পত্রে (*Ibid.*, pp. 383-88) নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন—"বাবু" রাজেন্দ্রলালের প্রতি সাহেবের উদ্ধত ব্যঙ্গোক্তি ও অযাচিত উপদেশ দান অতীব কৌতুকজনক এবং উপভোগ্য। রাজেন্দ্রলাল প্রবন্ধান্তরের পাদটীকায় (*J. A. S. B.*, xxxi, pp. 393-95) সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের গবেষণাক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ-বাঙ্গালীর এই সংঘর্ষ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে। প্রত্যুত্তরের প্রারম্ভে রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—"(Prof....Hall) has honored me with a patronising tap on the shoulders.··· As in 1847, I had for some months had the honor of giving the learned Doctor lessons in Bengali, I feel very thankful to him···"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই মনীষীর প্রতি তাঁহার বিপুল শ্রদ্ধা ত প্রকাশ পাইয়াছেই, উপরন্তু তাঁহার বহুমুখী বিরাট্ ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি যেন আমাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজেন্দ্রলালের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির চরিত্রের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ এই রচনাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা।...তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আম ধন্য হইয়াছিলাম।

এ পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারো নহে।

মাণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ছিল, সেখানে আমি যখন তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম, তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনা বশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশী করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি, তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠানো হইত, তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক এক দিন সেইরূপ কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল, যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার

আলোচনার বিষয় ছিল, তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।...

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে "যমের কুকুর" নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া 'ভারতী'তে [বৈশাখ ১২৮৯] ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপৎজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেট সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান্। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না।"

রাজেন্দ্রলাল ও বাংলা-সাহিত্য

রাজেন্দ্রলাল শুধু প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী মাত্র ছিলেন না, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেকালের

পণ্ডিত-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই কোন-না-কোন বিষয়ে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মাতৃভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই, 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে'র পৃষ্ঠাতেই তাঁহার বহু মূল্যবান্ রচনা এখন পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিয়া আছে। তাঁহার লিখিত পুস্তক-সমালোচনাগুলিতে সাহিত্য-বিচারশক্তি ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার এই সকল মূল্যবান্ নিদর্শন দুষ্প্রাপ্য সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠাতেই হারাইয়া যাইতে বসিয়াছে। আমরা তাহা হইতে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি নিদর্শন এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। প্রকৃত পক্ষে তিনিই যে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার পদপ্রদর্শক, এইগুলিতে তাহার প্রমাণ মিলিবে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটকে'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি মূল্যবান্। নিম্নের উদ্ধৃতিটি তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধেরও পরিচায়ক :—

> জীবন-যাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের নাম নাটক; তাহাতে যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায় তদনুসারে নাটকের সাফল্য হয়; সাদৃশ্যের অভাব হইলেই রসের হানি হয়; সুতরাং জীবন-যাত্রায় যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে নাটকে তাহারই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদিতে রাগ, বা চৌপদিতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কৌতুক ব্যঙ্গ বা অদ্ভুতের বর্ণনস্থলে পদ্য রচনায় হানি নাই; তত্তদস্থানে কাব্য সম্ভবপর বটে। ফলতঃ নাট্যশালায় পয়ারাদিতে বীর রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় করিলে মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরদিগের বিবেচনায় সমুদায়ই পাঁচালির অনুকরণ হইয়া

উঠিবে। কেহ২ আপত্তি করিতে পারেন যে অন্যান্য দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষার কবিগণ এতাদৃশ নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে সংস্কৃত কবিতা আমাদের পয়ারের তুল্য নহে, সুতরাং উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। ইংরাজী লাটিন ও গ্রিক্ কবিতা সকল মাত্রাছন্দে রচিত হয়। তাহাতে প্রতি পদের শেষ অক্ষরে অনুপ্রাসের প্রয়োজন রাখে না। এই প্রযুক্ত তৎপাঠে গাম্ভীর্য্যরসের প্রকাশ পায়। সংস্কৃতও অনুপ্রাসের দাস নহে; অতএব তৎপাঠেও পয়ারের ন্যায় প্রতি কথায় ঠনন্ ঠনন্ ঘণ্টাধ্বনি হয় না, সুতরাং তাহাও অসুশ্রাব্য নহে। (বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ৪র্থ পর্ব্ব, ৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৮)

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গকাব্য বা প্রহসন সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তাহাও বিশেষ মূল্যবান্; তিনি লেখেন:—

জনসমাজের মঙ্গল সাধনই গ্রন্থ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; কি কবি, কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা, কি ইতিহাসলেখক, কি অঙ্কশাস্ত্রকার—সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আপন২ আয়াস সাধন করিয়া থাকেন, কেহই অন্যের প্রতীক্ষা করেন না। ইতোমধ্যে কবিদিগের উদ্দেশ্য এই যে কাব্যামৃতদ্বারা জন-সমাজের তৃপ্তি-সাধন করেন; পরন্তু সকল কবি তাহাতেই তৎপর নহেন; অনেকে দুরাচার দমনার্থে সাবক্ষেপ-বাক্যদ্বারা নানাবিধ ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়া থাকেন। তাহাতে পাঠকদিগের প্রমোদ ও দুষ্টের দমন উভয়ই এককালে উপলব্ধ হয়। ইহা আশু বোধ হইতে পারে যে যাহারা সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে জলাঞ্জলি দিয়া দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা কবির ব্যঞ্জনায় নিরস্ত হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; পরন্তু রাজবারা দেশ-প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি কহিয়া গিয়াছেন যে "শত্রুর

করবালাপেক্ষা কবির বাক্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" যাহারা ভূমণ্ডলে সকল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারাও কাব্যে শ্লেষিত হইতে ভয়ার্ত্ত হয়। কবিদিগের গৌরবের এই এক প্রধান কারণ; এই নিমিত্তই অনেকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা প্রার্থনা করে। দেশে কোন দুরাচারের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার দমনার্থে ব্যঙ্গোক্তি কাব্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র বলিয়া গণ্য; তাহাতে সত্বর ইষ্টাপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদারস্বভাব সহৃদয় মহাশয়েরাও দোষোপহাসকভাষণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকলেই যে এই অস্ত্রের ব্যবহারে তুল্য পারগ হন এমত নহে। গাণ্ডীবাদি বিখ্যাত অস্ত্রের ন্যায় ইহার ব্যবহারার্থে বিশেষ বলের সাপেক্ষ করে; তদভাবে ইহা সৎফলপ্রদ হয় না;

যদিচ কবিভিন্ন এই অস্ত্রের ব্যবহার অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য পরন্তু কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে, কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে পরিণত করত তাহার অভিনয়ে দুরাত্মাদিগের বিশেষ তিরস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালই এরূপ রচনার প্রচার আছে। ইহার আদর্শস্বরূপ আমরা হাস্যার্ণব নামক প্রহসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাতে নাটক-ছলে কামপরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদচি তাহা সম্যক্-হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লালতাদোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুকসর্ব্বস্বনাম নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু তদুভয়ই সংস্কৃতভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালি সাবক্ষেপবাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত

হইতে পারে। কথিত আছে যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কোন প্রধান পরিবারের দোষোদ্ঘোষণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু সাবক্ষেপকাব্যের প্রধান অঙ্গ ব্যঞ্জনাদ্বারা অরুন্তুদভাষণ, তাহা তাহাতে না থাকা প্রযুক্ত ঐ কাব্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তদনন্তর যথার্থ ব্যঙ্গ্যকাব্যের মধ্যে 'নববাবুবিলাস' নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল একজন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন রসোল্লাসি ব্যক্তি 'নব বীবী বিলাস' নামক ব্যঙ্গ্য প্রস্তুত করেন। ভদ্র স্ত্রী কুলটা হইলে যে দুর্গতি হয় তাহারই বর্ণনা করা তাঁহার অভিপ্রেত, এবং সে উদ্দেশ্য গ্রন্থে উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ উভয় গ্রন্থকার কিয়দ্বা উদ্দেশ্যের অনুরোধে এবং কিয়দ্বা সহৃদয়তার অভাবে আপন২ গ্রন্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিয়াছেন। যদিচ বর্ণিত বিষয় সত্য বটে, তত্রাপি তাহার পাঠে সহৃদয়দিগকে ব্যথিত হইতে হয়। অতঃপর সুবিখ্যাত শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লালতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক ধর্ম্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সভা সংক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র লইয়া অনেকগুলি ব্যঙ্গ্যোক্তি বিন্যস্ত আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থ ১৭৫২ অব্দে প্রকটিত হয়।

তৎপরে কএক বৎসর মধ্যে উল্লেখের উপযুক্ত কোন ব্যঙ্গ্য কাব্যের প্রকাশ হয় নাই। পাঁচ বৎসর হইল 'মাসিক পত্রিকা' নাম এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে।…ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস কেবল বাবুবিলাসের অশ্লীলতা তাহাতে নাই, এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাস হইতে বিশেষ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে।

আধুনা নাটকের সম্যক্ সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ; অতএব বর্ত্তমানের কুপ্রবৃত্তিসকল নাটকদ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামে এক খানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাশক্তির নিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। …('বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ.২৭৯-৮১)

বাংলা-সাহিত্যের ভাষা সাধুভাষা না চল্‌তি ভাষা হইবে, সেই সমস্যা সম্প্রতি জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে। চল্‌তি ভাষা সাহিত্যের বাহন হইলে কি বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা, সেই-সম্বন্ধে

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "বঙ্গভাষার উৎপত্তি" প্রবন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

> সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত কোন পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে কলিকাতার ভাষাপেক্ষায় দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ভাষার ব্যবহার করাই বিধেয় বোধে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহারই অবলম্বন করেন। ইহার অন্যথায় বাচনিক ভাষায় পুস্তক লিখিলে ত্বরায় এমৎ এক স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা যাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র অবোধ্য হইবে। অপর বঙ্গদেশের লোকেরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আপন আপন পল্লীর বাচনিক ভাষায় পুস্তক রচিলে বঙ্গদেশে যত জেলা আছে তত সংখ্যক নূতন ভাষা প্রস্তুত হইবে। ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' ৫ম পর্ব্ব, ৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৬)

মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল যে আলোচনা করেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ; তিনি লেখেন :—

> সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন ; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবন্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ ভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয় ; সুতরাং বর্ণ যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার স্বরূপে কোন২ ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয় ; কিন্তু তাহা ছন্দের

অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুলপিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারে না, যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে, তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ সকল গ্রহণ করা হইতেছে; অতএব দত্ত বাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির সেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বর অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসত্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্পমাত্র বুঝিতে পারে, তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগতভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে, পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর অনেক

সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘকাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণসুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বরসমানতাপ্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বর-সাম্যত্বের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দঃ ব্যবহৃত করেন ; তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটিন ও গ্রিক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যত দূর ইচ্ছা তত দূর দীর্ঘ করিতে পারেন ; যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন ; কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না।

অপর ঐ নিগড় সত্বে কবিতার গুজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙ্গালি কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভূত করিতে পারিতেন এমত আর কোন কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌবব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগদ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ, ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে, সুমধুর কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ের বিবরণমধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটি অপরূপ উদাহরণ আছে। তাহার পাঠে আমাদিগের

অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি কহিতেছেন তদ্বিষয়ে লিখিত আছে—

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপ-জ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙ্গালী ছন্দে তাহার সমাধা হয় না। ভারত সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার-করণ সময়ে ছন্দের অনুরোধে

"শুনলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ॥"

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দে ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন। বিদ্যা "মায়ের আগে" ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগকরণ-সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এ অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং দত্তজ বাঙ্গালাতে তাহার প্রচার

করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন মানিতে হইবে। ...('বিবিধার্থ-সংগ্রহ', অগ্রহায়ণ ১৭৮১ শক)

'পত্রকৌমুদী' পুস্তকে যে ভূমিকাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা রাজেন্দ্রলালের লিখিত। ইহাতে সেকালের পত্রলিখন-প্রণালী সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা আজিকার দিনে আমাদের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলিয়া গণ্য হইবে। এই ভূমিকাটি হইতে রাজেন্দ্রলালের রচনারীতি বা ষ্টাইলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সে জন্য দীর্ঘ হইলেও এখানে উহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

> পত্র শব্দে বৃক্ষের পর্ণ; প্রথমতঃ মনুষ্যে তাহাই লিখিবার আধার বলিয়া ব্যবহার করে; এই নিমিত্ত যে লেখনে এক ব্যক্তি অন্যকে কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপনাদি করে তাহার নাম 'পত্র' হইয়াছে। এই অর্থে ইহার পর্য্যায় শব্দ 'লিপি' ও 'পত্রী'। ইহার সৃষ্টি লেখনের সৃষ্টির সমকাল অবধি নির্ণয় করা যায়; যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই লেখনের সৃষ্টি হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালের পত্রে কেবল জ্ঞাতব্য কথামাত্র লিখিত থাকিত; সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বা তুল্য ব্যক্তির ইতরবিশেষ জ্ঞাপনার্থে পাঠাপাঠের নির্দ্দেশ হয়, এবং তাহাই 'প্রশস্তি' নামে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালাবধি এই প্রশস্তির বিশেষ পর্য্যালোচনা আছে, এবং তদ্বিষয়ক অনেক গ্রন্থও প্রচলিত দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে বররুচিকৃত "পত্রকৌমুদী" নামক সংগ্রহই অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে প্রশস্তি-রচনা-বিষয়ে তাহার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা তাহারা বিশিষ্ট ঔৎকর্ষ্যও সাধন করিয়াছিল।

উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে পত্রলেখনের অঙ্গমধ্যে ব্যক্তিভেদে পত্রের পরিমাণ, পত্রের ভাঁজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণকর্ত্তন, পত্রে শ্রীশব্দবিন্যাস, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কয় বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পত্রের পরিমাণ বিষয়ে লিখিত আছে যে উত্তম পত্র এক হস্ত ছয় অঙ্গুলী, মধ্যম পত্র এক হস্ত, এবং সামান্য পত্র মুষ্টিহস্ত (মুঠমহাত,) দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ পত্রকে তিন ভাঁজ করিয়া তাহার উর্দ্ধের দুই ভাগ ত্যাগ করত শেষ ভাগে পত্র রচনা করিবে।

পত্রের রঞ্জন-বিষয়ে বর্ণিত আছে যে উত্তমের পত্র স্বর্ণদ্বারা, মধ্যমের পত্র রৌপ্যদ্বারা, এবং সামান্য পত্র রাং তামা সীসা প্রভৃতি-দ্বারা রঞ্জিত করিবে ; এতদ্ভিন্ন ভদ্র নিয়ম রক্ষা হয় না।

পত্রের কাগজ এইরূপ প্রস্তুত হইলে তাহার অধোভাগের দক্ষিণ কোণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটিয়া পত্রের উপরিভাগে মঙ্গলার্থে অঙ্কুশাকার এক রেখা ও তাহার মধ্যদেশে এক বিন্দু তাহার নীচে সাতের অঙ্ক, তাহার অধোভাগে 'স্বস্তি' এই শব্দের বিন্যাস করিয়া বিহিত প্রশস্তি লিখনানন্তর পত্রের বক্তব্য রচনা করত 'কিমধিকমিতি' লিখিয়া পত্র প্রেরণের সংবৎসর মাস ও দিনের অঙ্ক দিয়া পত্র সমাপন করিবেক।

তৎপরে পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীবিন্যাস ও পত্রোর্দ্ধভাগে পত্রচিহ্ন নিয়োগ করা আবশ্যক। ব্যক্তিভেদে ঐ চিহ্ন এবং শ্রীসঙ্খ্যার অন্যথা করিতে হয়। আদিষ্ট আছে যে গুরুর পত্রে ৬শ্রী, স্বামীর পত্রে ৫শ্রী, রিপুর পত্রে ৪শ্রী, মিত্রের পত্রে ৩শ্রী, এবং পুত্র ও স্ত্রী ভৃত্যের পত্রে ১শ্রী লেখা কর্ত্তব্য।

পত্রের চিহ্নবিষয়ে কথিত আছে যে রাজপত্রের উর্দ্ধ হইতে ছয় অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান নিম্নে চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ বর্ত্তুলাকার কস্তুরী

কুঙ্কুমদ্বারা চিহ্ন করিবেক। মন্ত্রি ও যতির পত্রে কুঙ্কুমের চিহ্ন এবং পণ্ডিত ও গুরু ও পিতা ও পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্রে চন্দনের চিহ্ন, স্বামীর পত্রে সিন্দূরের চিহ্ন, স্ত্রীর পত্রে অলক্তের চিহ্ন, ভৃত্যবর্গের পত্রে রক্তচন্দনের চিহ্ন, এবং শত্রুর পত্রে রক্তের চিহ্ন, নিরূপিত আছে

অধুনা পত্র লিখিবার এই সকল নিয়মের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী আছে ; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই। বিলাতি চিঠীর কাগজে পত্রের প্রাচীন পরিমাণ লুপ্ত করিয়াছে। চন্দন-হরিদ্রাদিদ্বারা পত্রচিহ্ন-করণ কেবল বিবাহের সম্বন্ধ-পত্রে দেখা যায় ; অন্যত্র তাহার ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের পত্রে অদ্যাপি কোণকর্ত্তন ও শ্রীমুখের রীতি আছে ; কিন্তু ত্বরায় তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা ; যেহেতু এই ক্ষণে পত্র লিখিবার আবশ্যক নানা প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে ; অনেককে প্রত্যহ ৩০-৪০-৫০ খানি পত্র লিখতে হয় ; তাহাদিগের পক্ষে পত্ররঞ্জন চিহ্ন স্বস্তি শ্রীমুখ কোণকর্ত্তনাদি নিয়ম রক্ষা করা কোন মতে সুসাধ্য নহে ; অধিকন্তু তাহার পরিত্যাগে কোন অভীষ্টের হানি হয় না, সুতরাং লোকে তাহার প্রতি সম্যক্ অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন। এই কারণে প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ দীর্ঘ পাঠ ও শিরোনাম সকলও পরিত্যক্ত হইতেছে।...

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪১

নবীনচন্দ্র সেন

১৮৪৭—১৯০৯
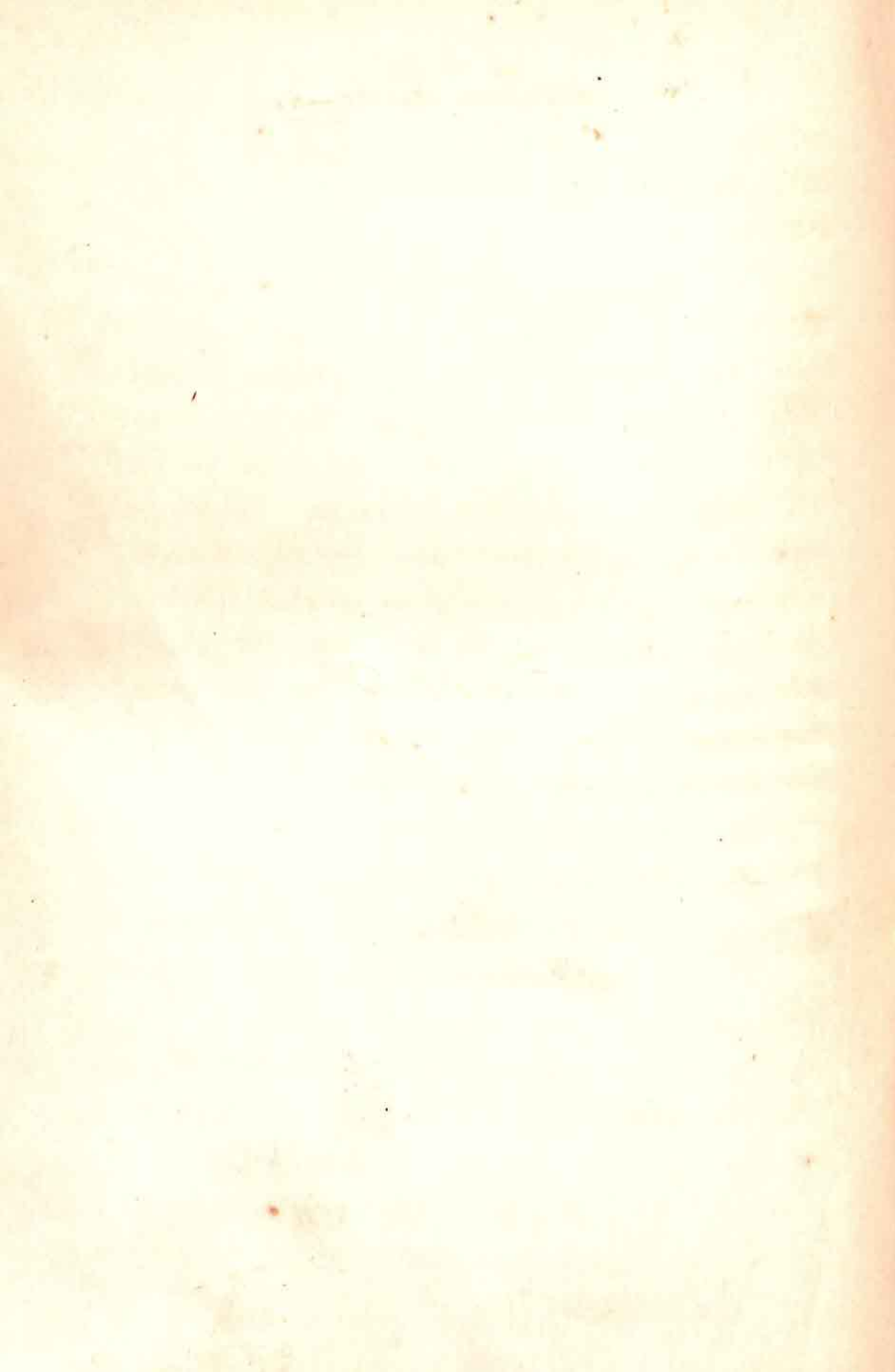
নবীনচন্দ্র সেন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

"শুভ জন্মপত্রিকায়" দেখিলাম,—১৭৬৮ শকাব্দায় "শ্রীমদ্ভানু-গত্যোত্তরায়ণে সৌরমাঘস্যোনত্রিংশদিবসে বুধবাসরে তমিস্রপক্ষে" দশমী তিথিতে তৃতীয় দণ্ড বেলার সময়ে "বহুতর শুভযোগে" আমার "শুভ জন্ম।" পিতা স্বর্গীয় গোপীমোহন রায়। মাতা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী। চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে আমার জন্ম। আমি জাতিতে বৈদ্য।—'আমার জীবনী,' ১ম ভাগ, পৃ. ৩।

ছাত্র-জীবন

পাঁচ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। কিছু দিন স্থানীয় গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া ৮ বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রাম শহরে পিতার নিকট আসেন। তাঁহার পিতা গোপীমোহন তখন জজ-আদালতের পেশকার। নবীনচন্দ্র এত দুরন্ত ছিলেন যে, চট্টগ্রাম স্কুলে পাঠকালে Wicked the Great—"দুষ্টশিরোমণি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, সতের বৎসর বয়সে, তিনি চট্টগ্রাম স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত ; দেশশুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে

পাস হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না।”

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য নবীনচন্দ্র কলিকাতা আগমন করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাস করেন।

বিবাহ

কলিকাতায় অধ্যয়নকালে, ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিবার এক মাস পূর্ব্বে নবীনচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

> First Art পরীক্ষার আর এক মাস মাত্র বাকী। আজ কলেজ সে জন্যে বন্ধ হইতেছে। বিদ্যুতদূত—ধন্য ইংরাজ রাজের মাহাত্ম্য—মুহূর্ত্তে সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন, এবং প্রথম আঘাতে আমাকে বজ্রাহত করিলেন। মহা সঙ্কট—যাই কি না যাই। “To be or not to be,” এক দিকে পরীক্ষা, অন্য দিকে জীবনের সুখের তিতিক্ষা।...১৮৬৫ ইংরাজি নবেম্বর (কার্ত্তিক) মাসে আমার সংসার জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইল। আমার বয়স তখন ১৭, স্ত্রীর [লক্ষ্মীর] ১০।

সরকারী চাকুরী

বি. এ. পরীক্ষার যখন প্রায় তিন মাস বাকি, সেই সময় নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় (ইং ১৮৬৭, ভাদ্র)। পিতা একটি পয়সাও রাখিয়া

যান নাই,—রাখিয়া গিয়াছিলেন ঋণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বৃহৎ পরিবার। নবীনচন্দ্র শোকাশ্রু মুছিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

নবীনচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বেকার অবস্থায় কর্ম্মের জন্য নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে এক মাসের জন্ম হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে তাঁহাকে সাহিত্য পড়াইতে হইত।

দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। নবীনচন্দ্র আবার বেকার হইলেন। কিন্তু কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে দমাইতে পারিল না, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, লেঃ গবর্ণর গ্রে'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটরীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। সেক্রেটরী তাঁহাকে দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। কম্পিতবক্ষে নবীনচন্দ্র এক দিন লাট-প্রাসাদে সেক্রেটরী স্টান্সফিল্ডের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সেক্রেটরীর হৃদয় বিগলিত হইল। শেষ-পর্য্যন্ত স্টান্সফিল্ডের চেষ্টায় নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার নমিনেশন পাইলেন। তিনি টাউন-হলে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এমনি ভাবে স্বাবলম্বী যুবক নবীনচন্দ্র অদৃষ্টের প্রতিকূলতাকে পরাহত করিয়া আত্মচেষ্টায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখসৌভাগ্যের মুখ দেখিলেন।

নবীনচন্দ্র সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন যেমন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল, তেমনি নানা চিত্তাকর্ষক

ঘটনায় পরিপূর্ণ। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে যশোহরে অবস্থানকালে শিশিরকুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসিয়াই প্রকৃত পক্ষে তিনি দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন। স্বীয় কর্ম্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি সবিশেষ নৈপুণ্য সহকারে 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা এথানে *History of Services of Gazetted and other Officers serving under the Government of Bengal (1903)* পুস্তক হইতে তাঁহার রাজকার্য্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তিনি কবে কোন্ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা ঠিকমত জানা থাকিলে, তাঁহার আত্মজীবনীতে বর্ণিত চাকুরী-জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
	বেঙ্গল সেক্রেটারিয়টের অ্যাসিষ্টাণ্ট	১৭ জুলাই ১৮৬৮	
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	...	২৪ জুলাই ১৮৬৮
ঐ	ঐ (৭ম শ্রেণী)	১৭ মে ১৮৬৯	...
শাহাবাদস্থ ভবুয়া	ঐ	৬ জুলাই ১৮৭০	...
চট্টগ্রাম	ঐ	৩ এপ্রিল ১৮৭১	...
ঐ	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১১ জানুয়ারি ১৮৭৪	...
ঐ	কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	...	১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬
ঐ	ঐ	১৩ আগষ্ট ১৮৭৬	...

ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৫ জুন ১৮৭৭ হইতে ১৯ দিন।

সস্‌পেণ্ডেড : ৪ জুলাই ১৮৭৭ হইতে ১ মাস ১৪ দিন।

ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৮ আগষ্ট ১৮৭৭ হইতে ৩ মাস ১ দিন।

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
পুরী	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৯ নবেম্বর ১৮৭৭	...
ফরিদপুরস্থ মাদারিপুর	ঐ	২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮	...

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
পাটনাস্থ বেহার	ডে. ম্যা. ডে. কলে (৪র্থ শ্রেণী)	২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮০	...
ঐ	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১ আগষ্ট ১৮৮২	...
ভাগলপুর	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (৫ম শ্রেণী)	২ নবেম্বর ১৮৮৩	...
নোয়াখালী	ঐ	৫ মে ১৮৮৪	...
ফেনী, নোয়াখালী	ঐ	২৫ নবেম্বর ১৮৮৪	...
ঐ	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৭ জানুয়ারি ১৮৮৮	...
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	...	২৫ এপ্রিল ১৮৯১
নোয়াখালীস্থ ফেনী	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	১ আগষ্ট ১৮৯১	...
ঐ	ঐ (৩য় শ্রেণী)	...	২৬ অক্টোবর ১৮৯১
ঐ	ঐ ঐ	১ ডিসেম্বর ১৮৯২	...
নদীয়াস্থ রাণাঘাট	ঐ ঐ	১০ মার্চ ১৮৯৩	...
ডায়মণ্ডহার্বার, ২৪-পরগণা	ঐ ঐ	২৯ এপ্রিল ১৮৯৫	...
আলিপুর	ঐ ঐ	১৫ মে ১৮৯৫	...
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	...	৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	২৫ জানুয়ারি ১৮৯৭	...
ঐ	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (২য় শ্রেণী)	১৮ জুলাই ১৮৯৭	...
ময়মনসিংহ	ঐ ঐ	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮	...
ত্রিপুরা	ঐ ঐ	৫ এপ্রিল ১৮৯৯	...
	ছুটি : ১২ মার্চ ১৯০২ হইতে ১১ মাস ২৬ দিন।		
ঐ	ঐ (১ম শ্রেণী)	...	৬ জুলাই ১৯০৩

অবসরগ্রহণ : ১ জুলাই ১৯০৪।

সাহিত্য-সেবা

কবিতানুরাগ নবীনচন্দ্রের বংশগত। কবিত্বশক্তি তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের পিতা ছিলেন একজন সুকবি, তাঁহার পিতৃব্যেরাও যাত্রার পালা এবং কবিতা রচনা ইত্যাদিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে তিনি 'মানুষ' হইয়াছিলেন, তাহাও ছিল তাঁহার কবিত্বশক্তি বিকাশের পক্ষে অনুকূল। নবীনচন্দ্রের বয়স যখন সাত আট বৎসর, তখনই তিনি ঠাকুরমায়ের কাছে সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—"পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।...আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।"

কলিকাতায় আসিবার পরও তাঁহার কবিতা রচনা অব্যাহত ছিল। এই সময় ঘটনাক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শিবনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাঁহার আগ্রহে ও চেষ্টায় প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত* 'এডুকেশন গেজেটে' নবীনচন্দ্রের

---

* প্যারীচরণ সরকার মার্চ ১৮৬৬ হইতে আগষ্ট ১৮৬৮ পর্য্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক ছিলেন।

লিখিত "কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, তখন "এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার আমাদের প্রোফেসার।...তিনি আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া আমার নামে ছাত্র কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'উমেশ শিবনাথ যে একটি কবিতা আমাকে দিয়াছে, উহা কি তোমার লেখা?' আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমার বেশ শক্তি আছে। তুমি ইহার অনুশীলন কর। তুমি সর্ব্বদা এডুকেশন গেজেটে লিখিবে'।" নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলীঃ নবীনচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিতেছি। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **অবকাশরঞ্জিনী,** ১ম ভাগ (খণ্ডকাব্য)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (ইং ১৮৭১), পৃ. ১৭১।

ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।

'অবকাশরঞ্জিনী' সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

> 'অবকাশরঞ্জিনী' সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুসূদনের

রমণীর চিত্র, এই তিনখানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।...সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে যেখানে যাইতেন, সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা, হয় ত রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে।" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি : বিজ্ঞাপন)

১২। **কুরুক্ষেত্র** (কাব্য)। সাল ১৩০০ (১৮ জুলাই ১৮৯৩)। পৃ. ৩৪৪।

" 'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'রৈবতকের' সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রের' সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। 'রৈবতকের' ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্রের' ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।"

১৩। **অমিতাভ** (কাব্য)। ১৩০২ সাল (৯ অক্টোবর ১৮৯৫)। পৃ. ৷৶০+২০১। ইহার বিষয়—বুদ্ধ-লীলা।

১৪। **প্রভাস** (কাব্য)। ? (১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ২৪৫+৬।

"রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।"

১৫। **শুভনির্ম্মাল্য** (নাটিকা)। (২৭ জানুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ২০।

চট্টগ্রামে পুত্র নির্ম্মলের বিবাহ উপলক্ষে কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন,' ৫ম ভাগ, পৃ. ৩৯৪ দ্রষ্টব্য। পুস্তিকাখানি 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ ১৩৫৪) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৬। **ভানুমতী** (উপন্যাস)। ১৩০৬ সাল (২৫ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ১৭৯।

১৭। **আমার জীবন** (আত্মজীবনী):

প্রথম ভাগ। ১৩১৪ সাল (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ২৬২ + ২।

দ্বিতীয় ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৬। পৃ. ৪২৯।

তৃতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃ. ৫১৪।

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃ. ৪৭৯।

পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। পৃ. ৫২৩।

১৮। **অমৃতাভ** (কাব্য)। ১৩১৬ (২৮ ডিসেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ২২৪।

ইহাই কবির শেষ কাব্য। তিনি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পর্য্যন্ত) রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সহ 'অমৃতাভ' প্রকাশিত হয়; ইহার বিষয় চৈতন্য-লীলা।

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ১ম-২য় খণ্ড। ১৩১১ সাল (২৯ আগস্ট ১৯০৪)। হিতবাদী-কার্য্যালয়।

ইহাতে 'শুভনির্ম্মাল্য,' 'অমৃতাভ' ও 'আমার জীবন' ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল পুস্তকই স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি:—

১। 'নব্যভারত,' ফাল্গুন ১৩১৫—"কর্ণেল অলকট্" (কবিতা)।
২। 'বঙ্গদর্শন,' আষাঢ় ১৩১৬—"হরিদ্বার" (ভ্রমণ)।
৩। 'মানসী,' ১৩১৭-১৯—"নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন"।

শেক্সপীয়রের A Midsummer Night's Dream-এর মর্ম্মানুবাদ। ইহার ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত, প্রথমে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মালঞ্চে'র ২য় বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম-সংখ্যায় (পৌষ-মাঘ ১২৯৬) প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে'ও ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।

৪। 'ভারতবর্ষ,' আশ্বিন ১৩২১—"দুর্গোৎসব—ষষ্ঠী" ("দেখে আয় তোরা হিমালয়ে···") ও "দুর্গোৎসব—সপ্তমী" ("এস মা আনন্দময়ী···")।

৫। 'ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭—"একটি গান" ("মন বল আর কি ভাবনা ?")।

৬। 'ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪১—"নবীনবাবুর বক্তৃতা ফেণী জুবিলী-বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ ইংরেজির প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞাপনী।"

৭। 'নবীনচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণে' (প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী—৪র্থ খণ্ড) কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা স্থান পাইয়াছে।

পত্রাবলীঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে লিখিত নবীনচন্দ্রের কতকগুলি পত্র অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'গিরিশচন্দ্র' (কার্ত্তিক ১৩৩৪) পুস্তকে, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কয়েকখানি পত্র ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে,' কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্র ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে ও কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত দুইখানি পত্র ঢাকার 'সম্মিলনে' (ভাদ্র-আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩২৭) মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির লিখিত কয়েকখানি ইংরেজী পত্র রক্ষিত আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শৈশবাবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের সহিত নবীনচন্দ্রের যোগাযোগ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা আজিকার দিনে অনেকেই অবগত নহেন। একদা তিনি ছিলেন পরিষদের অন্যতম কর্ণধার। পরিষদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে বিতর্ক-সভা হইতে কার্য্যকরী সভায় পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং নিজের হাতে গড়িয়া পিটিয়া ইহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক আকার দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

> হীরেন্দ্র বাবু যখন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি আমাকে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীস্থিত সাহিত্য-পরিষদে (তখন উহার নাম বোধ হয় Bengal Literary Academy ছিল) যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম সংবাদপত্রে উহার যেরূপ কার্য্যবিবরণ দেখিতেছি, উহা একটা ছাত্রদের ছেলেমি (School-boys' Debating Club) মাত্র। বিশেষতঃ আমি এক জীবন সভা সমিতির ত্রিসীমার মধ্যে কখনও যাই নাই। সভায়, এবং তাহার বাক্যবাগীশ বাঙ্গালির বাক্য-প্রবাহে, দেশ হাবুডুবু খাইতেছে। যেখানে কিছু কার্য্য হয়, সেখানে আমার যোগ দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ কার্য্যকরী সভা সমিতি বড় দেখিতে পাই না। অতএব আমার ক্ষুদ্র শক্তির আয়ত্তে যদি কোনও ক্ষুদ্র কায পাই, তাহাই করি, এবং তাহাতে আমার বড় আনন্দ। সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে "শোক-সভা" পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্কিমবাবুর জন্য "শোক-সভা" হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায় আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক! অশ্রু রাখিবার জন্য কত গামলার বন্দোবস্ত হইয়াছে একজনকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এ সকল কথা শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে আমার সভাপতিত্বের ছায়ায় তিনি তাঁহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করিতে চাহেন। আমার স্মরণ হইল বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে 'রবির ছায়া' নামক এক প্রবন্ধ 'প্রচারে' প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে রবিবাবু ও তাঁহার মধ্যে বড় সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল না। অতএব শোক-সভাতে শোকটা রবিবাবু করিবেন, আমার কেমন কেমন লাগিল। আমি রবিবাবুকে লিখিলাম যে আমি বনের জোনাকি, পাতার আড়ালে ও অন্ধকারে আমার মিটমিটে আলোটুকু জলে। তিনি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া কলিকাতার গেসলাইট ও বৈদ্যুতিক লাইটের মধ্যে লইলে উহাও নিবিয়া যাইবে। যাহা হউক শোক-সভা হইল, রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম অমনি শ্রোতৃমণ্ডলী চারি দিক্ হইতে বলিতে লাগিল—"রবি ঠাকুর! একটা গান কর।" শোকের এ বিচিত্র পরিণতি দেখিয়া সভাপতি মাননীয় গুরুদাস বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন যে, রবিবাবুর গলা আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি "শোক-সভা" সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবিবাবুর "সাধনা"তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বোধ হয় উহা শোক-সভার শোকান্ত পরিণতির পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল।...

যাহা হউক আমার আপত্তি শুনিয়া হীরেন্দ্র বাবু আর কিছু বলিলেন না। আমি কলিকাতা বদলি হইয়া গেলে হীরেন্দ্র বাবু আবার বলিলেন যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, এবং কখন আপনার সুবিধা হইবে জানিতে চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম আমি কলিকাতায় নবাগত, আমারই তাঁহার সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করা উচিত। এক রবিবার প্রাতে হীরেন্দ্র আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শোভাবাজারস্থ পুরাতন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়া "পরিষদে" যোগদান করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সভা সমিতি সম্বন্ধে আমার মত তাঁহাকে আমি সরলভাবে খুলিয়া বলিলাম। তবে সাহিত্য-পরিষদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া উহা Debating Club হইতে যদি কার্য্যকরী সভা করেন, বলিলাম তবে আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি। সভার আরও কয়েকজন সভ্য বোধ হয় আমার প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমার কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। সকলেই যেন বড় প্রীত ও উত্তেজিত হইলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন যে সভার সম্যক্ ভার তিনি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি যেরূপভাবে উহা চালাইতে চাহি, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন। আমি চিন্তা করিয়া ও হীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন প্রণালী স্থির করিলাম, এবং সভার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া ক্রমে ক্রমে সভাকে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত করিলাম।...

নবীনচন্দ্র ১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য এবং ১৩০১-০৩ সালে সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

২৩ জানুয়ারি ১৯০৯ (১০ মাঘ ১৩১৫) তারিখে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

স্মৃতিরক্ষা : চট্টগ্রাম-সম্মিলনী মৃত কবির উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি সম্মিলনী-সম্পাদককে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ; তিনি লেখেন :—

বোলপুর। ৩রা চৈত্র, ১৩১৫।

সবিনয় নিবেদন,—আপনারা আমাকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কবির স্মৃতি-রক্ষা কেমন করিয়া করিতে হইবে? সে জন্য ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। কৃত্তিবাসের স্মৃতি নিজেকেই নিজে এত কাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় কবি, তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া যান।

বর্ত্তমান কালে ছবি বা পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্মান প্রকাশের চেষ্টা হইয়া থাকে। সাহিত্য-পরিষদ্ যদি সেরূপ কোনো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন, তাহাতে দোষ দেখি না।

কিন্তু আমাদের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের উপায়রূপে প্রচলিত। জয়দেবের বিখ্যাত মেলা তাহার প্রমাণ।

শুনিয়াছি, সিন্ধুদেশের কোনো লোক-বিখ্যাত কবির মৃত্যুদিনের মেলায় সেখানকার লোকেরা সমস্ত রাত্রি সেই কবির কাব্য গান করিয়া থাকে। কত কাল হইতে বর্ষে বর্ষে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, এ জন্য কোনো সভা-সমিতি বা চাঁদার প্রয়োজন হয় নাই। কবির

নিজেরই কীর্ত্তির সাহায্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ, ইহার মত সুন্দর পদ্ধতি আর ত কিছু জানি না।

কবির জন্ম বা মৃত্যুর দিনে তাঁহার জন্মস্থানে বা সাহিত্য-পরিষদে বা নানা স্থানে তাঁহার কাব্য পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে উপযুক্তরূপে তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করা হয়।

আমার মতে সাহিত্য-পরিষদে আমাদের দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-বীরের জন্মদিনে বা মৃত্যুদিনে তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা উৎসব করা উচিত। অবশ্য, ছোট বড় সকলকেই একরূপ সমাদর করিলে তাহার গৌরব থাকিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান মৃত কবির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতে পারিবে।

যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমার এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষৎকে জ্ঞাপন করিতে পারেন। ইতি—ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

('মানসী,' চৈত্র ১৩১৫)

নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যোগ্য উত্তর-সাধকরূপে যে দুই জন কবি বাংলা-সাহিত্যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের একজন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর জন নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্রের

কবি-প্রতিভা ছিল সহজাত ও স্বাভাবিক, পিতা এবং পিতৃব্যদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের অনুগামী হইলেও তিনি তাঁহার অনুকারী ছিলেন না। সে যুগের কাব্য-সাহিত্যে তিনি স্বকীয়ত্ব ও মৌলিকত্বের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা, এই দুইটি মূল সুর নবীনচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনুস্যূত। দেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। বহু কবিতায় তিনি দেশের দুঃখদুর্দ্দশায় অশ্রুপাত করিয়াছেন। এই দেশপ্রীতির প্রেরণায় তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে কবিত্বস্রোত তরুণ বয়সেই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরিণত যৌবনে তাহাই দুকূলপ্লাবী হইয়া তাঁহাকে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনায় প্রণোদিত করে।

নবীনচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁহার কাব্যের যে সমাদর ছিল, কালধর্ম্মে আজ তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুখ্যতঃ 'পলাশীর যুদ্ধে'র রচয়িতারূপেই আধুনিক বাঙালী পাঠক তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে। নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য লীলা-কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র,' 'রৈবতক' এবং 'প্রভাস,' এই তিনখানি কাব্যে। এগুলিতে বিরাট্ কবিকল্পনার সঙ্গে দার্শনিকতা এবং বর্ণনানৈপুণ্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর! এই কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে হিন্দু অধ্যাত্মদর্শনের জটিল তত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়াছে উপভোগ্য রসবস্তুতে।

নবীনচন্দ্র লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, বাংলা সাহিত্যে তিনি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, সে যুগের বাংলার বিশিষ্ট ভাবধারা প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার রচনায়। তাঁহার জাতীয়তামূলক কবিতাসমূহ একদা শিক্ষিত বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ সাধনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইয়াছিল। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক এবং বাংলা-সাহিত্যে জাতীয়তামূলক কবিতারচনার অন্যতম পথিকৃৎরূপে নবীনচন্দ্র স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' (কার্ত্তিক, ১২৮২, পৃ. ৩১৯-২৮) 'পলাশির 'যুদ্ধ' সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবি-হিসাবে হেমচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

> নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।...এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুই জনের এক জনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুই জনের এক জনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্ত দিকে দুই জনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরনের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাবসকল, আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য।...
>
> নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের

ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর···।

বাইরনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরনের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।

সুতরাং ইংলণ্ডে বাইরন যেমন বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইতেছেন, এ দেশেও নবীনচন্দ্র সেইরূপ হইয়াছেন। যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী না হইলে যুগকে অতিক্রম করিয়া কেহ সগৌরবে দাঁড়াইতে পারেন না। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা তেমন ছিল না।

নবীনচন্দ্র স্বভাব-কবি ছিলেন; তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাঁহার কাব্যের কচিৎ যোগ ছিল। এই কারণে 'আমার জীবন' লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক নবীনচন্দ্র, স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্র, আত্মম্ভরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবি নবীচন্দ্র কুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই। সেই যুগকে এবং সে-যুগের মানুষকে বুঝিবার জন্য নবীনচন্দ্রের রচনার সহিত এ যুগের পাঠকের পরিচয় আবশ্যক; নবীনচন্দ্র স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় নিখুঁত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। আমরা অনাবশ্যক কাব্য বিশ্লেষণ না করিয়া তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি; 'আমার জীবন' হইতেও তিন জন প্রসিদ্ধ বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীর চিত্র তুলিয়া দিয়াছি।—

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিতা-কানন,
যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব, হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়!

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি,' কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

শূন্য হল' আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

কেন ভালবাসি ?

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে ? কে বলিবে, কেন ভালবাসি ?

অনন্ত অতল সিন্ধু !—পশি বারি-তলে,
কেমনে বলিব বল,
কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্র স্রোত, পরিণাম যা'র,
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার ?

যে তরু অনন্তছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে ! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,
দেখা'ব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায় ?—
কেন ভালবাসি, হায় ! বুঝা'ব তোমায়,

কেন বাসি ভাল ? অয়ি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,
এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে ।

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটি নক্ষত্র তায়
ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী ?—
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি !

শর্ব্বরি ! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালা রাশি ;
শর্ব্বরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি ?

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল ;
সুকুন্তল কিরীটিনী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি,
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি ?

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাদান,
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল !—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ?

জীবন, যৌবন, আশা, কীৰ্ত্তি, ধন, মান,—
তৃণবৎ ঠেলি' পায়,
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যা'র কাছে, হায়! তা'র মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে?

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার!
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,
রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায়!
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায়?

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্ভবে উত্তর!

শব-সাধন

নিবেছে অনল?—নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল,—নিবিবে কেমনে?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলি'ছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল!

কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ !

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা-মহাসুরা-পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর ।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন ;
শ্মশান-অনল গর্জ্জি'ছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনি'ছে পবন ।

কি ভয় !—আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা-মহাসুরা-পান ;
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান ;—
করাল-বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
লেলিহান জিহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশান-বাসিনি,
সৃক্ক-দ্বন্দ্ব-গলদ্রুধির চর্চ্চিত ।

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে, শ্মশানে,
মহাবিয়ু দিনে, মহাশক্তি ওই
নাচি'ছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জিছে সাধক 'মাভৈর্মাভৈঃ' ।

নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি, ভীমা দিগম্বরী।

ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার;
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,'
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

বক্তৃতা ও বিদায়

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ-মালায়
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্ন স্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ,
উচ্চ স্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।

ভরিল হৃদয় ধীরে ভিজিল নয়ন
জননীপ্রতিম মূর্ত্তি করি দরশন।
দূর হতে প্রণমিয়া কহিলাম ধীরে—
"জন্মভূমি, কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিনু মাখিয়া,
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভিনিয়া
আসিলে কি দেখাইতে? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কিনা শোণিতের ধার
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বহিবে,
যত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান।
যারা গৌরাঙ্গের কৃপা কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে মাতা, বলিও নিশ্চয়,—
এখনো বিপদে তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।
উচ্চতর রক্ত-স্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।"

মেঘনা

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,

অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ?

বাসন্তী চন্দ্রিমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অম্বু তীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

মানব জীবনে
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ হায় ! কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায় ! শান্ত মধুর এমন !
('অবকাশরঞ্জিনী')

এই ত কলির সন্ধ্যা ; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয় নি আবৃত ।
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পলকিতে হবে অন্তর্হিত ।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে,
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল ;
এইরূপে চিন্তা-মেঘ, ভীম বেশ ধ'রে,
ঢাকিবে সমস্ত রাজ্য । দৌরাত্ম্য কেবল

গভীর জলদনাদে করিবে গর্জ্জন ;
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ ?...

দিবা অবসান প্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে, বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী,
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।...

ধন্য আশা কুহকিনি। তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না স্থজিত বিধি ; হায়। অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত, অচিরে
সে মনোমন্দিরে শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মাদ শার্দ্দূল তাহে করিত নিবাস।

ধন্য, আশা কুহকিনি। তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি ;
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায় ।
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি ।
ভবিষ্যত-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় অনিবার ।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে ।

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি ।—কঙ্কাল-শরীর ;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর ;
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপণ ; রুগ্ন কলেবর ;
না চলে চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল ;—
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে ।

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে

অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, ম্লেচ্ছ-পদাঘাত-ভয়ে ;
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে ;
ঘর্ম্ম সহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

না জানি কি ভবিষ্যত, আশা মায়াবিনি!
চিত্রিলে নয়নে তার ; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা"।...

অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্দ্ধ শিরে পরশে গগন ;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।

দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি, উর্ম্মি তদুপরে—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধু'পরে।...

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে, বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে পরীক্ষা কেবল,
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"...

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ রজনী!
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন;

উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন ;
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

"অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি,
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন ;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, আহা, বলে কোন্ জন ?
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সময় স্রোত, হায়, অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করে নিমগন ;
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন ।

(**'পলাশীর যুদ্ধ'**)

চন্দ্রকলার গীত

সুখের বৈশাখ মাস, সুখ-চন্দ্র পরকাশ
ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ,
নিশান্তে কোকিল সহ ডাকে 'বউ কথা কহ'
কৌতুকে উহলে নারীমন ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনমণি, দহিবারে বিরহিণী,
অনল করেন বরিষণ ;

বুকের বসন নাই, অঞ্চলে বাতাস খাই,
অন্তরে বাহিরে হুতাশন।
আইল আষাঢ় মাস, নব ঘন পরকাশ,
নব বারি ধারা বরিষণ ;
নবীন নীরদ অঙ্গে, নবীন বিজলি রঙ্গে
চমকে, চমকে নারী মন।
শ্রাবণ মাসেতে ঘন, ঘন দেব গরজন,
ডাহুক ডাহুকী করে গান ;
শ্রাবণের ধারা সনে, কাঁদে ধনী মনে মনে,
বিরহেতে আকুল পরাণ।
ভাদ্র মাসে নদী যত, বিরহ প্রবাহ মত,
উথলিয়া উছলিয়া যায় ;
কিবা শোভা পাকা তাল, কদম্ব হইল কাল,
পড়ে বামা ঢলিয়া ধরায়।
আশ্বিনে চাঁদনি রাতি, উঠে তাহে প্রাণ মাতি
শস্যক্ষেতে কি শোভা খেলায়।
যুবতী যৌবন মত, ফুটে পদ্ম শত শত
শেফালিকা ঝরে অশ্রুপ্রায়।
কার্ত্তিকে শিশির ঝরে, পাতায় পাতায় পড়ে,
শুনিয়া শরীর দেয় কাঁটা ;
সরিছে নদীর জল, ঝরিছে কমল দল,
যৌবন-জোয়ারে লাগে ভাটা।
আগণে নবীন শীতে, উত্তর অনিল চিতে,
হয় যেন বিষ সম জ্ঞান ;
শিম ফুল পাঁতি পাঁতি, ফুটিয়াছে নানা জাতি,
নানা জাতি পাখী করে গান।

পৌষের প্রভাত কালে, বসি খেজুরের ডালে,
হুলু দেয় ভৃঙ্গরাজগণ ;
আনন্দে আকাশে ডাকে, লুঠে টিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে
শস্যক্ষেতে সোণার যৌবন ।
মাঘের শীতের সনে, বাড়ে বিরহিণী মনে
বিরহ, আকুল করে প্রাণ ;
সুন্দর শ্যামার তান, কেড়ে লয় মন প্রাণ,
কি মধুর বুলবুলির গান ।
মধুর ফাল্গুন মাসে, মধুরে বসন্ত হাসে ;
ফাটি বিরহিণী তপ্ত হিয়া,
শিমুল, পলাশ, ফুটে ; কোকিল জাগিয়া উঠে,
কুহু স্বরে গগন ভরিয়া ।
চৈত্তিরে চঞ্চল মন, বিকসিত পুষ্পবন,
নিদাঘ করিল পরবেশ ;
কাঁদে নারী চন্দ্রকলা, বসিয়া বকুলতলা,
প্রাণেশ রহিল পরদেশ । (**'রঙ্গমতী'**)

"দশম বৎসর যবে, যমুনার তীরে
একদা মধ্যাহ্নে বসি ভাই দুই জন
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে,
দেখিতেছি নভনিভ শান্ত নীলিমায়
মধ্যাহ্ন কিরণখেলা । ক্ষুদ্র উর্ম্মিগণ
সুবর্ণ সফরী মত খেলিছে কেমন
সংখ্যাতীত । অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি ।

মার্জ্জিত রজত সম শ্বেত শ্মশ্রুজালে,
শোভিতেছে শ্বেত আলুলায়িত কুন্তলে,
বিভূতিমণ্ডিত শ্বেত প্রসন্ন বদন,—
শারদ-জলদাবৃত শশাঙ্ক যেমন।
শ্বেত পরিধান, শ্বেত উত্তরীয় বুকে,
শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তি স্থাপিত সম্মুখে।
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর,
শ্বেত মর্ম্মরের বেদী পবিত্র সুন্দর।
দেবমূর্ত্তি স্থিরভাবে চাহি মম পানে
আরম্ভিলা—'বৎস, কৃষ্ণ! যেই গ্রহগণ
আছে ঝলসিত তব অদৃষ্ট বিমানে
তব পরিণাম, বৎস, নহে গোচারণ।
জন্মি আর্য্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শেখরে
দুই মহাকীর্ত্তিস্রোত দুইটি নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গা যমুনার মত যুগল জীবন
মিলিবেক অর্দ্ধপথে ;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ! স্রোত সম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীর্ত্তিস্রোত, করিয়া মোচন
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধারায়

পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচারণক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা ;
সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার ;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থির ভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি!—রহিবে সতত
সর্ব্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।...

"একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়া,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি জীবনের ভাবনা প্রথম!—
একই মানব সব, একই শরীর ;
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
চারি বর্ণ ; চারি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর ;
জন্ম মৃত্যু ; ধর্ম্মাধর্ম্ম ;—ভাবিতে ভাবিতে
হইলাম তন্দ্রাগত। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল
কোটী কোটী চন্দ্রালোকে উঠিল ভাসিয়া।
দেখিলাম সুশীতল আলোক-সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার,
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যাম, রয়েছে স্থাপিত

অনন্ত আলোক-গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল।
নয়নে লাগিল ধাঁধা। দেখিলাম যেন
বিরাট-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত;
চতুর্ভুজ, চতুর্দ্দিক; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; শোভে সমুজ্জ্বল
কিরণ কিরীট, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর;
কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
নীলমণিময় সেই মহা কলেবরে,—
কিরণের উৎস সেই কিরণ-সাগরে।
অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্
সেই মহাবপুঃ হতে হইয়া নিঃসৃত,
রবি-করে করে যথা স্ফটিক দীপিত,
করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র পরমাণু তার
হইতেছে রূপান্তর; কিন্তু অনির্ব্বাণ,
প্রভাকর-কর স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমতি,
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্রেই আছে বিদ্যমান,
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ববিধান।
হইল বিরাট ধ্বনি—'দেখ, অন্ধ নর।
প্রকৃতির পুরুষের মহা সম্মিলন,—
একমেবাদ্বিতীয়ং!—পূর্ণ সনাতন।
প্রকৃতি পঙ্কজ; শক্তিরূপী নারায়ণ,

নরের আশ্রয়, বিষ্ণু সর্ব্বভূতময় ;
উভয় অনন্ত, নিত্য, উভয় অব্যয় ।
জন্ম মৃত্যু রূপান্তর । দেখ অধিষ্ঠিত
বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর ! হতেছে জ্ঞাপিত
জ্ঞান পাঞ্চজন্যে নীতিচক্র সুদর্শন ।
নীতির লঙ্ঘন পাপ হতেছে দণ্ডিত
ভীষণ গদায় ; পুণ্য-নীতির পালন—
শত-সুখ-শতদল করিছে বর্দ্ধন ।'
শুনিলাম—'এক জাতি মানব সকল ;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয় ;
একমাত্র মহাযজ্ঞ,—নিষ্কাম সাধন ।
স্বয়ং বিষ্ণু, যজ্ঞেশ্বর । সন্দিগ্ধ মানব !
আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর
দেখিতে কর্ত্তব্যপথ জ্ঞানের আলোকে,
বিস্তৃত সম্মুখে পুণ্যা ভাগীরথী মত ।
সুদর্শন নীতিশ্চক্র নমি ভক্তিভরে,
কর্ম্মস্রোতে জীবতরী দেও ভাসাইয়া ।'
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে শতদল-দল
মিশাইল গ্রহে গ্রহে ; মৃণাল, ধরায় ;
নীল অনন্তের সনে নীল কলেবর ।
সুখ-স্বপ্ন শেষে শিশু জননীর কোলে
জাগিয়া যেমতি দেখে মায়ের বদন
প্রেমপূর্ণ ; দেখিলাম জাগিয়া তেমতি
বন-প্রকৃতির মুখ, প্রীতি-পারাবার ।

দলিত ফণিনী

প্রফুল্ল নীলাব্জ মুখ, ফুটন্ত নীলাব্জ বুক,—
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ,—
কাদম্বিনী মনোহরা, বারি বিদ্যুতেতে ভরা,—
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন।
গর্ব্বপূর্ণ রক্তাধরে, সজল বিদ্যুৎ ঝরে,
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয় ;
হৃদয় ভরিয়া হায়, তরঙ্গ খেলিয়া যায়,
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময়।
আকর্ণ সে যুগ্ম ভ্রূরু, পূর্ণ সে নিতম্ব উরু,
কি লাবণ্য-লীলা স্থূলতায় !
নবীন যৌবন রঙ্গে, ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে,
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়।
তরঙ্গিত রূপরাশি, শেষ সোপানেতে বসি ;
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে পশ্চাতে সখীর অঙ্গে
শৈল-ঘাটে, করিয়া আঁধার !
উরু পরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর
এক গুচ্ছ কেশে অন্য কর ;
নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীর,
নীল নীরে প্রতিমা সুন্দর। ('রৈবতক')

শৈশব-হেমন্ত-সন্ধ্যা ধীরে ছায়াময়ী
উত্তরিয়া কুরুক্ষেত্রে ঢালিল শান্তির
শীতল বিষাদ ছায়া সমর-অনলে।

দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল ;
দিবসের শেষ মৃত চুম্বিল ভূতল ;
শেষ সিংহনাদ, শেষ কোদণ্ডটঙ্কার,
মিশাইল সন্ধ্যানিলে। শেষ শঙ্খনাদে
দিবসের রণ-শান্তি ঘোষিয়া গম্ভীরে,
যোদ্ধাগণ দুই স্রোতে চলিল শিবিরে,—
অনন্ত বলাকামালা দুই স্রোতে যেন
চলিল কাকলীকণ্ঠে প্লাবিয়া গগন ;
দুই প্রতিকূলানিলে চলিল ছুটিয়া
ফেনিল তরঙ্গমালা মহাপারাবারে।
নিবিল ঝটিকা, ঘোর শঙ্খের নিনাদ,
সমর-নির্ঘোষ,—যত জলধি উচ্ছ্বাস,—
সন্ধ্যালোক সহ ধীরে। ('কুরুক্ষেত্র')

"জরা ব্যাধি দুঃখে ভরা হায়! এই ত্রিভুবন,
মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয়, অকিঞ্চন।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায়! জীব আর,
মরণের হস্ত হ'তে নাহি কি উদ্ধার তার?
শারদীয় অভ্রসম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয়।
বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়,
মানব-জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায়।
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
কুম্ভকার-চক্র মত ঘুরিতেছে নিরন্তর।

ইন্দ্রিয়ের সুখে মুগ্ধ হায় রে মানব যত,
জড়িত ব্যাধির জালে প্রলুব্ধ মৃগের মত।
বাসনা জ্বলন্ত বহ্নি; তাহার ইন্ধন ভোগ;
ভোগ-সুখ স্বপ্নসম, জলে চন্দ্র-ছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ হ'লে জরা-ব্যাধি-গত
করে নর পরিহার, মৃগে শুষ্ক হ্রদ মত।
ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষ সম দেহ, হায়!
জরা আক্রমিলে হয় তড়িৎ-আহত-প্রায়।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
জরা দহে দেহ, যথা গুপ্ত বিষ বনস্থল।
হরে পরাক্রম বেগ, সুরূপ বিরূপ করে,
হরে সুখ, হরে শান্তি, ব্যাধি-দগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা-ব্যাধি-দুঃখানল?
শিশিরে তুষারপাতে প্রফুল্ল কমল প্রায়
হায়! দেহ, বল, রূপ—সকলি শুকায়ে যায়
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত,
এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়! কেহ ত ফিরে না আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার।
সকলি মৃত্যুর বশে,—মৃত্যু বল বশে কার?
জন্ম-জরা-মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসার।
ক'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ! কি মনে হয়—
উদ্ধারিতে এ সংসার? উপস্থিত সে সময়।"

(**'অমিতাভ'**)

দেখ ওই পারাবার! শান্তভাব তার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান্।
মহাস্রোত,—বিবর্ত্তন ; এ বিশ্ব সংসার,—
ঊর্ম্মিমালা ; জীব,—জলবিম্ব কর জ্ঞান।
সিন্ধু গর্ভে স্রোতবলে তরঙ্গ ফেনিল
জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন,
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিল ;
সিন্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন।
তেমতি হিরণ্যগর্ভে—অব্যয়, অক্ষয়,—
বিবর্ত্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া,
অনন্ত জগত স্থূল,—তরঙ্গ নিচয়,—
আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়া
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর
জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ;
কালারম্ভে এককর্ম্মী, এক কর্ম্ম আর,
এক মহাকর্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্ত্তন।
এই মহাকর্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত,
জড় চেতনের কর্ম্ম-চক্র ক্ষুদ্রতর ;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্মজন্মান্তর।
কর্ম্মফলে জন্ম, পার্থ! মৃত্যু কর্ম্মফল ;
কর্ম্মফল সুখ দুঃখ। করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল,
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন।

জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে, সৃজি চরাচর,
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্ত্তন।
সেই সৎ চিদানন্দে গতি নিরন্তর,
জড় চেতনের মহাধর্ম্ম সনাতন।
কর কর্ম্ম, এই গতি করি অনুসার,—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর। ('প্রভাস')

প্রধানতঃ কবিরূপেই বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গদ্য রচনায়ও যে তিনি অপটু ছিলেন না, তাহার প্রমাণ পাঁচ ভাগে সমাপ্ত তাঁহার আত্মজীবনী 'আমার জীবন,' স্থানে স্থানে একান্ত ব্যক্তিগত কথার আতিশয্য সত্ত্বেও ইহা বাংলা-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

নবীনচন্দ্রের গদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'আমার জীবন' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই সকল উদ্ধৃতাংশ হইতে তাঁহার গদ্য-রচনাকুশলতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। নিপুণ তুলিকায় নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা একেবারে জীবন্ত হইয়াছে।

"অবস্থার ঘোর ঘটায় চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন। মস্তকের উপর ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না। একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও কোন দিকে দেখিতেছি না যে, উহাকে উপলক্ষ করিয়া ভাসিয়া থাকি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া এরূপ আহত ও নিমজ্জিত করিতেছে যে, আর ভাসিয়া থাকিবার আশা দেখিতেছি না। একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিবিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই

বিপদ্ভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার নরমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই নর-নারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সম্প্রতি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সেই ভগবদ্বাক্য—"ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে"—এই মহাধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার। সেই মহাব্রত সাধন করিয়া, তাঁহার অবতারে বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই থাকিবেন।

আমরা প্রথমে কলিকাতা আসিয়া কিছু দিন পরে আমাদের মাতৃভূমির বরপুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ কাস্তগিরি এম ডি পরীক্ষা দিবার জন্যে কলিকাতায় আসিলেন।...তখন কলিকাতায় কেবল আমি ও চন্দ্রকুমার মাত্র আছি। তিনি বলিলেন—"তোমরা দুটি বালক কলিকাতায় এরূপ অভিভাবক ও আশ্রয়শূন্য হইয়া কিরূপে থাকিবে। ভাল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়া দিব।" আমাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনে দেশ তখন প্রকম্পিত হইতেছে। ডাক্তার অন্নদাচরণ এ সমাজ-যুদ্ধে তাঁহার একজন দক্ষ সেনাপতি।...বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ও আমাদিগকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু—ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ যাঁহার বেতালে আমোদিত, শকুন্তলায় মোহিত, এবং সীতার বনবাসে আর্দ্রিত হইতেছে, এই কি বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই বিদ্যাসাগর! যাঁহার নাম প্রত্যেক নরনারীর মুখে, যিনি

মৃত হিন্দু সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর ? এই খর্ব্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিত মস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ! চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্য হুকা, মুখে হাসি, মূর্ত্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্য্যন্ত সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন— এই কি সেই বিদ্যাসাগর ! আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, মোহিত হইলাম। ...বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী গিয়া আমাদিগকে দেখিয়া আসিবেন বলিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, কোন অসুখ হইলে সংবাদ দিতে, আমাদিগকে বলিলেন। এ সকল কথা এরূপ সরল ও সস্নেহভাবে বলিলেন যে, শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছিল। আমার বোধ হইল কোন দেবতা আমাদের উপর তাঁহার পদছায়া প্রসারিত করিলেন। আমাদিগকে তাঁহার অভয়বরদ দুই করপদ্ম দেখাইলেন। আমরা বাস্তবিকই সে দিন হইতে নির্ভয় হইলাম।

* * *

আজ এই উত্তাল বিপদর্ণবের ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে সেই নর-নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিলাম, এ সংসারে আমি দীনহীনের আর কেহ নাই। আছেন কেবল সেই দীনবন্ধু। পরদিন প্রাতে তাঁহারই শরণ লইতে চলিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানাভরা লোক। কিন্তু আভূতল নত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র তাঁহারা দুই জনে আমার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি

পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত। তখন দুজনে পিতার মৃত্যুর ঘটনা সকল জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইলেন। আমি কাঁদিতেছিলাম, তাঁহারা চক্ষের জল পুঁছিতেছিলেন, দর্শকগণ করুণ-নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে নির্জ্জন বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বিপদ্ কি? আমি তখন অতি কষ্টে অশ্রু ও কণ্ঠবাষ্প অবরোধ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কপোলযুগল বাহিয়া ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনীধারার মত দুটি সন্তাপহারিণী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। আমার শোকের আখ্যান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখনও বালক, আর তোমার উপর এ বিপদ্! কিন্তু ভাই! তুমি কাতর হইও না। আমিও এক দিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই অধিক। তোমার পিতা আর কিছু দিয়া না যান, তোমাকে ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মোট কথা, তোমার এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। এখানে কিছু দিন থাকিয়া বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষা ও চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার মাসিক খরচ কি লাগে?" আমি বলিলাম কুড়ি টাকা। আমার দুটি 'প্রাইভেট টুইসন' আছে, তাহার দ্বারা আমার বাসা-খরচ চলিবে। ভাবনা কেবল পরিবারের জন্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তাহাদের কিরূপে চলিতেছে। আমি বলিলাম—বলিতে পারি না। মাতা আমার কাছে সে কথা কিছু লিখেন নাই। তিনি আবার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"তোমার মাতার কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা কর। কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জান। আর

তোমারও এখন 'প্রাইভেট টুইসন' রাখিলে কর্ম্মের চেষ্টার ত্রুটি হইবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। একখানি চিঠি লিখিয়া আনিয়া তাহা সংস্কৃত লাইব্রেরীতে দিতে, ও কিছু দিন পরে কলিকাতায় তিনি ফিরিয়া আসিলে দেখা করিতে বলিলেন। চিঠিখানি সংস্কৃত লাইব্রেরীতে দিলে তাঁহারা আমাকে ৪০টি টাকা দিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। বলিলাম, আমি ত কোনও টাকা চাহি নাই। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না। তাঁহারা উক্ত পত্রের আদেশ মতে টাকা দিয়াছেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ছল ছল নেত্রে এ দয়ার উপাখ্যান চন্দ্রকুমারকে বলিলাম···।"—'আমার জীবন,' ১ম ভাগ, পৃ. ১৭৬-৭৮, ১৮০-৮২)

* * *

"তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। সান্ধ্য রবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়ার কলেজের, হুগলির ইমামবাড়ীর এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ স্বর্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। অর্দ্ধ গঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং অপরার্দ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল—

"হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবীজীবনে।"

কল্পনার চক্ষে ভাগীরথীর যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দুজনেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম,—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটির ঘাটে পঁহুছিল, এবং আমরা বঙ্কিম বাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাওঠা হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই বলিয়া আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিম বাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল, এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারি দিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুশনওয়ালা চেয়ার; ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম্। আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্য্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধান নয়নসুকের ধুতি। দেখিবা মাত্রই মূর্ত্তিখানি সুন্দর, সতেজ, এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি লোকটি কে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে? আমি

হাসিয়া বলিলাম—"বঙ্কিমবাবু।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?" আমি উত্তর করিলাম—"শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?" আমি বলিলাম—"পড়িবার কথা নয় কি?" আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন—"দেখা যাক্ কার জিৎ হয়।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"ছোকরাদেরই চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই।" সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।" আমি অক্ষয় বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দাদা শুনিলেন কি? এঁর মুখে আমার ইংরাজির প্রশংসা! তাঁর সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারও যোগ্য নহি।" অক্ষয়বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিম বাবু হাসিয়া বলিলেন—"বটে! অক্ষয় আপনার দাদা? অক্ষয় আমার নাতি, এবং অসাধারণী আমার নাতবৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলে মানুষকে আর আপনি বলা যায় না।" অক্ষয় বাবুর কাগজের নাম 'সাধারণী,' তাই বঙ্কিম বাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন 'অসাধারণী'। ইহার পর অনেক গল্প চলিল। সঞ্জীব বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"বঙ্কিম! তুমি এঁর কবিতার ও ইংরাজির প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমি এঁর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। এঁর বাড়ী চাটুগাঁ বলিতেছেন, অথচ কথায় বাঙ্গাল দেশের গন্ধমাত্র নাই, ঠিক আমাদের মত বলিতেছেন।" তখন আমার কথার, চট্টগ্রামের ভাষার, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার একটি সমালোচনা হইল। তাহার পর

বঙ্গসাহিত্যের কথা, পলাশির যুদ্ধ, বৃত্রসংহার ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে উহার প্রথম ভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে?" আমি বলিলাম—"আমি হেম বাবুর শিষ্যস্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে।" অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন—"মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।" বঙ্কিম বাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিম বাবুর সম্মুখে দুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয় বাবু ছাড়া আমরা তিন জন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিম বাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটি কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই বড় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয় বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"বিষবৃক্ষ।" তিনি—"কোন্ স্থান পড়িব?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতি-প্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।" আমাকে অক্ষয় বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর

স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী। তখন বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ বাবু আসিলেন। আমি 'মৃণালিনী'র গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবু হারমোনিয়ামের সঙ্গে তাঁহার দুই একটি গান গাইলেন। কাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল।" ('আমার জীবন,' ২য় ভাগ, পৃ. ৩৬৩-৬৭)

* * *

"কি উপলক্ষে, স্মরণ হয় না, এ সময়ে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই। স্মরণ হয়, ১৮৭৬ [১৮৭৭ ?] খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—"ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম—সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন-কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।

তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি "নেশনাল মেলায়" গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন—"কে? রবিঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।" তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে—আজ "কাঁচামিঠা আঁব" পরিপক্ক "ফজলী"। তাঁহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। রবিবাবু আজ বাঙ্গলার 'শেলি' 'কিট্‌স্' 'এডগার পো'—কত কিছু বলিয়া পরিচিত। নব্য বঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।

এ সময় রাণাঘাটে রবিবাবুর যে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা আমাদের বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

"হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র—তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ-বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের সহিত ক্ষণ কালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাসখানেক হইল, রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম যে, আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্যপরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন

আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য-পরিষদ্ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শন লাভ হইল না। সহৃদয়তা গুণে আজ আপনি নিজ হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি, ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।"

স্মরণ হয়, ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম, আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গসাহিত্য উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা, তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু উর্দ্ধে হইবে। মাইকেল 'মেঘনাদবধ' কাব্যের, হেমবাবু 'বৃত্রসংহারে'র এবং আমি 'পলাশির যুদ্ধে'র কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রবিবাবু কোনও এক কাব্যবিশেষের কবি বলিয়া কেহ তাঁহার নাম করেন না। অথচ তিনি রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান গীতিকবি। শুনিয়াছি, তাঁহার বিশ্বাস, বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।

ইহার কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার জমিদারী কার্য্যে কুষ্ঠিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম—সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকাশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু-শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশ্‌মা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতা-ব্যঞ্জক। গাড়ী হইতে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।"

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। রবিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল। তিনি, এ হইতে নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিতে

লাগিলেন। নির্ম্মল তাঁহার গানে নূতন নূতন সুর দিয়া গাইয়াছিল বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না; কারণ, যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দ্দা কিছু ক্ষণ টিপিয়া, সুরটি মাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহা গাইতে লাগিলেন। আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি।

গীত।

১

এস এস ফিরে এস!
বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে! ফিরে এস!

২

আমার নিষ্ঠুর ফিরে এস হে!
আমার করুণ কোমল এস!
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি
সুন্দর ফিরে এস!

আমার নিতি সুখ ফিরে এস !
আমার চির দুঃখ ফিরে এস !
আমার সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন !
অন্তরে ফিরে এস !

... ...

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস ; তাহাতে রবি বাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ ! আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শ মাত্র অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গি ! গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে ! আমি তখন "রৈবতক"—"কুরুক্ষেত্রের" কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল ; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবি বাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তার পর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরম্" গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই। তিনি বাঙ্গালি অন্য কাহারও গান যে জানেন, কি বাঙ্গালি অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাঁহার কথায় বোধ হইল না। শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবুও শেষ জীবনে অন্য কাহারও বহি পড়িতেন না। আমি কিন্তু ভাল বহি বাহির হইলেই

পড়ি। তবে নির্ম্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শুনিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন। কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা গান গিরিশ ঘোষের রচিত বলিলে, বলিলেন—"শুনিয়াছি তিনি গান রচনা করিতে পারেন।" এই পর্য্যন্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বলিত রবি বাবুর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। বিশেষতঃ উপরের কীর্ত্তনটি লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" আমি বলিলাম—"উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কাল পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু সজল হইল। দেখিলাম, আমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাঁহার চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল। গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবি বাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই। তাহার পর তাঁহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধু বাবুর গানগুলি ৪।৬ লাইন একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোয়ারা এবং তাঁহার গানগুলি বড় দীর্ঘ, এক একটি কবিতাবিশেষ, বলিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার ছোট ছোট গানও আছে। তাঁহার 'সোনার তরী' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীদৃশ্যের একটি ফটো। কিন্তু উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বড় বুঝিলাম না।...

নগর-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছু ক্ষণ রবি বাবুর ও নির্ম্মলের গান হইল। পরে 'টেবিলে' পানাহার বড় আনন্দের সহিত চলিতে লাগিল। রবি বাবুর মার্জ্জিত সোণার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ঈষদ্ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুরবাড়ীর ওজন-মাপা চাপা কথা, চাপা হাসি, ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আমি আর পারিলাম না। সুরা দেবীও পরিমিত শিষ্টাচারের বন্ধন কিছু শিথিল করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম— "রবি বাবু! সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জ্বালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!" তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরাণী সকালে একদিকে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর বোঝাই লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার বৈঠকখানার বীরকে (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ— আমি 'বাঙ্গালের' আলাপে রবি বাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও সুরেন্দ্র বাবু উভয়ে রবি বাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া

জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। রবি বাবু তাঁহার জমিদারি কাছারি হইতে লিখিলেন—"এমন কখনই মনে করিবেন না যে, আপনার স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি—বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্র-শক্তি স্বল্প-ক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম। এবং তাহাও ব্রাহ্মণ-সুলভ লোভবশতঃ সঙ্গে বাঁধিয়া আনিয়াছি।" 'সখি! এরূপ না হইলে তোমার নাম প্রিয়ম্বদা হইবে কেন?' এরূপ না হইলে রবি বাবু সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন কেন?" ('আমার জীবন,' চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৬৪-৭৪)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪২

গোবিন্দচন্দ্র রায়
দীনেশচরণ বসু

গোবিন্দচন্দ্র রায়
দীনেশচরণ বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

গোবিন্দচন্দ্র রায়

১৮৩৮—১৯১৭

ঢাকার 'প্রতিভা' পত্রিকায় (মাঘ ১৩২৪) কামিনীকুমার সেন গোবিন্দচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল :—

বংশ-পরিচয় : কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৭৬০ শকে অর্থাৎ বাংলা ১২৪৫ সনের ৬ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা স্বর্গীয় গৌরসুন্দর রায়। নিবাস ফরিদপুর জিলার দক্ষিণপাড় গ্রাম।

৺গৌরসুন্দর রায় মহাশয় পুত্র সম্পদে পরম সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন। ইনি ঢাকায় নীলকর ও জমিদার জে. পি. ওয়াইজ সাহেবের দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। ইহার দুই পরিণয়। প্রথমা পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র রায়; মধ্যম, ঢাকার দিগন্তবিশ্রুতনামা উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় এবং কনিষ্ঠ বেরিলীর ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল সঙ্গীতবিদ্‌ শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র রায়। গোবিন্দচন্দ্র আনন্দবাবু অপেক্ষা প্রায় ৭ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

শিক্ষা : গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা পোগোজ স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। পিতা গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। গোবিন্দচন্দ্র একটু একটু সংস্কৃত পড়িতেন এবং সোণার গাঁয়ের বর্ত্তমান জমিদার মৌলবী আবুল খয়রাতের পিতার নিকট ফার্‌সী অভ্যাস করিতেন। এই দুই ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলেও স্বকুলোচিত স্বাভাবিক

প্রতিভাবলে এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও অধ্যয়নে নিরন্তর পরিশ্রমে উহাতে কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন।...

ধর্ম্ম ঃ পিতা গৌরসুন্দর রায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাতেই প্রথম বয়সে গোবিন্দচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ থাকিয়া প্রতিদিন দীর্ঘকাল পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন।...ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি রামমোহন রায় প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকগুলি পড়িতে আরম্ভ করেন। এবং এই সময় হইতে তাঁহার হিন্দুমত বদ্‌লাইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আস্থা বাড়িতে থাকে। অবশেষে যখন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় ব্রাহ্ম দলের নেতা, তখন তিনি সেই সম্প্রদায়ে একেবারে মিশিয়া গেলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় গোবিন্দচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই পিতার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণের লক্ষণ উপবীত পরিত্যাগ করায় পিতাকর্ত্তৃক গৃহ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, গোবিন্দচন্দ্রের বহিষ্কৃত হইবার দিন তাঁহারা দুই সহোদর গৃহহীনের ন্যায় সমস্ত রাত্রি ঢাকার সহরে পথে পথে বিচরণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন।

বিবাহ ঃ ইতিপূর্ব্বে ১২৬১-৬২ সনে গোবিন্দচন্দ্র দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

কর্ম্মজীবন ঃ এই সময় তিনি কিছুকাল ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার অধীন ঐ গ্রামের মাইনর স্কুলে এবং তৎপর কুমিল্লা জিলায় বিদ্যাকূট গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। অনন্তর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মতিলাল ঘোষ মহাশয়দের যশোর "বাঘআছরা" স্থিত

বাটীতে যাইয়া বাস করিতে এবং তথাকার স্কুলে পড়াইতে লাগিলেন। সেখান হইতে আসিয়া শান্তিপুরে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাসস্থলীতে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। তৎপর তথা হইতে বরিশালে চলিয়া আসেন এবং কিছুদিন উকিল দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বরিশাল রাজকীয় জরিপ-বিভাগে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে এক কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হন। ঐ চাকুরীতে থাকা কালীন তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দুষ্টচরিত্রের বিষয় "ঢাকা প্রকাশ" কাগজে লিখিয়া পাঠাইলে, যখন তাঁহার নামে ফৌজদারী অভিযোগের পরামর্শ চলিতে লাগিল, তখন তিনি সপরিবারে ইং ১৮৬৮ সনে একবারে কাশীধামে চলিয়া গেলেন। কাশীধামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রেয়ের ঔষধালয়ের শিক্ষানবীশ ও বেতনভূক্ কর্ম্মচারী স্বরূপে চারি বৎসর অতীত হয় এবং এখানে চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি কাশীর জজ মিঃ আয়র্ণসাইডের (Ironside) সুদৃষ্টিতে পতিত হন। জজ আয়র্ণসাইড্ আগ্রাতে বদলী হইবার সময় গোবিন্দচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়া আগ্রায় লইয়া গেলেন এবং চেষ্টা করিয়া ইং ১৮৭১ সালে গোবিন্দচন্দ্রকে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষাধালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। সেই অবধি গোবিন্দচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বরূপে আগ্রায় আমরণ বাস করিয়াছেন। আগ্রার শুষ্ক আবহাওয়ায় নিরন্তর বাস করিতেন বলিয়া বঙ্গদেশের সরস জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে বলা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি কনিষ্ঠ সহোদর আনন্দবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"সন্ত্যজ্য যমুনাতীরং তীর্থং অতিমনোহরং।
ন যাস্যামি পঞ্চস্বার্থে নগরে কলিকেতনে॥"

এইরূপে তিনি সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া ৭৯ বৎসর বয়সে ১৩২৪ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার, আমাশয়ের পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর প্রায় ২৩ বৎসর যাবৎ মৃত্যু হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র ও দুই কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নী এবং তদ্‌গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন।...

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। গান বাজনা ইহার পিতামহের সময় হইতেই পরিবারে পরম আদৃত হইয়া আসিতেছিল। পরে পশ্চিম দেশ প্রবাসী হইয়া তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় ভূয়ঃ অনুশীলন করিয়াছিলেন।

রচনাবলী

প্রবাস-জীবনে গোবিন্দচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া অবসর বিনোদন করিতেন তাঁহার রচিত যে কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **গীতিকবিতা**, ১ম ভাগ। ১২৮৮, মাঘ (?)। পৃ. ১২+১২।

স্চী :—ভারতবিলাপ, যমুনালহরী।

গীতিকবিতা, ২য় ভাগ। ১২৮৮ সাল, ইং ১৮৮২। পৃ. ২৪।

স্চী :—তাজমহল; বাঙ্গালার বর্ষা; বৈজ্ঞানিক ও ভট্টাচার্য্য; গান :—নে রে বিদায় ভারতে আজি হোরি; বিজ্ঞান উৎসব; গান :—আইল শরদ শোভিত দেখ।

গীতিকবিতা, ৩য়-৪র্থ ভাগ। ? (১০ এপ্রিল ১৮৮৩)। পৃ. ৪৫

৩য় ভাগের (পৃ. ১-২৪) সূচী :—বৃন্দাবন মঞ্জরী, বারাণসী ও বঙ্গীয় ভ্রমর।

৪র্থ ভাগের সূচী :—জীবন সরোবর; অদৃষ্ট; বাদল; সন্ধ্যা; গান :—নূতন যতবার দেখি, ও মুখ রূপরাশি; গান :—অভিমান মেঘে ভাল শোভিয়াছে মুখশশি; গান :—উদাস খেলে আজি প্রকৃতি আবাসে; গান :—বিহরে মলয় দেখ মুকুলে মুকুলে; গান :—কেনে রে বসন্ত এলি পুন ভারতে; গান :—কাহার উৎসবে আজি বনপুরে; গান :—যায় রে বহিয়ে ঐ, প্রখর কালের স্রোতে; গান :—নিশি কি স্বপন মাঝে, আসি পোহালি; গান :—যে গেল সে গেল, চিরজীবন তরে; তাজমহল প্রতি; গান :—উঠ্ রে বাছা সকল ডাকেন ভারত মা দুঃখিনী; গান :—দুখের সময় চিরতো রয় না; নিশীথ তারকা।

শ্রীবাটী "চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্যসভা" হইতে রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র চারি ভাগ 'গীতিকবিতা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকাশক "উৎসর্গ পত্রী"তে ঢাকার সাহিত্য সমালোচনী সভার উদ্দেশে লিখিয়াছেন :—"মদীয় আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যটন লব্ধ মহারত্ন এই গীতিকবিতা যথোচিত বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনাদের সভায় অর্পিত হইল।...শ্রীবাটী, ১লা মাঘ ১২৮৮।"

২। **রোমিও জুলিয়েত**। (১৯ আগস্ট ১৮৮৭)। পৃ. ১১২।

ভিষক-দুহিতা (Alls Well that ends Well)। ইং ১৮৮৮ (১ এপ্রিল)। পৃ. ১৭৯।

ইহা "Shakespeare, উপন্যাস:কুসুম," ১ম ও ২য় স্তবক।

পাঠ্য পুস্তক : গোবিন্দচন্দ্র কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—

শিশুবোধ, ১ম-২য় ভাগ (মার্চ ১৮৯৩)

কবিতালহরী (৩০ মার্চ ১৮৯৩)। পৃ. ১৩৬।

রামলক্ষ্মণ—কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত (১ এপ্রিল ১৮৯৫)। পৃ. ৭৮।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : গোবিন্দচন্দ্রের গদ্য-পদ্য বহু রচনা কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধব' (১২৮১-২, -৮৫), গগনচন্দ্র হোম-সম্পাদিত 'আলোচনা' (১ম-২য় বর্ষ), 'পল্লব,' 'প্রতিভা' (মাঘ ১৩২৪) প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। এই সকল রচনার কয়েকটি "প্রবাসী" স্বাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গানে' (পৃ. ৬০৭) তাঁহার রচিত "না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো)" গানটি মুদ্রিত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন : 'যমুনালহরী' ও 'ভারতবিলাপে'র কবি হিসাবে গোবিন্দচন্দ্রের নাম সুবিদিত। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যেও এ দুইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভারতবিলাপ

কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে। ১
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে। ২

নিজ বাস ভূমে, পরবাসি হলে
পর দাস খতে সমুদায় দিলে। ৩
পরহাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে। ৪
পর ভাষণ আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে। ৫
পর দীপ শিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। ৬
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, সৌধ শিরে
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে। ৭
খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে। ৮
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত বনে দুর-ভিক্ষ নিলে। ৯
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে। ১০
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে। ১১
বিধি বাদ হলে, পরমাদ রটে
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে। ১২
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে। ১৩
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ। ১৪

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম্ম দিলে। ১৫
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে। ১৬
লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে
হত জীবন চা অহিফেন চষে। ১৭
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পর সেবা লেগে। ১৮
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায়। ১৯
শুনিবে বল কে, তব আপন কে
পরদাস দশায় বধির সবে। ২০
অহ! কে কহিবে এ, সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা। ২১
কহিতে বুক চায়, দুভাগ হতে
নয়নে উথলে জল স্রোত শতে। ২২
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট পথে। ২৩
নিজ ছায়া পড়ে, পর কায়ে যদা
রহ ভীত পদে পথ পাশে সদা। ২৪
পড়িলে পর তুঙ্গ তুরঙ্গ মুখে
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে। ২৫
কি করে গুণ গ্রাম, সহস্র ঘটে
শির না লুঁঠিলে রুটি নাহি ঘটে। ২৬

পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে
তব ভ্রান্তি হলে ভূমি কম্প ধরে। ২৭
উলটে পৃথিবী, পরগা পরশে
সুখ শান্তি লভে তব কায় রসে। ২৮
আজি যে টুকু মাল, লভে কুকুরে
ঘটে সে টুকু না তব বাসি নরে। ২৯
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা। ৩০
মন চায় কষায়, কৌপীন পরি
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি। ৩১
শিখিলে পর, শিক্ষিত জ্ঞান যত
কিছু না কিছু না সুদু বাক্য গত। ৩২
মথিলে পর, দেশজ আদি রসে
তনু আপনি জর্জর যার বিষে। ৩৩
পরিণাম অসার, এ গল্প ঝুরী
সুদু কীট, শরীর প্রবৃদ্ধকরী। ৩৪
বহুরাশি পদার্থ, বুকে রহিতে
কিছু আসিল না নিজ কায পথে। ৩৫
পর হাতে পড়ে, উদরান্ন তরে
মরিলে সুদু শব্দ মুখস্থ কোরে। ৩৬
পদ পিছলি লো, তব জ্ঞান পথে
হলো কুৎসিত গা উপহাস শতে। ৩৭
তব উন্নত মস্তক কাল গত
হলো প্রস্তর পুত্তল পায়ে নত। ৩৮

পর সাগর ভূ, মথিছে অভয়ে
তুমি মূর্চ্ছিত ভূত পিশাচ ভয়ে। ৩৯
মিলি কার্য্য করে, পশু কীট বনে
সব যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে। ৪০
কত দেশ বসে, অবনি ভিতরে
তব তুল্য তিরস্কৃত কে অপরে। ৪১
সব আত্মবশে, নিজ বাহু বলে
সুখ ভোগ করে বসি শত্রু দলে। ৪২
তব নির্ভর নিত্য পরের করে
অশনে বসনে গমনের তরে। ৪৩
যদি দেয় পরে, স্বরগের সুখে
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে। ৪৪
সুখ যে উপজে, অনধীন জনে
পুছ রে পশু কীট বিহঙ্গগণে। ৪৫
নিজ মাতৃ দুধে, পরিপুষ্ট জনে
পর লালিত পায় কি পার রণে। ৪৬
বন বর্ব্বর ও, স্ববশত্ব খুঁজে
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে। ৪৭
বহিয়ে ঝড়, বাদল যায় চলে
চির দুর্দ্দিন এ তব ভালতলে। ৪৮
তব আশ কিসে, তুমি নাশ ঘরে
ক্ষয় এর করে নয় ওর করে। ৪৯
অহ! যে দিকে, আঁখি পড়ে ফিরিতে
নিরখে সুহৃ পঞ্জর চারি ভিতে। ৫০

সময়ের মুখচ্যুত কীর্ত্তিজালে
কহিছে তবু যা ছিল ভূত কালে। ৫১
আজি শূন্য হিয়া, কত আর ধরে
লুঁঠিলে শতবার রহে কি পরে। ৫২
বিনি পীড়িত কে, কি নিপীড়ন রে!
সুদু খড়্গ নিপাত মড়া উপরে! ৫৩
কি হবে চুষিয়ে, শুকনা সরসে
শ্রম সার বিড়ম্বন তৃষ্ণা বশে। ৫৪
ছিল রে সব, কাল কৃপালু যবে
কত দেশ বিভাতিল সে বিভবে। ৫৫
কত পদ্ম বিকাশিল, এ সরসে
দিক পূরিল যার সুগন্ধ রসে। ৫৬
কত দীন ধনী, হইলো পরশি
মরু পুষ্পিল এই হলে করষি। ৫৭
ছিল অন্ধে যবে, তম সন্তরণে
তখনি রবি ভাতিল এ গগনে। ৫৮
পরকাশি, সুনির্ম্মল অংশুগণে
দিল চেতনা নিদ্রিত লোক মনে। ৫৯
ছিল বাল দশায়, স্বভাব যবে
দিল আকৃতি জ্ঞান কথায় তবে। ৬০
উপহার লভে, সময়ের সবে
চিরকাল কবে অধিকার ভবে। ৬১
ঘুচিয়ে সব, প্লাবিত হীন প্রথা
হলো সে গত গৌরব গল্প কথা। ৬২

কি হলো কি হলো, পুর বাসি জনে
উন্মত্ত সুরা রসনে ব্যসনে। ৬৩
মজি ভোগ বিলাসে, বিহার বনে
হত বুদ্ধি সামর্থ্য শরীর সনে। ৬৪
হত রূপ যুবায়, জরার মত
নিরবীর্য্য বিশীর্ণ শরীর যত। ৬৫
গত গৌরব সে রজপুত বংশে
শব রূপ সবে অফিফেন রসে। ৬৬
ঘুচি রাজ্য রলো, নৃপ শব্দ পথে
পুরুষত্ব রলো পরদার ব্রতে। ৬৭
গণিকার প্রভা, হলো রাজ সভা
অবিচার তমান্ধ অরণ্য নিভা। ৬৮
রলো কাগজ সার ধনীর ঘরে
সুদ বৃত্তি হলো দিনঃ পাত তরে। ৬৯
রলো নাম বণিক্, ব্যবসায় বিনে
নির অন্ন ঘরে পর পণ্য কিনে। ৭০
যত ক্ষত্র কুলে, দরবান রলো
দ্বিজ পাচক ঘোটক বান হলো। ৭১
সব জ্ঞান রলো, পুথিপাত তলে
হলো পল্লব গ্রাহক বিজ্ঞদলে। ৭২
রলো ধর্ম্ম কি, ভক্ষ্য অভক্ষ্য নিয়ে
তমজালে বিকীর্ণ সুদীন হিয়ে। ৭৩
যত মান রলো, হয় যান ঘরে
অপমান হলো উষ্ণীষ শিরে। ৭৪

সদভাব, প্রভাব কথায় রলো
যত উদ্যম লেখনি সার হলো। ৭৫
পরি চীর কৃষাণ, পরের তরে
উপবাস ঘরে তবু চাষ করে। ৭৬
অলসে অবশে, পরগ্রাস রসে
ক্রমে দীন দশা দিবসে দিবসে। ৭৭
খুইয়ে সব থাকিল জাতি লয়ে
ক্ষয়িতে সকলে শত ভাগ হয়ে। ৭৮
পর পাদ বিলেহীর জাতি কিসে
সুদু বন্ধন শৃঙ্খল চারি দিশে। ৭৯
হয় লাজ মনে, গত আর্য্য সনে
গণিতে যত এ সব হীন জনে। ৮০
ছিল যে কিছু কে, পরতীতি করে
চিনিতে কিছু নাহিক চিহ্ন ধরে। ৮১
যত দেখিছ এই শরীর গণে
বহিছে সুদু আকৃতি প্রাণ বিনে। ৮২
চরিছে যদি ও কহিতেছে কথা
তড়িতের বলে মৃত ভেক যথা। ৮৩
যত ভারত কামিনী, আছ ঘরে
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে। ৮৪
কি হবে প্রসবে, অযুতে অযুতে
বলবীর্য্য বিবর্জ্জিত দাস সুতে। ৮৫
যদি নাহি হবে, সুত শূর হয়ে
সুদু গর্ভ ব্যথায় কি কাজ সয়ে। ৮৬

উপযুক্ত নহে, রতি কাপুরুষে
স্থদু দেশ বিড়ম্বিত পাপ বশে। ৮৭
ছি! ছি! আজি, এ কুৎসিত বেশ পরে
কি স্থখে সকলে ঘুম যাও ঘরে। ৮৮
ধর প্রীতি মনে, যদি দেশ বলে
ভাস রে সকলে ভাস অশ্রুজলে। ৮৯
ত্যজ রে ত্যজ আত্ম, সুখের কথা
ত্যজ আমোদ ভোগ বিলাস বৃথা। ৯০
পর কষ্ট বিভূতি, শরীর গণে
চল চৌদিক সাধন আহরণে। ৯১
গত কালের তাবত, পাপ ফলে
ধোও শোণিত বা নয়নের জলে। ৯২
খুইয়ে নিজ দেশ, মলিন মুখে
ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থ স্থখে। ৯৩
পরিবেষ্টিত, শাবক সঙ্গিগণে
পশু ও প্রতিপালন পায় বনে। ৯৪
পশু সঙ্গে চরে, নর ভূমিতলে
স্থদু উন্নত এক মহত্ত্ব বলে। ৯৫
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হলে
ফল লাভ কি মানুষ নাম নিলে। ৯৬
নরলক্ষণহীন, নরাঙ্গ পরি
কি হবে তনুভার লয়ে বিচরি। ৯৭
যদি কারু হতে, কিছু নাহি হবে
কর জীবন ধারণে ক্ষান্ত সবে। ৯৮

ডুবি যাকু জলে, তব বাস যথা
ভুলি যাকু সবে তব নাম কথা। ৯৯
কভু যেমন কেহ, না পায় কবে।
খুজি ভারত নামক দেশ ভবে। ১০০

যমুনালহরী

নির্ম্মল সলিলে, বাহছ সদা।
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে! ও (ধ্রু)

১

কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও।

২

যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

৩

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত গাথা ও।

৪

তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শবনীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।

৫

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৬

তব জল তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজসিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৭

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৮

এ জল ধারে, ধারে বাহিল কভু,
প্রেম বিরহ আঁখি নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত পুলিনে ও।

৯

এ তনু মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্লাবিতো চিত সুখ উৎসে ও।

১০

সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

১১

যে মুরলী রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে, তব তট পানে,
ধাইত রব সন্ধানে ও।

১২

বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।

১৩

সে সব কৌতুক, কাল কবল আজি,
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ সৌরভ,
হলো পরিণত শত-কাহিনী ও।

১৪

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পঠান্ অফ্‌গান মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

১৫

অহ! কি কু দিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটী পালটী,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও।

১৬

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল—অর্গল পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

১৭

সে দিন হইতে, তব জল তরঙ্গে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

১৮

সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
নূপুর নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতি কূলে,
যে দিন ভারত বন্ধন ও।

১৯

এ পয় পারে, কত কত জাতীয়
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

২০

কত শত দুৰ্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট দেশে ও।
নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চির যুগ সম্ভোগ আশে ও।

২১

পহসি সর্ব্বে, মানব গর্ব্বে,
কাল প্রবাল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় ভুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

২২

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে কত যৌবন রেখা ও।

২৩

এর অলিন্দে, সুন্দরী বৃন্দে,
মোগল নরপতিকেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

২৪

কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ বিনাশক ও।

২৫

এ ঘর মাঝে, নারী সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফর কণ্ঠ বিদারী ও।

২৬

কৈ ? সব আজি, সময় সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হলো কি নিবারিত,
নিরস্ত্র মনুজ পিপাসা ও।

২৭

যে গৃহ পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি পদ বিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

২৮

যে ঘর মধ্যে, সুরভি সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতি গন্ধ বিকীরণ ও।

২৯

যে গৃহ অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি! এক কালে,
ঢাকিল লতা জালে ও।

৩০

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিক দিক হইতে,
কর্ষে মনুজ সমাজে ও।

৩১

কত নর পঞ্জরে, নিৰ্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা গৌরব শেষে ও।

৩২

অহ ! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি ! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে তব জল নীলে
ব্যঞ্জিতে, মন অভিলাষে ও।

৩৩

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
পরিমিত স্থর পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ দেশে,
আকাশে সুহ্ন বায়ু ও।

৩৪

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

দিন কি এমন হবে

দিন কি এমন হবে এ ভারতে, দিন কি এমন হবে !
গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাঁই, একি গান একি রবে। ধ্রু।
ভূমি কি সাগরে, শান্তি কি সমরে,
স্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘুরে

তুলিয়া গলা রে, গাবে বলভরে
ভাই ভাই যেন সবে।
দিন কি এমন হবে !!

কুমারী হইতে, হিমাদ্রি লইয়া,
উঠিবে সে তানে, বাঁশরি বাজিয়া,
উঠিবে হৃদয় মরমে নাচিয়া
পরশি সে সুর তবে।
দিন কি এমন হবে !!

সাগরে সাগরে, ভাসায়ে তরণী,
গাইবে সাহসে, ধরিয়া ক্ষেপণী,
উঠিবে তুফান, কাঁপায়ে মেদিনী,
গরজি গভীর যবে।
দিন কি এমন হবে !!

যথাই না যাবে, যে দেশে ঘুরিবে,
এ বন, এ গিরি, নয়নে ভাসিবে,
রহিবে লাগিয়া, এ নদী নির্ঝর
সে কাণে মধুর রবে।
দিন কি এমন হবে !!

চষিবে চাষিবে, বুনাবে বানাবে,
মিলি মিশি সবে, আপনাতে রবে,
হাতে হাতে ধরি নাচিবে গাইবে,
তাড়াবে যে দুখ ভবে।
দিন কি এমন হবে !!

মোছাবে সবার চকের কাঁদনা,
ঘুচাবে যার যে ক্ষুধার যাতনা,
এ প্রাণ এ মনে সাধিবে সাধনা ;
বেঁটে খাবে সমভাবে।
দিন কি এমন হবে !!
ছুটিবে চৌদিকে, খুঁজিবে থাজিবে,
দুখের মোচনে উপায় দেখিবে
কারু নাহি হবে, নাহি ভুলি রবে
আপনা স্বদেশে কবে।
দিন কি এমন হবে !!
আনিবে উঠাই' যা ভাল যেখানে,
ফেলাবে ছুটাই, মন্দ যা স্বধামে
করি ভর পরিমিতে পরিশ্রমে
দল বেঁধে বেঁধে সবে
দিন কি এমন হবে !!
পরশিতে কেউ আঙ্গুলের ধারে
উঠিবে জাগিয়া সকল শরীরে,
একের গ্লানিতে সবে গ্লানি ভরে
একতনু হয়ে রবে ;
তবে সে সে দিন হবে এ ভারতে,
তবে সে দিন হবে।
গাইবে সবাই কাযেতে কেবল
সুরে না এ গান এ গান যবে।
দিন কি এমন হবে !!

দীনেশচরণ বসু

১৮৫১—১৮৯৮

'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত (কার্ত্তিক ১৩০৪) "বাঙ্গলা ভাষার লেখক" প্রবন্ধে দীনেশচরণ বসুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ।—

দানেশচরণ বসু। পিতার নাম ৺অভয়াচরণ বসু। বঙ্গজ কায়স্থ। সম্ভ্রান্ত বংশ। সাং শ্রীবাড়ী,—উথলি পোষ্ট,—মাণিকগঞ্জ মহকুমা,—জেলা—ঢাকা। জন্ম ১৭৭২ শক ১২ই ফাল্গুন।

* * *

ইনি পিতা মাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। সুতরাং বাল্যকাল হইতে বিশেষ আদরে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছেন। তখন পিতার অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল ছিল। তিনি পূর্ণিয়ার ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। উত্তম পারসী জানিতেন। তখনকার সেরেস্তাদারিতে বিলক্ষণ দু' পয়সা আয় ছিল। পূর্ণিয়াতেই দীনেশ বাবুর জন্ম ও হাতে খড়ি হয়। পিতা বদ্‌লী হইয়া ভাগলপুর যান, দীনেশচরণকেও পিতার সমভিব্যাহারী হইতে হইল। ভাগলপুর ইংরেজী স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হইলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল ; কিন্তু গণিতে ঠিক তাহার বিপরীত।...ইহার ফলে, উপরি উপরি দুইবার তাঁহাকে ফেল হইতে হয়। কিন্তু শেষে মেধাবী দিনেশচরণ অঙ্কে চলনসই অধিকার লাভ করিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

এই পঠদ্দশায় ভাগলপুর হইতে, দীনেশচরণ একবার সখের পলাতক আসামী হন। দেশ-ভ্রমণের আসক্তিই এই পলায়নের কারণ। সঙ্গে অবশ্য একজন জুড়িদার জুটিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চলের বহু স্থান ভ্রমণ করিবার পর, তাঁহাদের এক আত্মীয় তাঁহার সন্ধান পাইয়া ধরিয়া ফেলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট পঁছাইয়া দেন।...

অতঃপর দীনেশচরণ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া, মস্তিষ্কের একটি পীড়া লইয়া, বাটী গিয়া উঠিলেন। স্কুল-কলেজের পড়া-শুনা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বাটীতে তিনি নিয়মিতরূপে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ইতিহাস তিনি অনেক পড়িয়াছেন। পঠদ্দশায় ডিবেটিং ক্লব প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ইংরেজীতে বক্তৃতাদি করিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ইঁহার সাহিত্য-জীবনের একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর দীনেশচরণের মৃত্যু হইলে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। গত ২৭শে আশ্বিন সুকবি দীনেশচরণ বসু ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু অতি শোচনীয়; ঢাকা জজ আফিসে জুরির জন্য আহূত হইয়া তিনি স্বীয় গ্রাম শ্রীবাড়ী হইতে ঢাকা মুখে রওনা হইয়াছিলেন; গোয়ালন্দ পৌঁছিয়া কলেরা রোগাক্রান্ত হন এবং পুনরায় বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; পথে পদ্মাবক্ষে—স্বগ্রামের অনতিদূরে নীলাকাশের প্রান্তনীল শ্রীবাড়ীর তরুরাজির অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অতি অল্প ব্যবধানের জন্য তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পরিজনের মুখ দেখিতে পান নাই।

অনতিক্রান্ত বিংশবর্ষ বয়সে কবি যখন 'মানস-বিকাশ' রচনা করিয়াছিলেন, তখন বঙ্কিমবাবু সেই ক্ষুদ্র কাব্যের অশেষরূপ যশোকীর্ত্তন করিয়া বঙ্গদর্শনে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। একদা তাঁহার কবিতাগুচ্ছে 'বান্ধব' নিত্য কুসুমিত থাকিত। তিনি কতক দিনের জন্য 'চারুবার্ত্তা' ও 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন; সেই সেই সময় উক্ত দুই পত্রিকা প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; এক সময় ষ্টেট্সম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'কবিকাহিনী,' 'মানসবিকাশ,' 'মহাপ্রস্থান' ও 'কুলকলঙ্কিনী' প্রভৃতি অনেক পুস্তকই সাধারণের নিকট সুপরিচিত এবং তাঁহার অসংখ্য গান নবকান্ত বাবুর সঙ্কলিত 'সঙ্গীতমুক্তাবলী'তে পাওয়া যাইবে।...

এই কবির রচনায় একরূপ মুগ্ধকর গ্রাম্য-পুষ্পের সুবাস আছে এবং অনেকগুলিরই অন্তর্নিহিত একরূপ সকরুণ আর্ত্তধ্বনি আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে অনেক অতীত স্বপ্ন জাগিয়া উঠে ও নয়নপ্রান্তে অশ্রুকণা দেখা দেয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাকে এই কয়েক ছত্র কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।—

"আর কেন আশা! প্রদীপ নির্ব্বাণ কর।
অনন্ত ধর হে এ অভাগারে ধর॥
সংসার সাগরে এ জীর্ণ জীবনতরী,
পাইল না কূল, অকূল-কাণ্ডারী হরি
তুমি হে থাকিতে। দিন পরে দিন যায়;
দুর্দ্দিনের মেঘ দ্বিগুণ গরজে হায়।

প্রণয় বিষাক্ত, স্নেহেতে মিটে না আশা,
ভালবাসা যেন ভোজবাজীর তামাসা।
অর্থের চিন্তায় রজনী প্রভাত হয়,
অর্থের চিন্তায় দিবা রজনীতে লয়।
প্রবল বাত্যায় ধরাশায়ী হ'লে শাখী,
বৃক্ষান্তরে যথা আশ্রয় লভয়ে পাখী,
সেইরূপ হায়! পরিজন যত ছিল।
দুর্দ্দিন দেখিয়া একে একে স'রে প'ল ॥

* * *

বেশ মনে পড়ে দেখিতাম এই চক্ষে,
ভাসিতাম সবে সৌভাগ্য সাগর বক্ষে।
উপরে আকাশ নির্ম্মল নীলিমাময়,
নিম্নে নীলাভ প্রশান্ত সাগর বয়,
আমাদের চারু স্বর্ণ তরীর পাশে,
ক্ষুদ্র ডিঙ্গা কত আসিত ভিক্ষার আশে।
সৌভাগ্য পবন বহা'ত ধবল পাল,
রাঙ্গা করে রমা আপনি ধরিতা হা'ল।
হর্ষে দিগঙ্গনা হাসিত আকাশ পটে,
সেই এক দিন, এই এক দিন বটে।"

কবির এইরূপ সকরুণ বিলাপধ্বনি তাঁহার অনেক কবিতায়ই পাওয়া যাইবে। চিরপ্রিয় শ্রীবাড়ীগ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি বেশী দিন কোনখানেই থাকিতেন না। এই ক্ষুদ্র পল্লী তাঁহার নামে উজ্জ্বল ছিল। আজ শ্রীবাড়ী শ্রীহীন হইয়াছে। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রমুখ বন্ধুবর্গ আজ তাঁহার শোকে আকুল।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। তৎসম্বন্ধে উক্ত সনের ১৬ই বৈশাখের পত্রে আমার নিকট নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া পাঠান :—

"পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের উঠন্ত রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। বিগত কল্য তাহাই গিয়াছিলাম। ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দসাগরে ডুবিল! কোন ইংরাজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্ত্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ-নাসা, চক্ষু, ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধান ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবি ঠাকুরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীব Albert ইত্যাদি কেশ রক্ষার ফ্যাসনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিস বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবি ঠাকুরের বয়স অতি অল্প, ২৩শের অধিক হইবে না। কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ "Lady" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবি ঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট, রমণীজনোচিত। রবি ঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই,—"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না...।"

...পদ্মাবক্ষে তাঁহার অকাল-মৃত্যু মনে পড়িলে, সেই সঙ্গে কবিকাহিনীর "গঙ্গাজল শব" শীর্ষক কবিতাটি স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তিনি যেন স্বীয় মৃত্যুর আভাস পাইয়াই উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। "দিবা অবসান প্রায় রজনীর মুখে, কোথা ভেসে যাও শব কহ না আমায়।" আজ আমার কর্ণে বাজিতেছে। সেই কবিতাটিতে পরিজনের দুঃখ অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, বোধ হয় নবদৃষ্ট স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইয়া শব আত্মীয়দিগের আর্ত্তধ্বনি, মন্দসান্ধ্যহিল্লোলনীতে "দূর বাঁশরীর রব" এবং "কৃষকের বৈতালিক তান" কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।...

তিনি তাঁহার শ্মশানমন্দিরে খোদিত করিবার জন্য নিজেই কয়েকটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। মন্দির উঠিয়াছে। কবিতাগুলি শীঘ্রই ঘোষিত হইবে। গ্রাম্য কবির স্মৃতিমন্দিরের দুয়ারে সেই কয়টি দুঃখময় ছত্র লিখিত থাকিবে এবং ইহাই তাঁহার শেষ। এত ভালবাসার পৃথিবীতে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইবার জন্য গন্ত-মুখনর-আত্মা কেন ব্যাকুল হয় কে বলিবে? ('প্রদীপ,' ফাল্গুন ১৩০৫)

রচনাবলী

দীনেশচরণ কয়েকখানি কাব্য ও উপন্যাসের রচয়িতা। সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **মানস বিকাশ** (কাব্য)। ১২৮০ সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)। পৃ. ৭৪।

সূচী:—মৃত্যুশয্যা; কাল; প্রেমপ্রতিমা; মিলন; হ্রদের পার্শ্বে; কেন হাস? কেন কাঁদ? কেন হাস?; উন্মাদিনী; সীতার পত্র; গান—"শেষের সে দিন মন..."।

"মানস বিকাশে'র আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই, কিন্তু ইহা যে দীনেশচরণের রচনা, তাহার একটি প্রমাণ—কবির 'মহাপ্রস্থান কাব্যে'র আখ্যা-পত্রে "'মানস বিকাশ,' 'কবি-কাহিনী' ও 'কুল-কলঙ্কিনী' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত" এইরূপ মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও 'মানস-বিকাশে'র গ্রন্থকার হিসাবে দীনেশচরণের নাম আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' পুস্তকে (পৃ. ৯৪) একটু ভুল করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা দেখিয়া তিনি 'মানস বিকাশ'কে বঙ্কিম-বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

২। **কবি-কাহিনী** (কাব্য)। ইং ১৮৭৬ (২১ আগস্ট)। পৃ. ১২৬।

সূচী :—বীণা, প্রত্যাগত প্রবাসী, ধবলশেখরে (বাঙ্গালিতে প্রকাশিত), বিদায় (ঐ), বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে (ঐ), তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা (বান্ধবে প্রকাশিত), উদাসীনের বিদায় (ঐ), বাঙ্গালি (বাঙ্গালিতে প্রকাশিত), জাহ্নবী (ঐ), কুসুমে কীট, প্রেমসম্মিলন (বিবাহোপলক্ষে উপহার দত্ত), বিরহিণীর স্বপ্ন, বাঙ্গালির শরশয্যা, আর্য্যনাম, গঙ্গাজলে গলিত শব. প্রতিমা বিসর্জ্জন (বান্ধবে প্রকাশিত), শারদীয় উৎসব, উদ্বোধন (বান্ধবে প্রকাশিত "জাগো মা আমার" পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)।

৩। **কুল-কলঙ্কিনী** (উপন্যাস)। (১৭ আগস্ট ১৮৮৩)। পৃ. ২৮৬।

৪। **মহাপ্রস্থান কাব্য**। ১২৯৪ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ২২৩+।০ শুদ্ধিপত্র।

৫। **মোহিনী প্রতিমা বা সরলা** (উপন্যাস)। ১২৯৪ সাল, ইং ১৮৮৮। পৃ. ১২৬।

১৫ ফাল্গুন ১২৯৪ তারিখের 'অনুসন্ধানে' সমালোচিত।

৬। **নিরাশ প্রণয়** (সামাজিক উপন্যাস)। (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ২৮৪।

৭। **বিমাতা না রাক্ষসী** (উপন্যাস)। ১৩০০ সাল (২৬ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ১৪৪।

৮। **পদ্মিনী** (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩০১ (২৭ আগস্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১৮১।

দীনেশ-গ্রন্থাবলী। (২৭ আগস্ট ১৯০৩)। পৃ. ২৬৪ (বসুমতী)।

সূচী :—'মহাপ্রস্থান কাব্য,' 'কুল-কলঙ্কিনী' ও 'কবি-কাহিনী'।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : দীনেশচরণের বহু রচনা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধবে' তাঁহার অনেকগুলি কবিতা, প্রধানতঃ "শ্রীদীঃ" স্বাক্ষরে, মুদ্রিত হইয়াছিল।* গগনচন্দ্র হোম-প্রকাশিত 'আলোচনা'র প্রথম বর্ষে তাঁহার "মহা-সঙ্গীত" ও "সুখধাম যাত্রী" কবিতা স্থান পাইয়াছিল।

রচনার নিদর্শন : দীনেশচরণ সুকবি ছিলেন। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার পুস্তকগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

কাল

১

অনন্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,

* 'বান্ধবে' প্রকাশিত "শ্রীদীঃ" স্বাক্ষরিত গদ্য-রচনাগুলি দীনেশচরণের নহে।— 'বান্ধব,' ভাদ্র ১২৮২, পৃ. ১৫৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ ?
ধরণীতলে ?
এক মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া,
শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া,
সহস্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া,
জলধিজলে,
যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর,
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধর, করিছে হেলা।

২

যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুতুলি স্বকরে গড়িয়া,
বসন ভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলে ;
সেইরূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমেষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি মত
অবনীতলে ;
মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিরবধি, পদ যুগলে।

৩

তৃণ পত্র যথা সাগরসলিলে,
স্রোত রজ্জু ধরে ভেসে যায় চলে,
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে
আপন বলে ;

তেমতি ভূচর খেচরাদি যত,
কাল-স্রোত মাঝে ভাসিছে নিয়ত,
দাস যথা হয়ে প্রভু অনুগত,
সতত চলে ;
যা বলে তা ক'রে যায় যথা যায়,
এ জীবন ধরে, তাহারি কৃপায়, পৃথিবীতলে।

৪

কে কবে দেখেছে কালের সৃজন,
কেই বা দেখিবে ইহার নিধন ?
সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন,
এখন তাই ;
প্রথমে হাসিয়া দিনেশ যখন,
গগনপ্রাঙ্গণে দিল দরশন,
বিদ্যুত আকৃতি ধাইল কিরণ,
আঁধার পাই ;
কত আগে তার মহাশূন্য দেশে,
কালের বিহার, মহাকালবেশে, সকল ঠাঁই।

৫

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশুকিরণ শোভি নভোদেশে,
রজতছটায় ধাইল হরষে
ভুবনময় ;
নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত,
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত,

গ্রহ, উপগ্রহে হয়ে সুশোভিত
হ'ল উদয় ;
তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব সময়।

৬

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে ;
রাজেন্দ্রমুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখনীরে তার কর নিমগন,
পদযুগে পরে কর রে দলন,
আপন বলে ;
সুখের আগারে, বিষাদ আনিয়া,
কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়নজলে !...

প্রেমপ্রতিম

৫

আহা ! কি রূপের রাশি পড়েছে ছড়িয়ে !
কি মধুর হাব ভাব ! কি শান্ত নয়ন !
কি হাসি !—চপলা যেন বেড়ায় খেলিয়ে—
কি আনন্দরসে পূর্ণ ও বিধুবদন !

৬

দেখ চেয়ে!
যেখানে রেখেছ তুমি ও দুটী চরণ
ফুটেছে সেখানে যুগ স্বর্ণ শতদল!
তোমার রূপের কান্তি—কনক কিরণ,
করিয়াছে দশ দিক্ কেমন উজ্জ্বল!

৫

দেখে নাই চক্ষু কভু এহেন মাধুরী,—
সুবর্ণ আলোক পুঞ্জ সংসার আঁধারে,
ভাগ্যবান্ সে প্রদেশ, যথায় সুন্দরি,
নিয়ত বসতি তুমি কর গো আদরে;

৮

ফোটে কি এহেন ফুল পার্থিব কাননে?—
পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ কীটের আবাস,
হাসে কি এহেন বিধু সংসার গগনে?
সাগরে এহেন মুক্তা হয় কি বিকাশ?

১৩

আইলে বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়!
তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,

বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়!

১৪

তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি,
ধরণীতলে!
আঁধার আকাশে হিমাংশুকিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন,
সুখসলিলে!

১৫

কে বলে কেবল নন্দন কাননে
ফোটে পারিজাত? ফোটে না এখানে;—
দেখ চেয়ে এই সংসার কাননে
ফুটেছে কত!
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কত শত ফুল প্রফুল্ল বদনে,
ফোটে নিয়ত!

('মানস বিকাশ')

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা

১

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার ? অন্যে তাহা দেখে না ;
যে জন অন্তরযামী, তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শতশিখা কে করিবে গণনা ?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?

২

এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !
বিধবার চিত্ত, হায় ! ঘোর মরুভূমি প্রায়,
বারিশূন্য, ছায়াশূন্য, সদা ধূ ধূ করে লো !
এক দিন দুই দিন, নহে, শ্যামা, চিরদিন,
যত দিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো !
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো !

৩

কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা' বুঝিবি ?
কেন দেখি অন্ধকার, শূন্যময় এ সংসার,
বুঝায়ে বলিলে তোরে বুঝিতে কি পারিবি ?
নাহিক ঔষধ যার, নাহি তার প্রতিকার
এরূপ রোগের কথা শুনিয়া কি করিবি !
কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা' বুঝিবি ?

৪

আশা-মরীচিকা, শ্যামা, বিধবারে তোষে না,
ভবিষ্যের অন্ধকারে ক্ষণেক তুষিতে তারে,
একটীও ক্ষুদ্র তারা ঝিক্‌মিক্ করে না;
যখন হুতাশে, হায়, প্রাণ যেন ফেটে যায়,
তখন(ও) তাহারে কেহ বুঝাইতে পারে না!
আশা-মরীচিকা, শ্যামা, বিধবারে তোষে না!

৫

অবরোধে উদাসীনী বিধবারা হায় লো!
সংসারের সুখ যত, এই জনমের মত,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া দিয়াছে বিদায় লো!
ভেঙ্গেছে ভোজের বাজি; শূন্যময় সব আজি,
নহে সে কাহারও, শ্যামা, কেহ তার নয় লো!
অবরোধে উদাসীনী বিধবারা হায় লো!

৬

যখন আঁধার আসি, গ্রাসে এই ধরণী;
নিদ্রা গিয়া ঘরে ঘরে, জীবের যন্ত্রণা হরে,
আমার অন্তরে স্মৃতি জেগে উঠে অমনি;
পরাণ অস্থির করে, অধীরে নয়ন ঝরে,
কত কথা মনে পড়ে কহিব কি স্বজনি!
যখন আঁধার আসি গ্রাসে এই ধরণী।

৭

কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে!
জাগিয়া স্বপন দেখি, আঁধার পিঞ্জরে পাখী,

বনবিহারের কথা স্মরি প্রাণে তুষিতে!
চিন্তার স্রোতেতে, হায়, মন-তরী ভেসে যায়
স্মৃতির সহায়ে স্বর্গ হেরি এই মহীতে!
কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে!

৮

ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা নিরখি এ নয়নে,
নাথের মোহন ছবি, যেন মেঘ-মুক্ত রবি,
দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর আনন্দিত বদনে!
বিম্বাধরে সেই হাসি, সেই মুখ-পূর্ণশশী,
সেই নাসা সেই চক্ষু সমুজ্জ্বল কিরণে!
ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামা নিরখি এ নয়নে।

৯

কোন(ও) সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি, স্বজনি!
দেখিতে দেখিতে, হায়, শূন্য ছায়াবাজি প্রায়,
মিশায় নাথের মূর্ত্তি অন্ধকারে অমনি!
মুদি চক্ষু নিদ্রা-আশে, অশ্রুজলে গণ্ড ভাসে,
শোকের সমুদ্র ওঠে উথলিয়া তখনি!
কোন(ও) সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি, স্বজনি!

১৪

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?
যত দিন আছি ভবে, এ কষ্ট সহিতে হবে,
আকাশ-কুসুম-সুখ কখন(ই) পাব না!
হৃদয়-অনলে যবে, পোড়া দেহ ভস্ম হবে,

তবে যদি বিধবার ঘুচে এই যাতনা,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?

প্রতিমা বিসর্জ্জন

১

আশ্বিন-দশমী ! স্থির জাহ্নবীর জলে
বিম্বিত গোধূলি-মুখ করুণ বিমল ;
একখানি ক্ষুদ্র-তরী ধীরে ধীরে চলে
বক্ষে বহি গিরিজার চরণ-কমল ।

২

'যাও বৎসরেক তরে নগেন্দ্রনন্দিনি !'
এতেক কহিয়া সবে তুলিয়া সতীরে
নয়নসলিলে ভাসি হায় রে তখনি
বিসর্জ্জন দিল পূত জাহ্নবীর নীরে ।

৩

চারি দিকে জলরাশি ছিটিয়া উঠিল,
পরদুঃখে যেন নদী কাতর হইয়া
বরষি নয়ন-বারি শোক প্রকাশিল,
যতনে প্রতিমাখানি হৃদয়ে লইয়া ।

৪

উঠিল ছিটিয়া জল ; ধীরে ধীরে, হায় !
প্রতিমা গভীর জলে করিল প্রবেশ ;

এখন(ও) স্ববর্ণ-আভা কিছু দেখা যায়,
এবে আর প্রতিমার নাহিক উদ্দেশ।

৫

এই দশমীর দিনে,—বৎসরেক গত—
হৃদয়-মণ্ডপ মম অন্ধকার করে,
প্রাণের প্রতিমা, হায়, জনমের মত
বিসর্জ্জন দিয়াছিনু কালের সাগরে।

৬

ভক্তেরা শোকার্ত্ত মনে, সত্য, ফিরে যায়,
কিন্তু আশা তাহাদের লভে না নির্ব্বাণ ;
আবার আশ্বিন আসে, হেরে পুনরায়
শরৎসুধাংশু সম উমার বয়ান।

৭

আমার(ও) প্রতিমা কি রে ফিরিবে আবার ?
আশ্বিন, দীনের ভাগ্যে, আর কি আসিবে ?
ঘুচিবে মনের দুঃখ, ঘুচিবে আঁধার ?
আনন্দ-হিল্লোলে হিয়া আর কি দুলিবে ?

৮

কে খুলিল সহসা এ চিন্তার দুয়ার ?
কেন স্মৃতি মায়াবিনী বিগত ঘটনা
নবীন উজ্জ্বল বর্ণে মানসে আমার
আঁকিল, আবার দিতে এ ঘোর যাতনা ?

৯

একটি বৎসর গত দেখিতে দেখিতে !
জীবন-জলধি-তীরে একাকী বসিয়া,
একটি বৎসর হ'তে নয়ন-বারিতে
নিবারি মনের অগ্নি যতন করিয়া।

১০

শৈশবের ভালবাসা—হিরকে যেমন—
এখন সহসা মনে হইল উদয়,
কমল-কলিকা, সম বালিকা যখন
আছিলে, উজ্জ্বল করি জনক আলয়।

১১

তখন আমিও শিশু। একত্রে দু'জনা
একই পুতুল লয়ে খেলিতাম, প্রিয়ে ;
একই দোঁহার চিন্তা, একই ভাবনা—
দুই মুক্তা গাঁথা যেন এক সূত্র দিয়ে।

১২

হেসে গদগদ দোঁহে একই কারণে ;
একই কারণে, হায়, ঝরিত তখন
চারি চক্ষে বারিধারা ; একই দহনে
দহিত প্রভাত-পদ্ম—দোঁহার বদন।

১৩

একত্রে প্রত্যূষে উঠি ফুলডালা হাতে
বহির্ভাগে যাইতাম ফুল তুলিবারে,
সাজিত দোঁহার কেশ শিশির সম্পাতে,
উষার কিরণ হেম চুম্বিত দোঁহারে।

১৪

একত্রে তটিনীতীরে ধীরে ধীরে গিয়া
বসিতাম, খেলিতাম, হাসিতাম কত ;
গণিতাম যত তরী যাইত ভাসিয়া ;
গণিতাম উর্দ্ধগামী বিহঙ্গম যত।

১৫

শৈশবে সকল(ই) মরি, মধুর স্থন্দর !
একদা মধ্যাহ্নে দোঁহে খেলার ছলনে
গেলাম নির্ভয় মনে অরণ্য ভিতর,
উভয়ে উভয় বাঁধি বাহুর বন্ধনে।

(‘কবি-কাহিনী’)

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত ‘ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী’ ও দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত ‘বাঙ্গালীর গানে’ দীনেশচরণের কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। তাঁহার “শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভব ধাম, যবে ছাড়িবে” গানটি স্থপরিচিত।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৩*

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭—১৮৯৪

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫১
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৬৩

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২৯. ১২. ৫৬

জন্ম

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সেকালের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস—হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রাম। ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও কাব্য ছাড়া তর্কভূষণ মহাশয় পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রেও পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদ টীকা সহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তর্কভূষণ মহাশয় তদীয় ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বন্মোদ-যন্ত্রের অধ্যক্ষতাকালে অনেক পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ভূদেব চরিতে' (১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬, ১৮) প্রকাশ :—"বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায়, তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা—শান্তিশতকের টীকায়, তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য—বালবোধিনী নামক বালকশিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান—এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগ—প্রকাশিত হইয়াছিল।" তাঁহার প্রণীত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের তাৎপর্য্যার্থ 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' নামে ১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা ৩৭ নং হরিতকীবাগান লেনে অবস্থানকালে তর্কভূষণ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রচলিত 'সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী' ও 'ভূদেব চরিতে'র মতে তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৭৪৬ শক (১২৩১), ৩রা ফাল্গুন (ইংরেজী ১৮২৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি), রবিবার। এই ইংরেজী বাংলা তারিখে মিল নাই,—৩রা ফাল্গুন না

হইয়া ২রা ফাল্গুন হওয়া উচিত ছিল। সালেও ভুল আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর একটি পুথির মধ্যে ভূদেবের কোষ্ঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

শক° ১৭৪৮।১০।১০ নক্তং দুই প্রহর ১টার পর ১ দণ্ড কিঞ্চিৎ অধিক বা এই সময় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যামার্দ্ধ শু তস্য চতুর্থ দণ্ডে শনেঃ পূর্ব্বাষাঢ়ায়াং
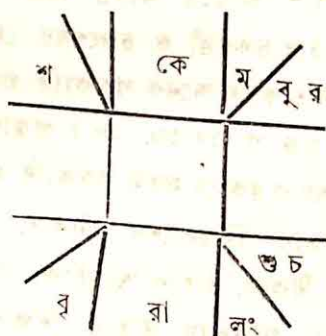
কোষ্ঠীর উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে এবং এই চক্রানুসারেও ভূদেবের জন্ম-তারিখ—১৭৪৮ শক, ১১ই ফাল্গুন, ইংরেজী মতে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে। এই তারিখই যে ঠিক, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। ভূদেব তাঁহার দিনলিপির এক স্থলে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80. Thursday.

Early in the morning I had very strong reminiscences of my past years.

How old am I ? '56 as in the returns

I make to the Acct. General or 54 as my children reckon?

I remember to have been 13 years old when I entered the Hindu College and that was the year of the first Chinese war. If it was in 1839 I am now 54 years of age.*

ছাত্র-জীবন

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, নয় বৎসর বয়সে, ভূদেব কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি সাহিত্য-শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইংরেজী পড়িতে অভিলাষী হন। ইহাতে তাঁহার পিতা আপত্তি করেন নাই। ইংরেজী না শিখিলে যে উন্নতির উপায় নাই, তর্কভূষণ মহাশয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। ভূদেব দুই বৎসর সংস্কৃত কলেজে কাটাইয়া রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ওর্ণচন্দ্র মিত্র-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে, নবীনমাধব দেব ও ভোলানাথের স্কুলে—এই তিন প্রতিষ্ঠানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ স্কুল পরিবর্ত্তনের অসুবিধা বুঝিয়া তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে হিন্দুকলেজে পড়াইতে সঙ্কল্প করিলেন।

---

* ভূদেবের দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দিনলিপির খণ্ডগুলি ভূদেবের পৌত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের সভাপতি শ্রীযুত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩ বৎসর বয়সে ভূদেব হিন্দুকলেজ জুনিয়র স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। হিন্দুকলেজ তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই দুই ভাগে তখন সর্ব্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল। জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল। ৭ম শ্রেণীতে ভূদেব মধুসূদন দত্তকে সহাধ্যায়ি-রূপে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।—যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', পরিশিষ্ট।

জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভূদেব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র-বৃত্তি, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। ভূদেব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮৲ টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। ভূদেব এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী মধুসূদন দত্ত ও শ্যামাচরণ লাহা, বৃত্তি লাভ করিয়া, ৫ম শ্রেণী হইতে পর বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণানুসারে তাহাদের

দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন দত্ত এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বর্দ্ধমান-রাজ-বৃত্তি ৪০৲ টাকা লাভ করেন* এবং পর-বৎসর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। প্রতি বৎসর এই বৃত্তি ভোগ করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিলেন। হিন্দুকলেজে সর্ব্বসমেত ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

> Certificates of proficiency, according to the rules, have to be granted to the undermentioned pupils (scholarship holders) who left the College during the year 1845........
>
> 3. Rajnarain Bose, senior scholarship holder, unemployed.
>
> 4. Bhoodeb Mookerjee, ditto ditto ditto

ভূদেব হিন্দুকলেজ হইতে যে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO COLLEGE.

These are to certify that Bhoodeb Mookerjea has studied in this College for a period of 6 years and 5 months, that at the time

* General Report on Public Instruction...for 1842-43, p. lxxiv.

of quitting College he was in the first class, that he has made very great progress in General Literature and acquired creditable proficiency in the English Language and Literature, and in the Elements of General knowledge and that his conduct has been quite satisfactoty. At the time of leaving college he held a Senior Scholarship of the first grade.

Calcutta, 13th February 1846	J. Kerr	*Principal*
	G. Lewis	*Head Master*

ছাত্র-জীবনের কথা ভূদেব তাঁহার দিনলিপিতে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80. Thursday.

....

When 9 years old I was sent to the Sanscrit College where I staid for about *two years* reading up to the Sahitya class. Then I staid for less than one year in each at the Indian Academy, at Nabin Madhab's schools and at Bholanath's altogether two years. This corresponds with the recollection I have of being **13** when I entered the Hindoo College. At the College I was one year with Ramchandra's class, one year Jones', one year in Halford's, one year in the second class and a little more than two years in the first class, altogether between six and seven years.

বিবাহ

হিন্দুকলেজের সিনিয়র-বিভাগে অধ্যয়নকালে ভূদেবের বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬। তিনি দিনলিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80, Thursday,

... ...

I was married to *Elokeshi* when I wrs 16 and she 11. We had our first boy Mahendra born to us when I was between 20 and 21.

চাকুরী-জীবন

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়

মিশনরীরা নানা স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন ; অনেক হিন্দু বালক খ্রীষ্টান হইতেছিল। ইহার প্রতীকারার্থ ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে* প্রধানতঃ রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্ন-চেষ্টায় ট্রেজারীর খাজাঞ্চি বড়বাজার-নিবাসী রাধাকৃষ্ণ বসাকের প্রশস্ত

---

* হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের এই প্রতিষ্ঠাকাল ৫ মার্চ ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে গৃহীত। ইহাতে প্রকাশ :—

Weekly Epitome of News, March 3 :—The Hindoo Charitable Institution...happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March.

বৈঠকখানায় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন সংস্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৫৫০ জন; বালকদিগগের ইংরেজী শিক্ষার্থ পাঁচ জন শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষার্থ দুই জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। হিন্দুকলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভূদেব মাসিক ৬০৲ বেতনে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।† বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার সহিত স্বধর্ম্মশিক্ষা দানের প্রয়োজন ভূদেব অনুভব করিতেন, এই কারণে প্রধানতঃ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে সাগ্রহে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এক বৎসর পরেই তিনি এই বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

চন্দননগর সেমিনরী

অতঃপর ভূদেব আর চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া, স্বয়ং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া চন্দননগর সেমিনরী নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিলেন।

---

* 'সম্বাদ ভাস্কর', এপ্রিল ১৮৪৬।

† 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ৩য় সং, পৃ. ১০৬। ভূদেব তাঁহার দিনলিপিতেও লিখিয়া গিয়াছেন :—

1st January '80. Thursday. ... ...

I was 20 when I left college and entered service as headmaster of the Hindu Charitable. Then about two years were spent at the Hindu Charitable and the Chandernagore academy.

সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান

কিন্তু ঘটনাচক্রে শীঘ্রই ভূদেবকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে হইল। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; কন্যার বিবাহে তর্কভূষণ মহাশয়ের অর্থের অনটন পড়িল। এই সময়ে ভূদেব গোপনে ঋণ করিয়া পিতাকে ২৫০৲ টাকা দিলেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ তাঁহার জুটিয়া গেল। অতঃপর ভূদেব জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বীয় যোগ্যতাবলে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সরকারী পুস্তক হইতে আমরা তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bhudev Mookerjee. C. I. E.

2nd Master, Calcutta Madrassa ...	20 Dec.	1848
Head Master, Howrah School ...	18 Oct.	1849*
Leave ; 1 day in Nov. 1851		
5 days in Nov. 1854		
1 day in Feb. 1855		
Head Master. Hooghly Normal School ...	22 June	1856
Offg. Asst. Inspector of Schools, Central Dvn.	15 July	1862
Add. Inspector of Sonools, Hooghly ...	13 Jany.	1863
4th Class of the Bengal Educational Service	1 April	1867
Inspector of Schools, North Central Dvn. ...	13 May	1869
Medical Leave from 27 Nov. 1872 to 26 May 1873		
Inspector of Schools, North Central Dvn. ...	27 May	1873
3rd Class of the Bengal Educational Service ...	4 May	1874

* ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ. ২১৬) হাবড়ায় নিয়োগের তারিখ ২৩ আগষ্ট ১৮৪৯ দেওয়া আছে।

Inspector of Schools, Western Circle,	...	6 April 1875
Offg. in the 2nd class of the Bengal Educational Service	...	10 May 1875
Privilege leave for 2 months from 31 Jany. 1876		
Inspector of Schools, Eastern Circle, continuing to officiate as Inspector of Schools, Western Circle,	...	21 Feb. 1876
Inspector of Schools, Western Circle, Hooghly	...	2 May 1876
Inspector of Schools, Behar Circle,	...	15 Nov. 1876
Offg. in the 1st Class of the Bengal Educational Service	...	21 March 1877
Inspector of Schools, Western Circle, continuing in temporary charge of the Behar Circle	...	23 July 1877
2nd Class of the Bengal Educational Service, continuing to act in the 1st class	...	26 Jany. 1878
Temporarily in the 1st class of the Bengal Educational Sirvice	...	6 Dec. 1879
Privilege leave for 3 months, from 25 Octr, 1880		
Member of the Lt. Governor's Council	...	25 Jany. 1882*

অরসর গ্রহণ :—২৩ জুলাই ১৮৮৩।

ভূদেব বিদ্যালয়-পরিদর্শন কার্য্যে দীর্ঘকাল লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে শিক্ষা-বিষয়ক বহু চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লিখিতে হইত। রিপোর্ট লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক বহু রিপোর্টের তিনি রচয়িতা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখে ভারত-সরকার সার্ উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে কুড়ি জন সদস্যকে লইয়া একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। ভূদেব এই কমিশনের সদস্য

* History of Services of Gazetted Officers employed under the Government of Bengal. (Jany. 1883), pp. 155-56.

ছিলেন। কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আবার প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হয়। ভূদেব বঙ্গদেশের কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কমিটির পক্ষে মূল কমিশনে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তাহারও রচয়িতা ছিলেন ভূদেব। ৩০ নবেম্বর ১৮৮২ তারিখে তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে যে পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে হাণ্টারের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উক্ত বিষয় পরিষ্কার জানা যাইতেছে :—

হণ্টার। হাঁ। তাহা হইলে আপনার অধীনে—

আমি। পাটনা, ভাগলপুর, বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা এই কয় বিভাগ। তবে প্রত্যেক বিভাগের জন্য আমার একজন সহকারী আছেন। আমার বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না।

হণ্টার। আর ইহার ভিতর আপনি এডুকেশন কমিশনের জন্য প্রাদেশিক রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ; আমি শুনিয়াছি—ইহা প্রথম শ্রেণীর লেখা দাঁড়াইয়াছে।

আমি। কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আপনি বোধ হয় তাহা দেখেন নাই।

হণ্টার। না। উহা কি শেষ হইয়াছে ? কত বড় ?

আমি। কতকগুলি অংশ এডুকেশন কমিটির অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে ; সমস্তটা এখনও হয় নাই। পরিশিষ্ট হইয়া ১৫০।১৬০ পৃষ্ঠা হইবে। ('ভূদেব চরিত', ২য় ভাগ, পৃ. ৩০৫)

সাময়িক-পত্র পরিচালন

ভূদেব শিক্ষা-বিষয়ক দুইখানি বাংলা সাময়িক-পত্র দীর্ঘকাল পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি।

'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার'

১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ভূদেব 'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা হুগলী বুদোধয় যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত নিম্নোংশ পাঠ করিলে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ।

বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদিত হওয়ার, এবং কে২ ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে

যাহাতে এমত এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ;—নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটী টাকা লোকসান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী !

* * *

...পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে ; সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে২ প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্ম্মণ দেশীয় এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য ; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

'শিক্ষা দর্পণে'র অধিকাংশ রচনাই ভূদেবের লেখনী-প্রসূত। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের লিখিত বাল্মীকি রামায়ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা ও তাঁহার নিজের লিখিত বাংলার ইতিহাসের কতক অংশ ইহাতেই প্রথম

প্রকাশিত হয়। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা 'শিক্ষা দর্পণ' হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইংরাজদিগের প্রাধান্যের হেতু বিদ্যাও নয়, বুদ্ধিও নয়, ধর্ম্মশীলতাও নয়—ইহাদের প্রাধান্যের হেতু এই যে, উহারা ভাঙ্গা মানুষ নহে—উহারা সকলেই গোটা মানুষ…। উহারা মেষের পাল নহে। উহারা আপনাপন বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া চলে; তাহাতে বুদ্ধি ও ক্ষমতারও বৃদ্ধি হয়। ঠেক দেওয়া গাছ অল্প বাতাসেই পড়িয়া যায়—যে গাছ আপনার শিকড়ের জোরে বৃদ্ধি পায় সে ঝড়েও পড়ে না। (আষাঢ়, ১২৭১)

আমরা এই দেশের লোক, ইহার জল বাতাস, ইহার ভূমি-প্রসূত দ্রব্যাদি, ইহার রৌদ্রের তাপ প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে, কিছুই আমাদিগের পক্ষে হানিকর হইতে পারে না। জননী যদি পীড়িতা না হয়েন তবে তাঁহার স্তন্যই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনোপায়। বাঙ্গালীর পক্ষেও বঙ্গভূমি সেইরূপ।…আমরা চেষ্টা করিলে আপনাদিগের অবস্থা দিন দিন ভাল করিয়া লইতে পারি। (শ্রাবণ, ১২৭১)

দেশে বড় মানুষ লোক থাকা ভাল বটে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত বড় মানুষ হইলেই দেশের মঙ্গল হয়, নচেৎ তাহাদিগের দ্বারা অপকার বই উপকার হয় না। (মাঘ, ১২৭১)

সাহায্য দানের প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এইটি স্মরণ করিয়া কার্য্য করা উচিত যে, যে ব্যক্তি কাহার সহায় হয়, সে স্বয়ং প্রবলতর হইলেও প্রধান হয় না; সে যাহার সহায়তা করিতে যায় সেই প্রধান এবং সে স্বয়ং গৌণ হইয়া থাকে। আমরা বোধ করি যে, সাহায্য প্রদত্ত স্কুলসমূহে তাহা হয় না। যাহাদিগের

স্কুল তাহারা অপ্রধান এবং যাহারা সাহায্য দেয় তাহারাই প্রধান হইয়া উঠে। অর্থাৎ স্কুলের মেনেজরেরা ফাল্‌তু হইয়া পড়েন এবং ইনিস্পেক্টরেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন! এই ব্যাপারটী আমাদিগের মনে বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না। (ফাল্গুন, ১২৭১)

ভাষা-ভেদই জাতিভেদের অসাধারণ লক্ষণ। যে সকল লোকের মাতৃজাতীয় ভাষা এক প্রকার—কাহাকেও বহি পড়িয়া শিখিতে হয় না—সকলেই সাধারণতঃ পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে, তাহারাই এক জাতি।...জাতি থাকায় তেজস্বিতা, স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি যে সমস্ত শুভ ফল দর্শে, তাহা আমাদিগের মাতৃভাষার উন্নতি সহকারেই দর্শিতে পারে। মাতৃভাষার উন্নতি বিরহে আর যে প্রকারে যাহার উৎকর্ষ হউক না কেন, তাহা ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত হইবে—উহা কদাপি জাতিগত হইবে না। (ফাল্গুন, ১২৭২)

যেমন গ্রীকেরাও কখন আপনাদিগের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করে নাই—রোমীয়েরাও যেরূপ করে নাই এবং ইংরাজেরাও যাহা করেন নাই এবং করিতে ইচ্ছুক নহেন—আমাদিগেরও সেইরূপ করিয়া চলা উচিত। সাহেবদিগের স্থানে শিক্ষালাভ করায় কোন হানি নাই—অনেক উপকারই আছে—কিন্তু সাহেবী বহি পড়িয়া একেবারে সাহেব হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপর, নীচাশয়, আত্মগৌরব-বিহীন ব্যক্তির কার্য্য। (চৈত্র, ১২৭৩)

এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনুচিকীর্ষার যে প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে, তাহারও একটী হেতু ঐ স্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা। আমরা অন্য জাতীয় লোকের বিষয়ে যাহা দেখি, শুনি, বা অধ্যয়ন করি, অবিকল তাহারই অনুকরণ করিতে ধাবমান হই, আমাদিগের

জাতীয় প্রকৃতি, দেশের অবস্থা, এবং বর্ত্তমান সামাজিক প্রণালী কিরূপ, তাহা সবিশেষ জানা থাকিলে কদাপি ঐরূপ কাপুরুষের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।···দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সকল নিয়মেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। 'কৃতবিদ্যেরা' যে সকল নিয়ম শিক্ষা করেন তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইবেন এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েন না। (ভাদ্র, ১২৭৪)

গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির উপায় না দেখিয়া ব্যয় লাঘব করিবার পথ দেখুন। সৈন্যসংখ্যা কিছু কম করুন—পব্‌লিক ওয়ার্কের প্রধান কার্য্য যে সৈনিক বারিক একবার প্রস্তুত করিয়া আবার ভাঙ্গিয়া ফেলা, আবার গড়া, তাহার প্রতিবিধান করুন—রাস্তাসকল মাটীতে ইটে কি রৌপ্যে নির্ম্মিত হয় তাহা দেখুন—বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের বেতন কিঞ্চিন্ন্যূন করুন—দরবারী এবং বারবরদারী খরচ যাহাতে কিছু কম হয় তাহার উপায় করুন, বিলাতের ব্যয় এবং এতদ্দেশীয় অকর্ম্মণ্য নবাব স্থবার পেনস্যন্ কমাইয়া দিউন—এ দেশীয় যোগ্য লোক দেখিয়া উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করুন—তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতন দিউন—এই সকল উপায় করিলে আয় ব্যয় সমান হইয়া দাঁড়াইবে—কিছু উদ্বৃত্তই বা থাকে। (কার্ত্তিক, ১২৭৪)

কর একবার বসিলে কি আর উঠে? দেখ, আয়-কর উঠিয়াছিল—কিন্তু যায় নাই—আবার বসিল। (অগ্রহায়ণ, ১২৭৪)

সংস্কৃত আমাদের প্রাচীন অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় মূল ভাষা···

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সহৃদয় হিন্দু মাত্রেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং এই নিয়মের প্রবর্ত্তকদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।···ফার্ষ্ট আর্টস ও বি. এ. পরীক্ষায়

কেবল একটু সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ থাকিলেই যে বাঙ্গালার চর্চ্চা রাখা হইল এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ছাত্রদিগের যাহাতে বাঙ্গালার প্রতি যত্ন করিতে হয় এবং পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালার ২।৪ খান ভাল বহি পড়িতে হয় এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।
(ফাল্গুন, ১২৭৪)

১২৭৭ সালের পৌষ-সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শিক্ষা দর্পণে'র নামকরণ হয়— 'শিক্ষা দর্পণ ও মাসিক পত্রিকা'। ইহা ৫ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ'

একবার একখানি বাংলা সংবাদপত্রে গবর্মেণ্টের কোন কার্য্য সম্বন্ধে অযথা মন্তব্য প্রকাশিত হইলে শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইনস্পেক্টর হজ্‌সন্‌ প্র্যাটের সহিত ভূদেবের আলোচনা হয়। ভূদেব জানাইয়াছিলেন, দেশীয়গণকে—বিশেষতঃ মফস্বলবাসিগণকে গবর্মেণ্টের নীতি বুঝাইয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্টের উচিত একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করা। ভূদেবের এই প্রস্তাব সমীচীন বোধ হওয়ায় প্র্যাট বিষয়টি কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। ইহারই ফলে ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিখ হইতে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়। প্র্যাট ভূদেবের উপরই পত্রিকা-পরিচালনের ভার দিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট এ-দেশীয় কাহারও উপর সম্পাদকীয় ভার দিতে সম্মত না হওয়ায় লণ্ডন মিশনের ডবলিউ. ও'ব্রায়েন স্মিথ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কবি রঙ্গলাল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত 'এডুকেশন গেজেট' পরিচালন করিয়া স্মিথ স্বদেশ গমন করিলে, কানাইলাল পাইন ও ব্রজমোহন মল্লিক অল্প দিনের জন্য উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন।* অতঃপর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার মাসিক ৩০০৲ বেতনে 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক হন। তিনি প্রায় আড়াই বৎসর দক্ষতার সহিত পত্রিকা পরিচালন করিয়া ৩১ জুলাই ১৮৬৮ তারিখে পদত্যাগ করেন প্যারীচরণের স্থলে ভূদেব 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কি সর্ত্তে তিনি পত্রিকা-পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, 'ভূদেব চরিত' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ডিরেক্টর সাহেব ছোটলাটের কথা জানাইলে ভূদেব বাবু বলিলেন, "লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের কথা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু জিনিসটী আমাকে 'অগ্নি-সংস্কার' করিয়া দিবেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার যে পাত উচ্ছিষ্ট করিয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিলেন, তাহা 'ষ্টিক' সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লই না ; আমাকে দিতে হইলে উহার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন করিয়া এডুকেশন গেজেটের 'সম্পূর্ণ স্বত্ব' দিতে এবং 'সম্পাদকের বেতন' বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে মাসিক তিন শত টাকা দিতেছেন, অতঃপর তাহা গ্রাণ্ট-ইন-এড (সাহায্য) স্বরূপে দিতে হইবে। এইরূপে 'সম্পূর্ণ সংস্কার' হইলে আমার উহা লইতে আপত্তি থাকিবে না।

আটকিন্সন সাহেব এই সকল কথা ছোটলাট বাহাদুর গ্রে সাহেবের গোচর করায় তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন ;…ভূদেব বাবুকে পূর্ব্বের স্থিরীকৃত সর্ত্তানুযায়ী এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ৫৮-৬০।

স্বত্ব প্রদান করিয়া উহার চার্জ্জ (কার্য্যভার) বুঝিয়া লইবার আদেশ প্রচার করিলেন; এবং পরে কোন গোল সহজে না উঠে এজন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।*

কোন দেশের কোন সম্বাদ পত্রেরই গবর্ণমেণ্টের উপর 'অমূলক দুরভিসন্ধির' আরোপ করিবার অধিকার নাই। তাহা ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের পরিচালনাতে ভূদেব বাবুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল।

অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম্ম এবং ন্যায় পথে শাস্ত্রানুগামী হইয়া অটল থাকেন; সাধারণ মাঝারি লোকেরা লোক লজ্জার দ্বারা সুপথে রক্ষিত হয়েন; অপকৃষ্টদিগের জন্য দণ্ডের প্রয়োজন। যদি জনসাধারণে কোন সরকারী সংসৃষ্ট সংবাদপত্রে তাহাদের অভাব ও অভিযোগের আলোচনা করিতে পায়—এবং সেই কাগজে বা অন্য কাগজে প্রকাশিত আলোচনায় সরকারী কর্ম্মচারী-গণের কার্য্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সেই কাগজ দিয়াই সাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা দাঁড়ায়; বিরুদ্ধভাবে স্থায়ী হইতে পারে না এবং রাজকার্য্য পরিচালনায় হঠকারিতা ঘটার সম্ভাবনা কমিয়া যায়. লোকলজ্জার খাতিরে সাধারণ রাজকর্ম্মচারীরাও উত্তমরূপে কার্য্য করিতে থাকেন।"—ভূদেব বাবু এই কথাগুলি সহৃদয় ছোটলাট গ্রে সাহেবকে সরলভাবে

* "পেডলার সাহেব ডিরেক্টর হইলে মাসিক সাহায্য ১লা এপ্রিল ১৮৯৯ হইতে কমাইয়া ২০০৲ টাকা করা হয়।...এডুকেশন গেজেটের সাহায্য ১লা এপ্রিল ১৯১২ হইতে বন্ধ করা হয়।" ('ভূদেব চরিত,' ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩৮)

জানাইলে সকল জেলার এবং মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক খণ্ড করিয়া এডুকেশন গেজেট গ্রহণ করার পৃথক হুকুম জারি হইল ; যে সকল সম্বাদ এবং সরকারী কাগজ এবং রিপোর্ট ইংরাজী কাগজের সম্পাদকেরা পাইতেন সেগুলি সমস্তই এডুকেশন গেজেটকে দেওয়া হইতে লাগিল ; 'অমূলক সম্বাদের প্রতিবাদ পাঠাইলে সযত্নে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইবে' ইহাও সকল সরকারী কর্ম্মচারীকে জানান হইল। (১ম ভাগ, পৃ. ৩৩৯-৪১)

ভূদেবের সম্পাদনায় 'এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। তিনি ১ম সংখ্যায় লেখেন :—

"কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই, কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে—কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্র-ভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব—অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে'।"

'এডুকেশন গেজেট' সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ 'ভূদেব চরিত' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্মিথ সাহেবের এবং প্যারীচরণ বাবুর সময়ে এডুকেশন গেজেটের বর্ষ গণনা ইংরাজী হিসাবে হইত। ভূদেব বাবুর হস্তে আসার পর প্রথম বৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে "নূতন সন্দর্ভ—১মখণ্ড—১ম সংখ্যা" অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষ গণনার মধ্যে আনিয়া দিলেন। 'এডুকেশন গেজেট সর্ব্ব প্রকার শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্বাদ পত্র এবং মাসিক পত্র, এবং ত্রৈমাসিক পত্রেরও কাজ, কতকটা করিবে'—তাঁহার এইরূপ

অভিপ্রায় ছিল। ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বৈজ্ঞানিক বিবরণ' সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লিখিতেন; বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ৺পুলিনবিহারী ভাদুড়ি 'বাণিজ্য বার্ত্তা' এবং ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী (উকীল) 'হাইকোর্টের নজীর' লিখিয়া পাঠাইতেন। ভূদেব বাবুর হাওড়া স্কুলের ছাত্র ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার) হুগলী থাকা কালে ইহাতে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কবিতাবলী—ভারত বিলাপ এবং ভারত সঙ্গীত প্রভৃতি; ৺দীনবন্ধু মিত্রের, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এবং ৺নবীনচন্দ্র সেনের (অবকাশরঞ্জিনীর) কবিতা এবং ছোয়ান পক্ষীর (৺শিবদাস ভট্টাচার্য্যের) বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও সমালোচনা এই সময় হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অচিরেই এডুকেশন গেজেট সে সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। ভূদেব বাবু নিজেও এডুকেশন গেজেটে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। এডুকেশন গেজেটেই তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারত-বর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের শেষাংশ এবং বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। (প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৪৩-৪৪)

গ্রন্থাবলী

ভূদেবের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব**। জুন ১৮৫৬। পৃ. ৯১।

"এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষক বর্গের কর্ত্তব্যতা তথা কি প্রকার শিক্ষা এইক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক-দিগের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে, বালক শ্রেণী সকলকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার উপযোগী কতিপয় নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই নিয়ম সকলের সুখাববোধার্থে কএকটী উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকের সর্ব্ব শেষ অংশে, পরিবার মধ্যে সন্তান বর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্যক তাহার স্থূল স্থূল কিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে।" —বিজ্ঞাপন।

২। **ঐতিহাসিক উপন্যাস**। ১৭৭৯ শক, ইং ১৮৫৭ (?)। পৃ. ১১৮

Historical Tales / in Bengali / By / Bhoodeb Mookerjea / ঐতিহাসিক উপন্যাস। / শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির / মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত / শকাব্দাঃ ১৭৭৯। /

"ইংরেজীতে 'রোমান্‌স্ অব হিষ্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফলস্বপ্ন' নামক উপন্যাসটী প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তকে ভূদেব লিখিয়াছেন :— "প্রায় বিংষতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী

আখ্যায়িকা বাংলাভাষায় লিখিয়াছিলাম।" এই উক্তি হইতে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দই সূচিত হয়।

৩। **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান**। ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৮ (?)
২য় ভাগ। ইং ১৮৫৯।*

৪। **পুরাবৃত্ত সার**। (প্রাচীন কালের বিবরণ) প্রথম খণ্ড। ইং ১৮৫৮। পৃ. ১৪৮।

"বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে২ সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ২ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে এই 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদ নিবাসী কতিপয় প্রধান২ প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল২ পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্য সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনশীল ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যায়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য।"— বিজ্ঞাপন।

ইহার ২য় ও ৫ম সংস্করণে যথাক্রমে গ্রীক জাতির বিবরণ ও রোমক জাতির বিবরণ সংযুক্ত হয়। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

---

* ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ২য় ভাগ। (যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ)" নামে প্রকাশিত হয়। ১৭ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' এই "অভিনব পুস্তক প্রকাশ"-এর সংবাদ আছে।

৫। **ইংলণ্ডের ইতিহাস**। ১৫ আগস্ট, ১৮৬২। পৃ. ২২০।

"এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে যে অনেকাংশেই উভয় জাতির সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি, হ্রাস, গৌরব ও অপমান একই কারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়েরই গুণদোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিবৃত্ত দ্বারা যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে আর কোন উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় ইতিহাস পাঠ দ্বারা সে রাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে তৎসংক্রান্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে,...এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের রাজকার্য্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান২ ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে।"

৬। **ক্ষেত্র তত্ত্ব**। ইং ১৮৬২। পৃ. ১৮৮।

"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিক্রমে তাঁহার অনুবাদিত উক্লিডের গ্রন্থকে প্রধান অবলম্বন স্বরূপ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইল।"—বিজ্ঞাপন

ইহা "উক্লিডের প্রথম তিন অধ্যায়। টীকা এবং অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সমেত।"

৭। **রোমের ইতিহাস**। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১২৭।

৮। **পুষ্পাঞ্জলি**। প্রথম ভাগ। ইং ১৮৭৬ (২০ জুন)। পৃ. ১৫১।

ইহা "কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য কথন।"

"প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী আখ্যায়িকা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে ; অতিশয়োক্তি এবং রূপকালঙ্কারেরও আধিক্য হয়।"—গ্রন্থের আভাস।

৯। **পারিবারিক প্রবন্ধ।** ১২৮৮ সাল (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮২)।

পৃ. ১৩১।

বিষয়-সূচী ঃ—বাল্য বিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়, উদ্বাহ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, গহনা গড়ান, গৃহিণী-পনা, সতীর ধর্ম্ম, সৌভাগ্য গর্ব্ব, দম্পতী-কলহ, চাকর প্রতিপালন, পরিচ্ছন্নতা, কৃত্রিম-স্বজনতা, কুটুম্বতা, জাতিত্ব, অতিথি-সেবা, পশ্বাদি পালন, পিতামহ ঠাকুর, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, জেঁয়াচ্, নিরপত্যতা, গৃহ-শূন্যতা, দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ, বহু বিবাহ, ধর্ম্ম চর্চ্চা, সন্তান পালন, শিক্ষাভিত্তি, সন্তানের শিক্ষা, চির-কৌমার।

১০। **সামাজিক প্রবন্ধ।** ১২৯৯ সাল (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯২)।

পৃ. ৩১৯।

"এই সামাজিক প্রবন্ধগুলি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয়

অধ্যায়ে ইউরোপ প্রচলিত সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির প্রকৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরাজ আগমনের পরবর্ত্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃত্যনুযায়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবশ্যই বোধ হইবে যে, একখানি সর্ব্বদেশ সাধারণ সমাজ-তত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্ত্তব্য সূত্র অনির্দ্দিষ্ট, এবং কার্য্যকলাপ অব্যবস্থিত, হইয়া পড়িতেছে।

এই জন্য, ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব্ব শান্তি-সুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য অবধারণ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি জ্ঞান করিব।”
—গ্রন্থের আভাস।

১১। **আচার প্রবন্ধ।** ১৩০১ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ২৩৪।

ভূদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই পুস্তকের মুদ্রণ শেষ হয়।

১২। **বিবিধ প্রবন্ধ।** প্রথম ভাগ। ১৩০২ সাল (১ জুন ১৮৯৫)। পৃ. ১৩৯।

"উত্তর চরিত, রত্নবলী এবং মৃচ্ছকটিকের সমালোচন।" "এই প্রবন্ধগুলি এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৩। **স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।** ১৩০২ সাল (৫ অক্টোবর ১৮৯৫)। পৃ. ৬২।

ইহা "এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কার্ত্তিক হইতে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হয়।" "ভূমিকা"য় প্রকাশঃ—

"আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যে দিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আনুপূর্ব্বিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখাই হইবে, কখন বোধহয়

আমার না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যো নাই। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। আমার ওরূপ হয় না, এ সময়েও হয় নাই। কিন্তু যেমন ঘুমাইয়াও জাগা যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে পারে। যাহা হউক, শাস্ত্রে বলে—স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তি-কার্য্য করাই উচিত বোধে এই "স্বপ্নলব্ধ ভারত ইতিহাস" এডুকেশন গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম। গ্রন্থ প্রচারক।"

১৪। **বাঙ্গালার ইতিহাস**। তৃতীয় ভাগ। ১৩১০ সাল (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ১৫৬।

"'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্ত, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন বিরচিত। উহার দ্বিতীয় ভাগ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। তাহাতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তিকালের ইতিহাস যাহা পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে শিক্ষাদর্পণে লিখিতে আরম্ভ করেন ও যাহার কিয়দংশ এক সময় এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়ায় বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ নাম দেওয়া গেল। গ্রন্থকার যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং ছোটলাট বীডন সাহেবের পরবর্ত্তিকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়।"—বিজ্ঞাপন।

১৫। **বিবিধ প্রবন্ধ**। দ্বিতীয় ভাগ। ফাল্গুন ১৩১১ (১৩ এপ্রিল ১৯০৫)। পৃ. ২০৫।

"এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষা দর্পণে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক সমালোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। পুরাবৃত্তসারে প্রথমাংশ সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্বে সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের মিল আছে বটে কিন্তু কোন কোন বিষয় একটু বিশদভাবেও বর্ণিত থাকায় সে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা এক সময়ে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল।"—গ্রন্থের আভাস।

দিনলিপি

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ডিসেম্বর হইতে ইংরেজীতে লিখিত ভূদেবের দিনলিপি বর্ত্তমান আছে। ইহা মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার কতক অংশের বঙ্গানুবাদ 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থের ২য়-৩য় ভাগে প্রদত্ত

হইয়াছে। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ মে তারিখে দিনলিপিতে লিখিয়াছেন :—

The Murshidabad Patrika having published a report of my death Ramgati wrote enquire in reply, sent him two songs in Bengali.

পরবর্ত্তী ২৮-৩০ তারিখের দিনলিপিতে গান দুইটি আছে; উহা এইরূপ :—

১

রটেছে কাগজে মোর মরণ হয়েছে।
ভেবে দেখি মনে মনে কে কি ভাবিছে
বন্ধুগণ দুখে রত, স্মরি পূর্ব্ব কথা যত
ঘণ্টা বা দিনৈক তরে শোকে ভাসিতেছে
আলাপী সুবহু লোক দেখাইছে কিছু শোক
দোষগুণে ছিল ভাল কেহ কেহ বলিছে
চাকুরে দু চারি জন পাইবারে প্রমোসন নহে বহু হর্ষ মন,
কে আর বলিবে পন্থা মনে মনে স্মরিছে
প্রোমোসন পাইবার কিবা পন্থা ঠাহরিছে।

২

রটেছে মরণ বার্ত্তা ভেবে দেখ্ আজ রে।
সংসারে আসিয়া তুই করিলি কি কাজ রে
সেবেছিস্ গুরুজনে তুষেছিস্ প্রিয়জনে
পেলেছিস্ পোষ্যগণে কেমন বিধানে রে
ভারতে জনম লভি তার তরে দুখ ভাবি
করেছিস্ কিবা কাজ মনে মনে গণ রে।

জনম ভূমির ধার যতন তা স্থধিবার
কি করিলি কায় মন বাক্যে তাহা বল রে।

বিহারে হিন্দী শিক্ষার প্রসার

কেবলমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পেই ভূদেব আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন নহে,—হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্মও তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিহারে দীর্ঘকাল স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। এই অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি নানা স্থানে বহু আদর্শ হিন্দী বিত্মালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দী বিত্মালয়ের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। হিন্দী পুস্তকাদি প্রণয়ন-ব্যাপারেও ভূদেববাবুর কৃতিত্ব কম নহে। তিনি ইংরেজী পুস্তকের পরিবর্ত্তে অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে বিহারের আদালতসমূহে ফার্সীর পরিবর্ত্তে হিন্দী প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ (?) তারিখে ভূদেববাবু তদীয় বন্ধু পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নকে বাঁকীপুর হইতে লিখিয়াছিলেন :—

"এ প্রদেশ হইতে ফরাসী দপ্তর উঠিয়া যাইবার আদেশ হওয়ায় মুসলমান এবং মুসলমন সদৃশ হিন্দুরাও অনেক গোলমাল করিতেছে। আমার প্রতিই অনেকে দোষারোপ করিতেছে এবং যাহারা ফারসীর পক্ষ নহে তাহারা আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ দেখাইতেছে। বাস্তবিক ঐ কাজটিতে আমার হাত কত দূর আছে তাহা আমি নিজেই বলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি কিছু থাকে তবে যে তাহা আত্মপ্রসাদের একটি কারণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ফারসী উঠিয়া যায় এরূপ চেষ্টা আমি বিহারে আসিয়া অবধিই করিয়াছি। জাতীয় ভাষার (হিন্দীর) বিদ্যালয়গুলি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে সম্যক্ অনাদৃত ছিল। আমি সেগুলির আদর করিয়াছি এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসায় বিদ্যালয় সংখ্যা ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমার পূর্ব্বে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর চালাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধরণের মনোমত হয় নাই। নাগরী কায়েথী অক্ষরের প্রচলন হয় এ কথা আমিই বলিয়াছিলাম, ও সে জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। ১৮৩৯ ইংরাজী অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যায়। সেই অবধি বাঙ্গালার উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। সেই অবধি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। হিন্দী হওয়াতে বিহারে কি সেইরূপ হইবে না? আমার আশা এইরূপ যে বাঙ্গালায় যাহা ৪০ বৎসরে হইয়াছে বিহারে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে সেইরূপ উন্নতি দেখা দিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কর্ম্মগুলির মধ্যে এই কর্ম্মটির সংশ্রব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ ভাব নিতান্ত স্থূল দর্শনের ফল। প্রকৃত দৃষ্টিতে "আমি" কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্য সমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইগুলি কাল সহকারে এই দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় আমি সেই দিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব, ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"—'ভূদেব চরিত', ২য় ভাগ, পৃ. ১৩২-৩৩।

ভূদেববাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিহারবাসীরা সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল :—

পূরবী গীত

(১) ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। পরজা সুখদায়ী।
জামনীকে দূর করী। নাগরী চলাই ॥ ১
"ভুবন দেব" করি পুকার। লাট নিকট জাই।
পরজা দুঃখ দূর করহ। জামনী দুরাই ॥ ২
নানা বিধি জাল হোত। জামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥ ৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দুই চলাই ॥ ৪
পরজা নিত সুযশ গাব। অম্বিকা মনাই।
জবলেঁ চন্দ্র সূর্য্য রহে। রাজ রহে মাই ॥ ৫

ভাবার্থ—

(যবন ভাষা) পারসীর পরিবর্ত্তে কাছারীতে নাগরী অক্ষর চালাইবার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাসূচক সঙ্গীত।

গবর্ণমেণ্ট যাবনিক ভাষা (পারসী) উঠাইয়া নাগরী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইলেন। প্রজারা ইহাতে বড়ই সুখবোধ করিল। ১। ভূদেব বাবু লাট বাহাদুরের কাছে যাইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "পারসীর ব্যবহার উঠাইয়া প্রজাদের দুঃখ দূর করিয়া দিন। ২। হে রাজপুরুষ! পারসীর চলন থাকায় অনেক কাগজ পত্র জাল হইতে পায়। উহার পরিবর্ত্তে প্রজারা যদি তাহাদের জাতীয় ভাষার চলন দেখিতে পায়, তাহা হইলে বড়ই আনন্দানুভব করিবে"। ৩। ধন্য তাঁহার বুদ্ধি, ধন্য বিচার, ধন্য অন্তর, যে পরামর্শ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ন্যায়বিচার করিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দী চালাইলেন, সেই পরামর্শ ধন্য। ৪। প্রজারা নিত্য সুযশ

গান করিতেছে—(পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস) অম্বিকা মানত করিতেছেন—যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে তত দিন পর্য্যন্ত মাতার (ভিক্টোরিয়ার) রাজ্য থাকুক। ৫।

(২) হুকুম সরকারী ভইল।

রে নর শিখো নাগরিয়া ॥ ধূয়া ॥
জামন জী সে দেহু হুরাই
পঢ়ি গুণ কাজ কর নর হরিয়া ॥ ১
লে পোথী নিত পাঠ করহ অব।
জামন জী গ্রন্থ দেহু পৈসরিয়া ॥ ২
জবলে নাগরী আবত নাহিঁ।
কৈথী অচ্ছর লিখ কচ্ হরিয়া ॥ ৩
ধন্য "মন্ত্রী" প্রজা হিতকারী
অম্বিকা মনাবত রাজ ভিক্টোরিয়া ॥ ৪

ভাবার্থ—সরকার হুকুম দিয়াছেন, হে নরগণ, তোমরা নাগরী শিখ।

মন হইতে পারসী সরাইয়া দেও। পড়াশুনা কর এবং ঈশ্বরের তুষ্টিকর ধর্ম্ম কার্য্য কর। ১

পুঁথি লইয়া নিরন্তর পাঠ করিতে থাক। পারসী বই সমস্ত মসলা-বিক্রেতার দোকানে বেচিয়া ফেল ২

নাগরী যত দিন না ভাল করিয়া লিখিতে পার, তত দিন কাছারীতে কায়েথী অক্ষর লিখ। ৩

সেই প্রজাহিতকারী ব্যক্তি, যিনি গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ মন্ত্রণা দিয়াছেন, তিনি ধন্য। অম্বিকার আশীর্ব্বাদে মহারাণীর রাজ্য থাকুক। ৪—ভূদেব চরিত,' ২য় ভাগ, পৃ. ১৩০-৩১।

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দী ভাষা

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে হিন্দী ভাষার চর্চা একান্ত প্রয়োজন—ভূদেব এই মত পোষণ করিতেন। তিনি বিভিন্ন রচনার মধ্যে এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।—

(১) বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।—'সামাজিক প্রবন্ধ,' পৃ. ২২৫।

(২) স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়।···আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব সুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভাল। বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে ত ইংরাজী না চলাই উচিত। পত্রাদি লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসী-দিগের মধ্যে

পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারত-সমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি অল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।—'সামাজিক প্রবন্ধ,' পৃ. ২৮৫।

(৩) একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থান ভেদ জনিত বিবাহ প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সংকীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতি মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বন্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।—'সামাজিক প্রবন্ধ,' পৃ. ২৩৬।

দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ভূদেব কিছু দিন কাশীতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি পরমহংসাচার্য্য ভাস্করানন্দ স্বামীর পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। স্বামীজীও তাঁহাকে ভালবাসিয়া "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আনন্দবাগে স্বামীজীর যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহার নিম্নে খোদিত সংস্কৃত শ্লোকটি ভূদেবের রচিত। শ্লোকটি এইরূপ :—

> জাতো ব্রহ্মকুলে স্বতো হি পবিতঃ পূতঃ পুনর্বিদ্যয়া,
> জ্ঞানেন জলিতস্তপোভিরুদিতো ব্রাহ্মং মহো মূর্ত্তিমৎ।

ভিত্ত্বা সন্তমসং প্রবোধ্য জগতীমানন্দয়ন্ প্রাণিনো
জ্ঞানপ্রেমময়োঽর্কচন্দ্রমিলিতঃ শ্রীভাস্করানন্দকঃ ॥

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভূদেব কাশী হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়াছিলেন। পর-বৎসর (ইং ১৮৮৯) ১৭ই এপ্রিল চুঁচুড়া বড়বাজারের বসতবাড়ীর সংলগ্ন বাটীতে পিতার নামে একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। যাহাতে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বেদান্ত-চর্চ্চার প্রসার হয়, সেই উদ্দেশ্যেই 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' স্থাপিত হইয়াছিল। এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার জন্য তিনি কাশী হইতে পণ্ডিত হরিনাথ স্মৃতিভূষণকে আনাইয়াছিলেন। ভূদেব আরও একটি সৎকর্ম্ম করেন। তিনি পিতার নামে একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপনে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি দলিল রেজেস্টরী করেন। উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পেই প্রধানতঃ 'বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড' স্থাপিত হইয়াছিল। এই ধনভাণ্ডারের অর্থে দুইটি দাতব্য ঔষধালয়—একটি কবিরাজী ও একটি হোমিওপ্যাথিক—পরিচালিত হয়। ঔষধালয়টি তাঁহার মাতার নামানুসারে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' নামে অভিহিত; ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ তারিখে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃত্যু

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে* ভূদেব পরিবার-পরিজন-পরিবৃত অবস্থায় ভাগীরথী-তীরে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে প্রশস্তি করেন; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

* ৩য় ভাগ ভূদেব চরিতে'র ৪৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের ১৪ মে তারিখের দিনলিপি পাঠে জানা যায়, ঐ দিন রাত্রি ১টার সময়, অর্থাৎ ইংরেজী মতে ১৫ মে তারিখে ভূদেবের মৃত্যু হয়। '(সংক্ষিপ্ত) ভূদেব জীবনী'র ৩৩ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ভূদেবের মৃত্যু তারিখ "১৬ই মে" লিখিত হইয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপ, মিলনবিন্দুস্বরূপ, ভূদেব এ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদর্শী ধীর সংস্কারক, পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্ত্তব্যশরণ কর্ম্মযোগী, স্বয়ং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য, ভূদেব, স্বীয় জীবিতকাল কর্ম্মযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভূদেবের জীবিতকালে তাঁহাকে বিজয়ী সংসারী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার দেহাত্যয়ের পর দেখা দেল, ভূদেবের শাস্ত্রচর্চ্চা নিষ্ফল নহে; গীতার উপদেশে তিনি নিজ জীবনযাত্রা, সংসারপ্রণালী নিয়মিত করিয়াছিবেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষক ও শিষ্য, নিষ্কাম ভাবে চিরজীবনসঞ্চিত প্রচুর অর্থ দান করিয়া বঙ্গে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র, তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এক দিকে বিলাতী শিক্ষার নয়নান্ধকারী উজ্জ্বল চাকচিক্য, অন্য দিকে স্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ব্বাণোন্মুখ বিকৃত বহিরালোক, ভূদেব উভয়ের একটিকেও নিজের লক্ষ্য করেন নাই। বিচারকুশল প্রাচীনকালের প্রবীন আর্য্যের ন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তির সাহায্যে, উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন,—চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গড্ডলিকাপ্রবাহের

ন্যায় এক দিকে প্রধাবিত বাঙ্গালী সমাজে এ দৃশ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না,—নিজের চিন্তা ও বিচার-শক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি,—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে, তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে আন্তরিকতা বড় অল্প। কিন্তু ভূদেবে এই আন্তরিকতা বড় প্রবল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যবিলাসের উদাহরণমাত্র নহে, তাঁহার আন্তরিকতার ফল। তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজকেও সেই কর্ত্তব্যপথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কারকের আড়ম্বর ছিল না। পারিবারিক প্রবন্ধে যে হিন্দু পরিবারের চিত্র দেখিতে পাও, ভূদেব নিজের পরিবারটি তদনুরূপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের আদর্শেই তিনি সমাজের সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আচার প্রবন্ধে তিনি যাহা সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে সেই আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবন ও জীবনের কার্য্যে এমন ঐক্য, বাঙ্গালী-জীবনে দুর্লভ।

ভূদেব বাবুর সকল মত সকলের অনুমোদিত বা স্বীকার্য্য হইবে, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়া বিরত হন নাই, নিজে আজীবন স্বকীয় অভিমতকে ভিত্তি করিয়া, আত্মপরিবার গঠন করিয়াছেন, সমাজের সহিত

ব্যবহারে আসিয়াছেন, সদাচারপূত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে, ধর্ম্মচিন্তায় এবং স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলানুধ্যানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং সেই জীবন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তাহার পরিণাম, বাঙ্গালীর উত্তম আদর্শ ;—তাঁহার চরিত্র, পরার্থপর অথচ আত্মস্থ,—সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্কাম বীরের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

ভূদেব নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলাতী শিক্ষায় ও ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও, স্বদেশীয় শাস্ত্রে আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি আজীবন অধ্যাপকশ্রেণীর ভক্ত ছিলেন, —মৃত্যুকালে সেই হৃদয়ের ভক্তি কার্য্যে পরিণত বা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভূদেব যে অর্থরাশির উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" "অর্থসঞ্চয়" ও মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিজের জীবনে তাহার অনুশীলন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রায় সমুদায়—দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার, হিন্দু শাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মনে করিয়া দেখ, গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান,— চিরজীবনের কঠোরপরিশ্রমলব্ধ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত করিলেন। ভূদেব যদি আর কিছুও না করিতেন,—কেবল এক সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানে তাঁহার নাম বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবন-তত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ওপবিত্র হউক।—'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ. ১৫৪-৫৬।

ভূদেব ও বাংলা-সাহিত্য

বাঙালীর মন গীতিপ্রবণ, এই জন্য বাঙালী সৃষ্ট সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিধর্ম্মী বা কাব্যপ্রধান। বাংলা-সাহিত্যের গদ্যও ভাবুকতার সংস্পর্শে অল্পবিস্তর কাব্যায়িত; উপমা-লালিত্যে বাংলা-গদ্য বড় বেশী কোমল, বড় বেশী মধুর হইয়া উঠিয়াছে। সত্যকার গদ্যধর্ম্মী গদ্য বড় কম লেখা হইয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে গদ্যকে যুক্তির ভাষা (language of reason) বলা হয়; এই যুক্তির ভাষা বাংলা-সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বিরল। যে দুই-চারিজন সাহিত্যিক সত্যকার গদ্য লিখিয়াছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁহার গদ্য আদর্শ গদ্য।

ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক, তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে অনুসরণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রবন্ধ-সাহিত্যে যাঁহারা হাত পাকাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভূদেবেরই শিষ্যত্ব করিয়াছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এত অধিক প্রবন্ধ বাংলা-সাহিত্যে আর কেহ লেখেন নাই। এই সকলবিধ রচনার ভাষা অতিশয় স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল, অথচ সাহিত্যধর্ম্মবিবর্জ্জিত নয়। এই গদ্যই ভূদেবকে বাংলা-সাহিত্যে অমরতা দান করিবে। আমরা নিম্নে তাঁহার বহুবিষয়িণী রচনা হইতে মাত্র কয়েকটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম প্রথম উদ্ধৃতিটিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্বাভাস লক্ষণীয়।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ঃ—

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্য গুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সমুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবলবেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে

সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তি রহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকরী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ঃ—

বস্তুতঃ পরমাণুর উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। যে দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের মৃত্তিকাতে ঐ শব-শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জ শরীর পুষ্ট হয়; সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ দ্বারা যে পশু স্বীয় দেহ রক্ষা করে, তাহার শরীরেও ঐ পরমাণু প্রবিষ্ট হয়। আর সে মরিলে ঐ সকল পরমাণু অন্য নানা প্রকারে অপর প্রাণিশরীরে আসিয়া থাকে। জগতে অনুক্ষণ এইরূপই হইতেছে। পুষ্করিণীর জল শুষ্কবায়ু সংযোগে বাষ্প হইয়া বায়ুতে উঠিতেছে। কিন্তু ঐ বাষ্পই আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টি বা শিশিরের আকারে পড়িতেছে, তাহার কণামাত্র

জলেরও বিনাশ হইতেছে না—কেবল উহার স্থানান্তরতা এবং অন্যের সংযোগে রূপান্তরতা মাত্র ঘটিতেছে। আমরা যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি তাহার সহিত আমাদিগের রক্ত হইতে একটি পদার্থ নির্গত হইয়া যাইতেছে। উদ্ভিজ্জেরা সমস্ত দিবস সেই পদার্থ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, অতএব যখন আমরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগের শোণিত সম্বর্দ্ধন করিতেছি, তখন যে পরমাণুগুলি আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইতেছি।

'পুষ্পাঞ্জলি' :—

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্বদিক্ শূন্য—কোথাও কিছু নাই। পাদতলস্থ পৃথিবী নাই, আলোক নাই, শব্দ নাই। তিনি স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার শারীর স্পন্দন নিবৃত্তি হইল; চিত্তবৃত্তি স্থগিত হইল; দিক্‌জ্ঞান, কালজ্ঞান, অস্তিত্বজ্ঞান, তিরোহিত হইল; দিগ্‌গণ সঙ্কুচিত হইল; ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সম্মিলিত হইল এবং সমুদায় একীভূত অভূ হইয়া গেল!

কতক্ষণ কিরূপে ঐ ভাব ছিল, কে বলিবে? এক মুহূর্ত্তও যাহা, এক কল্প, কি শত কল্পও তাহা।—হঠাৎ পতিপরায়ণা কামিনীর কমনীয় ভুজবল্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে যায়, সেইরূপ একটি পরম জ্যোতির্ম্ময়ী বাহুলতা যেন ঐ অনন্ত অভূর আলিঙ্গনে উদ্যম করিল। আর, নিদ্রাভিভবের ভঙ্গাবস্থায় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, সেইরূপ বোধ হইল যেন, নির্ম্মল-নীলিম-নভোমণ্ডল-নিভ-শ্যামল পুরুষশরীর কোন প্রভাময়ীর ভুজবল্লী দ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছে, এবং শত শত সূর্য্যকান্তমণি, শত শত চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকতমণি, এবং শত শত

হীরক-মুক্তা-প্রবালাদির গুচ্ছ সেই অনুপম শরীরের শোভাসম্পাদন করিতেছে।

ব্যাসদেবের শরীরে স্পন্দনশক্তির পুনরাবির্ভাব হইল। একটি অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যমণির প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন মণিটি সর্ব্বক্ষণ ঝল্ ঝল্ করিয়া চতুর্দ্দিকে সুতীব্র কিরণজাল বিস্তৃত করিতেছে। তাঁহার ইহাও বোধ হইল যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ন সজ্জিত রহিয়াছে; তাহার একটি রক্তবর্ণ—একটি পীতবর্ণ—কয়েকটি শুভ্রবর্ণ—এবং একটি হরিদ্বর্ণ।

ঐ মধ্যমণিই বুঝি ভগবানের বক্ষোদেশস্থ কৌস্তুভ—ব্যাসদেব এইরূপ অনুমান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার দর্শনশক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যাহাকে সূর্য্যকান্তমণি অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা একটি অতি প্রকাণ্ড পদার্থ—অগ্নিতেজে নিরন্তর ঘর্ ঘর্ করিয়া ঘুরিতেছে এবং অতি প্রচণ্ডভাবে বিলোড়িত হইতেছে। তাহার অভ্যন্তর হইতে জলন্ত পদার্থরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া এই উঠিতেছে, এই পড়িতেছে। ঝঞ্ঝাবায়ু-বিলোড়িত সাগরবক্ষোদেশ যে সকল পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গনিচয় উৎক্ষিপ্ত করে, সে তরঙ্গমালা ঐ অগ্নিতরঙ্গের কোটিতম ভাগের এক ভাগও হইবে না; নগরদাহে যে প্রকার গগনস্পর্শিনী অনলশিখা উত্থিত হয়, তাহাও ঐ অগ্নিশিখা-সমস্তের নিকট কিছুই নহে। ব্যাসদেব ইহাও দেখিলেন যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নরাজি ঐ অগ্নিপিণ্ড-বিনির্গত স্ফুলিঙ্গমাত্র। সে সকলেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান; তাহারাও নিরন্তর বিঘূর্ণিত এবং বিলোড়িত হইতেছে। ঐ রত্নরাজিমধ্যে যেটীকে হরিদ্বর্ণ দেখিয়া ব্যাসদেবের নয়ন বিশিষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, সেইটী সর্ব্বাপেক্ষায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তাহার প্রতি তিনি বদ্ধদৃষ্টি

হইলেন—দেখিলেন, উহাতেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের প্রভাবেই উহার বাহ্য অন্তর সর্ব্বত্র স্পন্দন হইতেছে। উহার কোন ভাগ, কোথাও পর্ব্বতরূপে উত্থিত হইতেছে, কোথাও দ্রোণিরূপে নামিতেছে, কোথাও জলরূপে চলিতেছে, কোথাও বায়ুরূপে বহিতেছে, কোথাও ধাতুরূপে সংহত হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও প্রাণিরূপে চলিতেছে। ব্যাসদেব বুঝিলেন, যে ইহাই মানবজাতির অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী। তৎক্ষণাৎ 'ভূ-ভুর্বঃ স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত এবং মন্দিরমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' ঃ—

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে ; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্য-ব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্য কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায়

করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুরঘর নয়?

'সামাজিক প্রবন্ধ' :—

কর্ম্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্ত্তব্য তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করায় ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্দ্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।

কিন্তু নিষ্কামতা যদিও মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণীয় এবং শাস্ত্রসম্মত, তথাপি সকামতাই মনুষ্যের মনে অত্যন্ত প্রবল। সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে চাই না। যে কাজটি করিব, তাহা সফল হইবে কি না হইবে তাহা বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখি, এবং ভাবিয়া যদি মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কার্য্যটি সফল হইবে, তাহা হইলে তাহাতে হাত দিয়া থাকি। জাতীয় ভাব সম্বর্দ্ধনের চেষ্টায় আমরা সফল হইতে পারিব কি না, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় উপস্থিত হইয়া আছে বা হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফলপ্রয়াস হইব কি না—এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং উহার সদুত্তর প্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা বোধ হইলেও, আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবশ্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে—কিন্তু যদি উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর আনন্দ এবং উৎসাহ জন্মিবে,

সন্দেহ নাই। অতএব একবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কালক্রমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টরূপে সুবদ্ধ এবং দৃঢ়তর ও গাঢ়তর হইতে পারিবে; না উহা এখন যত দূর আছে তাহাই থাকিবে; না আরও শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্বায়ী হইয়া যাইবে।

'আচার প্রবন্ধ':—

মনুষ্যে পশুধর্ম্ম এবং জড়ধর্ম্ম দুইই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশু-ভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা, এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।

মনুষ্যে যে জড়ধর্ম্ম আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্র কর্ত্তৃক সমস্ত জীবিত কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নির্দ্দেশ হওয়াতে জড়তাপ্রাপ্তির অবসর থাকে না। আবার শাস্ত্রবিনির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এরূপ যে, তাহাদের যথোচিত সাধনে সাধারণতঃ শরীরের বলবত্তা এবং তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র একবারও আমাদিগকে একান্ত আল্‌গা হইয়া পড়িতে দেন

না। যথোচিত কালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদিগকে আহার, বিহার, নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধি প্রদান করেন। কিন্তু লোভ, সুখেচ্ছা, অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না।

'বিবিধ প্রবন্ধ' ঃ—

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহাঁর প্রণেতা একজন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি মগধদেশের অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, আবার কাহার মতে তিনি অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচারেও শূদ্রক রাজার প্রচুর্ভাবের সময় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, ঐ সময় খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন, দুই শত বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন, ছয় শত বৎসর পরে।

কিন্তু ঐ সকল কল্পনাপূর্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের কোন প্রয়োজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিবৃত্তিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মূল একটি কথা মাত্র। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজদূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা

জানা হইয়াছে। এই একমাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদায় ঐতিহাসিক বিবরণের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্গোময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।

কিন্তু যিনিই যাহা বলুন, মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্পদিনের বস্তু নয়। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী ত বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তের কিছু পরবর্ত্তী। কিন্তু তাহার অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। তবে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে, মৃচ্ছকটিকের "আর্য্যক" নামক পুরুষটি যিসুখ্রীষ্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত। যদি ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা হইলে বিচার করা যাইত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণয় বাহিরের সহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা গোলযোগ হয় না।

মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার ভাষায় অলঙ্কার পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টী বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক বোধ হয় না।

কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে, মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া দেখিলেই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজভাবে আসিয়াছে যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ঃ—

প্রাচীন দিল্লীর মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথ্বীরাওয়ের আয়সস্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্ব্বে পৃথ্বীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাসুকির শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একটী অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকালজীর্ণ প্রাচীর ছিল তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা, নবাব, সুবাদার প্রভৃতি সকলে ঐ সভামণ্ডপে আপনাপন যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভা! রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানব-বিনির্ম্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিয়া বর্ণিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এত দিন কাল-তরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্যভাগে যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুই দিকে দুইটী সোপান-শ্রেণী। সর্ব্বনিম্ন-সোপানে একজন গম্ভীরপ্রকৃতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর

ইহাঁর পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটী গর্ভজাত ও অপরটী স্তন্যপালিত দুইটী সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষনিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে? আমার কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিবে? (এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভা হইতে "না না"—"না না"—"না না"—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল—! আমার কর্ণে?—আমি কে?—ভারতভূমির কর্ণে—ঐ মৃত্যু-সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল—মুখমণ্ডলে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

"এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন, দৈবানুকূলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল পৃথিবী ভেদ করিয়া বাসুকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদশাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৪

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৫৩—১৯২২
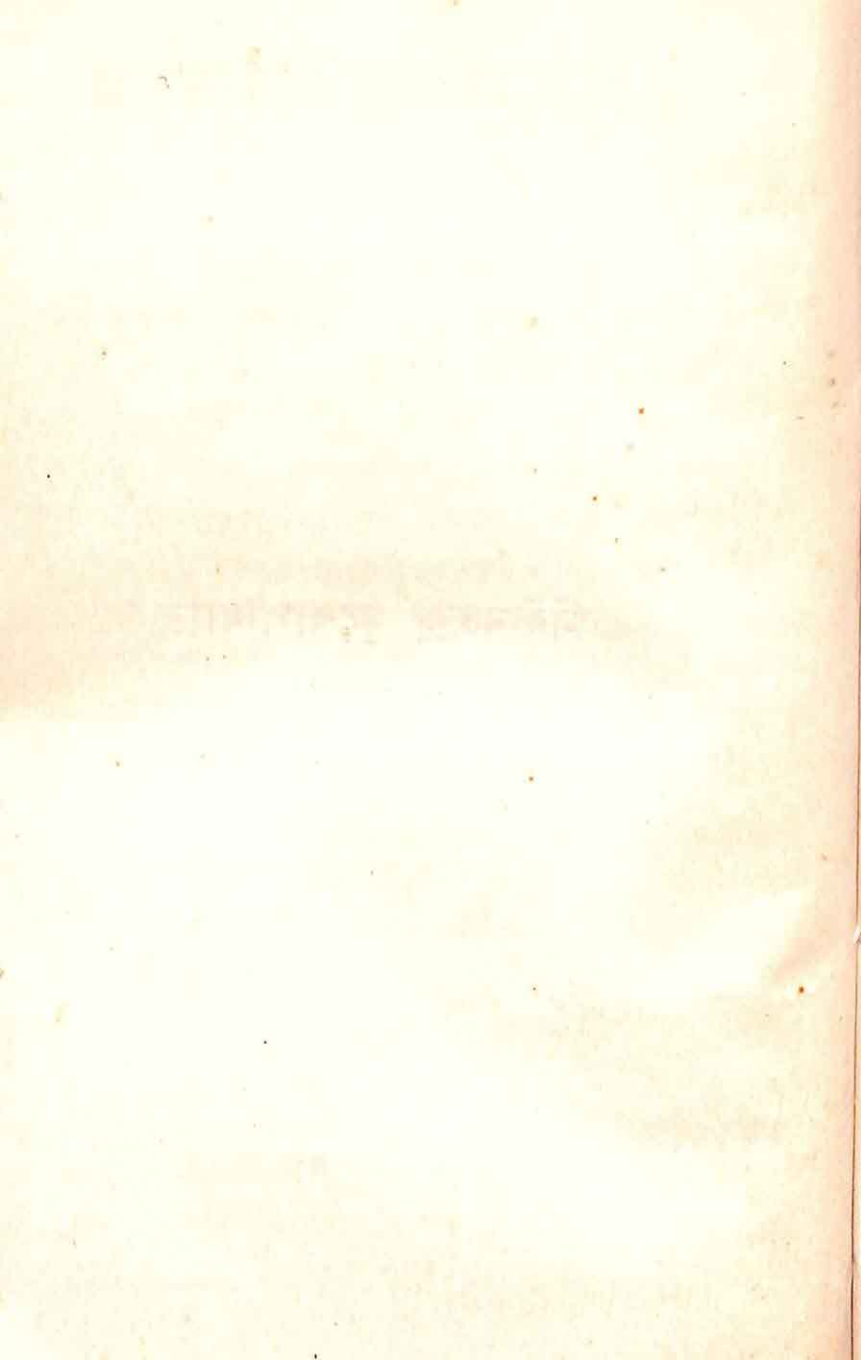
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

সংক্ষিপ্ত জীবনী

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের পূর্ব্বাংশে দশ মাইল দূরবর্ত্তী বুড়ার গ্রামে ৫ জুলাই ১৮৫৩ (২২ আষাঢ় ১২৬০) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। আত্মীয় ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। ক্ষুদিরামের যত্নে তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতেই তিনি বাল্যকালে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, দাশু রায় প্রভৃতির রচনা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি নয়-দশ বৎসর বয়সেই দাশু রায়ের অনুকরণে ছড়া পাঁচালি রচনা করিতে পারিতেন।

নবীনচন্দ্রের পিতা নবদ্বীপের তৎকালীন বিখ্যাত ধনী গুরুদাস দাসের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। অসহায় নবীনচন্দ্রের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার মানসে গুরুদাস তাঁহাকে নবদ্বীপের কোলেরগঞ্জ নামক স্থানে আনয়ন করেন এবং তাঁহার গদীতে খাতাপত্র লিখিবার কাজে নিয়োজিত করিয়া দেন।

বাল্যকাল হইতেই নবীনচন্দ্র দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। বাঁধাধরা কাজে তাঁহার মন বসিল না। দুষ্টামিতে উৎসাহিত করিবার জন্য একদল অনুরূপ সঙ্গী জুটিল। তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া তিনি নানাপ্রকার দুরন্তপনা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তিনি আত্মজীবনীতে* লিখিয়া গিয়াছেন :—

* এই অপ্রকাশিত আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ। নবীনচন্দ্রের পৌত্রদ্বয় শ্রীমৃণাল ও নির্ম্মলকান্তি মুখোপাধ্যায় আমাকে ইহা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

"নবদ্বীপ গ্রীষ্মকালে সমধিক রমণীয় হইয়া থাকে। এখানে নানা বিচিত্র স্থান আছে। অধ্যাপকদিগের টোল ও বাবাজিদের আখড়া অনেক আছে—তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, গণিয়া সংখ্যা করা ভার।...অধ্যাপকদিগের টোল দেখিয়া সুখ হইত না—কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৈকালে ললিত লতাকুঞ্জে নানা জাতি সুগন্ধ কুসুমে ও সুপক্ক ফলে বাবাজিদের আখড়াগুলি বড়ই মনোমুগ্ধকর বলিয়া বোধ হইত। যে সকল আখড়ায় তমাল মালতি লতা পুষ্প এবং সুখাদ্য ফলফুল থাকিত, আমি সেইগুলিতেই অধিক যাইতাম। যে বাবাজি আমার ভাল আদর করিত না—তাঁহাকে দলবল প্রদর্শন করিয়া ভীত করিয়া তুলিতাম।...আমার লেখাপড়ার সঙ্গে এখন কোনই সম্পর্ক নাই। বন্ধুদের বাটীতে ও কোলেরগঞ্জে যথাসময়ে পৌঁছুলেই খাইতে পাই, পরিধেয় বসন উত্তরীয় পাদুকা যেমন যাহা আবশ্যক গদিতে জানালেই তাহা প্রাপ্ত হই। কোন বিষয়ে ভাবনা নাই। ভবিষ্যৎ অতীতের কোনই ধার ধারি না।"

নবীনচন্দ্র নবদ্বীপ-বাসের শেষ বৎসরে সঙ্গীদিগের সহিত এক রাসপূর্ণিমার রাত্রে দৌরাত্ম্য করিয়া গুরুতররূপে পীড়িত হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রকাশ:—"সমস্ত রাসের রজনী অগ্রহায়ণ মাসের শিশিরে ঘোড়ায় চাপিয়া সমগ্র নবদ্বীপ ভ্রমণ করিলাম।" তাহার ফলে তিনি উৎকট "বাতশ্লেষ্মাজ্বরবিকারে আক্রান্ত" হইলেন। পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী ফিরিয়া কিছু দিন পরে তিনি সুস্থ হইলেন। চারি বৎসর নবদ্বীপে মুক্ত আবহাওয়ায় যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া নবীনচন্দ্র বাড়ীতে এক

অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> "আমি নবদ্বীপ যাইবার জন্য মাকে আর কোন কথা বলিতেই পারিলাম না।...বস্তুতঃ নবদ্বীপে চারি বৎসর বাস করিয়া শিক্ষা যাহা হইয়াছে, পাঠক মহাশয়রা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। শিক্ষা দূরে যাউক, স্বভাবের ভীষণতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল কারণে নবদ্বীপ যাওয়ার বিষয়ে সকলেরই অমত হইল। আমি পিঞ্জরবদ্ধবৎ কাটাইতে লাগিলাম।"

কিন্তু একভাবে গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করিবার মত পাত্র নবীনচন্দ্র ছিলেন না। শীঘ্রই দূরদেশে যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের এক আত্মীয়—বেণীমাধব রায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারীতে চাকুরী করিতেন—চাকুরীর স্থান ছিল মুঙ্গের। এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> "বেণীবাবু মুঙ্গের হইতে এইক্ষণ বাটী আসিয়াছেন, পুনর্ব্বার শীঘ্রই সপরিবারে তথায় যাইবেন। আমার মনে উদয় হইল, বেণীবাবুর সঙ্গে মুঙ্গের যাইতেই হইবে।...বেণীবাবু আমার কথা শুনিয়া আমার আশা পূর্ণ করিলেন...তিনি [মাতা] মুঙ্গেরের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বেণীবাবুর পরিবারদের মধ্যে থাকা—আর তাঁহার নিজের নিকটে থাকা একই বিবেচনা করিলেন, বিশেষতঃ ভবিষ্যতে বেণীবাবু যত্ন করিলে ঠাকুরদের সংসারে একটা চাকুরি হইতেও পারে।...মাতৃদেবী আনন্দের সহিত আমাকে মুঙ্গের পাঠাইতে সম্মতা হইলেন। আমি নিরূপিত দিনে বেণীবাবুর সহিত যাত্রা করিলাম।"

মুঙ্গেরে নবীনচন্দ্র তাঁহার অভিলষিত স্থানে অনুকূল পরিবেষ্টনে পতিত হইলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিতেছেন:—

"...আমার প্রকৃতিতে একটা একটানা স্ফূর্ত্তি ছিল বলিয়া অনেকেই আমাকে হঠাৎ দেখিয়া অর্দ্ধক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিত, কিন্তু একবার যাঁহার সহিত পরিচিত হইতাম, তিনি আর আমাকে ভুলিতে পারিতেন না। মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই ক্রমে পরিচিত হইলাম, সকলেই আমাকে লইয়া আমোদ করিত এবং আমাকে স্নেহ করিত।...নবকুমারবাবুর একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরি ছিল...আমি তাঁহাদের বাসা হইতে বাঙ্গালা সম্বাদপত্র ও পুস্তকাদি লইয়া আসিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে "শব্দকল্প লতিকা" নামক (অমরকোষের বঙ্গানুবাদ) একখানি অভিধান আমার হস্তগত হইল। ঐ অভিধান দেখিয়া শব্দের বৈচিত্র্য অনুভব করিয়া আমি এককালে মগ্ন হইয়া গেলাম।...অভিধানখানি একখানা খাতায় নকল করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে উহা আমার কণ্ঠস্থও হইয়া গেল। আমি এইরূপ আপনারই সাহায্যে নানারূপ কাব্য সাহিত্য ইতিহাস এবং নাটক নভেল প্রভৃতি পাঠ করিতে লাগিলাম। পুস্তক পাঠে ও সম্বাদপত্র পাঠে এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়িলাম যে, আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলাম। এই সময়ে আমার মনে নিয়ত ভাবতরঙ্গ ক্রীড়া করিত, আমি পাহাড়ের উপত্যকায় ও অধিত্যকায় নানা তরুলতা ও বনফুলবিমণ্ডিত প্রকৃতির রম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিতাম। অস্ফুট হৃদয়ের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে গান করিয়া গিরিমালা এবং বনস্থলীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতাম। এই নির্জ্জন গিরি-প্রদেশে কি সন্ধ্যা, কি প্রভাত, কি মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন, সকল সময়েই

আমি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। এই ভ্রমণে আমার চিত্তে তখন যে অব্যক্ত অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার হইত,—এখন এই সংসারশৃঙ্খলবদ্ধ দীন ব্যক্তি যদি তাহার কণামাত্র লাভ করিতে পারে—তাহা হইলেও আপনাকে ধন্য বোধ করে।

"...এই সময়ে আমি অর্থ কড়ির কোনই কদর বা মমতা জানিতাম না, বিশেষতঃ কখনও কাহাকে কিছু প্রার্থনা করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, যেহেতু আমি প্রচণ্ড অভিমানী ও আত্ম-মর্য্যাদাপ্রিয় ছিলাম।...পীর পাহাড়ে থাকার সময় কত বাঙালী, কত সাহেব ও মেম এবং আরো কত দেশীয় লোকের সহিত যে আমার অজস্র আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাহার সকল অংশ লিখিতে গেলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। ফলতঃ এই রম্য স্বভাবের রাজ্যে আমিই যেন একমাত্র রাজ্যেশ্বর ছিলাম, এই সময়ে আমি দীনবন্ধুবাবুর নবীন তপস্বিনী নাটকের অনুকরণে একখানি নাটক ও রাশি রাশি পদ্য রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল লোকচক্ষুর সন্নিধানে কখনই আইসে নাই, কত কবিতা লিখিতাম ও নষ্ট করিয়া ফেলাইয়া দিতাম, নাটকখানি অনেক দিন আমার নিকটে ছিল, কিন্তু আজকাল বিশেষ সন্ধান করিয়া আর পাইতেছি না। ফলতঃ ঐ সকল রচনার মধ্যে কেবলই আমার হৃদয়ভাবের চিত্র বিশৃঙ্খল ভাবে চিত্রিত হইত সন্দেহ নাই। এই স্থান হইতেই আমার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আমার প্রকৃতির সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

"এই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।...একদিন বেণীবাবু হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র আমার হাতে দিয়া কহিলেন—'তোমার বিবাহ উপস্থিত, তোমাকে বাটী পাঠাইবার জন্য

আমায় এই পত্র লিখিয়াছে দেখ।'...আমি বেণীবাবুর আদেশমত রামপুরহাটের টিকিট লইয়া মলুটীর মাতুলালয়ে পৌছিলাম। মাতুল মহাশয়রা সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তথায় পৌছিয়া ২।৩ দিন পরেই দক্ষিণগ্রামে বিবাহিত হইলাম। তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।...বিবাহের দায়িত্ব চিন্তা করিয়া মনে শঙ্কা হইতে লাগিল, এত দিন কেবল যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়াছি। অর্থ উপার্জ্জনের কোন পথই অনুসন্ধান করি নাই। এখন আমি সংসারী হইয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিব, সেই ভাবনাতে অভিভূত হইলাম।"

চাকুরীর সন্ধানে এক বৎসর বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি অবশেষে তাঁহার (মাতার মাসতুত ভাই) মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট নসীপুর—মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নসীপুর হইতেই নবীনচন্দ্রের জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল—সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ হইল। এই স্থানে শীঘ্রই নসীপুরের ছোট তরফের রাণী অন্নপূর্ণার পোষ্য পুত্র জগন্নাথপ্রসাদের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এ বিষয়ে তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"...এই স্থানেই শুভ ক্ষণে শুভ লগ্নে জন্মজন্মান্তরের প্রীতিবদ্ধ বান্ধবরতন শ্রীযুক্ত জগন্নাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁর বদনমণ্ডলে এমনি স্বাভাবিক সরল প্রীতি ও উদ্যমের ভাব বিদ্যমান যে, আমি ইহার সহিত আলাপ না করিয়াই থাকিতে পারিলাম না।...আমি তাঁহাদের সকলের সহিত সুপরিচিত হইলাম, ক্রমে তাঁহাদের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। জগন্নাথবাবু আমাকে জন্মান্তরীণ সখার ন্যায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সহবাসে ক্রমাগত ৫ পাঁচ বৎসরকাল অতি সুখেই অতিবাহিত

হইয়াছিল। এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত জানি না কোন্ সৌভাগ্যবলে আমার সম্মিলন হইল, ইহাঁদের সহিত আমি মিশিতে পারি, এমত সদ্‌গুণ আমার কোথায়? ইহাঁরা কি জানি কি জন্য আমাকে ভাল বাসিতেন। যাহা হউক, ঈশ্বরকৃত এই অনুকূল শিক্ষিত সমাজ প্রাপ্ত হইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। নিত্য নব নব জ্ঞানালোচনায়, পুস্তকাদি পাঠে ও শিক্ষিত সাহচর্য্যে আমার হৃদয়-মুকুর পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। আমার মানস-কুসুম বিকসিত হইবার উপক্রম হইল।

"উৎসাহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বদা কবিতাদি বিষয়ে এরূপ তন্ময় হইলাম যে, দিন রাত্রি কোন্ দিক্ দিয়া কাটিয়া যাইত।...বেলা দুই প্রহরের সময় সকলে বিশ্রাম করিত, আমি একটা টীনবাক্সে লিখিবার উপকরণ লইয়া কাঠগোলার দিব্য উপবনে সরোবর-তীরে বকুলবৃক্ষতলায় বসিয়া প্রকৃতির গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম। ভুবনমোহিনী প্রতিভার অধিকাংশ কবিতা এই স্থানেই এই অবস্থায় লিখিত হয়।

"...রাণী মাতার মৃত্যুর পর আমাদের সকলেরি অদৃষ্ট-বিপর্য্যয় ঘটে। সে অনেক কথা।

"আমি যে আশায় বুক বান্ধিয়া ছিলাম, তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।...রাণী মাতার ইচ্ছায় ও উৎসাহে আইনাদির ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষাদি দিয়াছিলাম। এইক্ষণ তাঁহার সাহত সমস্তই গেল। নসীপুরে আর থাকিতে পারিলাম না।"

নবীনচন্দ্র পাঁচ বৎসর নসীপুরে কাটাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের

শেষ ভাগে তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রকাশ :—

"নিজবাটী বুড়ার গ্রামে আসিয়া আত্মীয়াদি সহ বাস করিতে লাগিলাম এবং কবিতাদি রচনা ও প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। এই সময়ে "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" ১ম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার কারণ, ইহা ভুবনমোহিনী দেবী নামিকা কোন বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের রচিত, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানা জনে নানাপ্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিল। আমাকেও অনেক লোক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমি প্রকৃত কথা বলিতে লাগিলাম, তথাপি কাহারও ভ্রম দূর হইল না। তৎপর দুই বৎসর বাদ ভুবনমোহিনী প্রতিভা দ্বিতীয় ভাগ ও আর্য্যসঙ্গীত দ্রৌপদীনিগ্রহ মহাকাব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই কাব্যদ্বয়ের অধিকাংশ স্থল আমার জন্মভূমি বুড়ার গ্রামে থাকিয়া রচনা করি।...বংশে কৌলীন্যমর্য্যাদা থাকাবশতঃ কুলীনের আকরস্থল সিঙ্গিগ্রামে ঐ সময়ে আমার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হইল।...সাংসারিক চিন্তা প্রবলতর হইয়া উঠিল,...এইরূপ ভাবনায় দিনাতিপাত করিতেছি, একদিন আমাদের গ্রামের পশ্চিমাংশ কুড়মুন গ্রামের মুন্সী মহম্মদ তকী বন্ধুবরকে এই সকল কথা কহিয়া সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিলাম। মহম্মদ তকী একজন পেন্‌সনপ্রাপ্ত পুরাতন ডাক্তার। তিনি তখন কুড়মুনে থাকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি সহকারে নিজের ব্যবসায় চালাইতে-ছিলেন।...আমার কথা শুনিয়া কহিলেন, "কিছু দিন আমার

উপদেশমত অ্যালপ্যাথি চিকিৎসার পুস্তকগুলি অধ্যয়ন কর ও আমার কার্য্যাবলী দেখিয়া শিক্ষা কর, তাহার পর কোন স্থানে চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যর্থ হয় না, কখন না কখনও ইহার ফল বুঝিতে পারিবে।" আমি তাঁহার কথায় আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। বৎসরাধিক কাল অতিমাত্র যত্ন ও শ্রম সহকারে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া কতকটা তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলাম। এই সময়ে বীরভূম জিলা কীর্ণাহার প্রদেশে ম্যালেরিয়া জরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। বান্ধববর বিন্দুলাল আমায় লিখিলেন, "তুমি এই সময়ে এ প্রদেশে আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে আশাতীত ফললাভ করিতে পার।"...আমি ১২৮৮ সালের ২০এ অগ্রহায়ণ ২।৪টী ঔষধপত্র সংগ্রহ করিয়া কীর্ণাহারে আসিয়া পৌছিলাম ও কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বিধাতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় ২।৪ মাস মধ্যেই আমার কার্য্যসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমার নিকট রাশি রাশি অর্থ বৃষ্টি হইতে লাগিল। ৬ মাস না যাইতেই আমি কীর্ণাহারে দৃঢ় হইলাম। দেশের লোক অধিকাংশই গরিব, ডাক্তার বাটীতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতে অপারগ—সুতরাং আমি এমত একটী ঔষধ তৈয়ার করিলাম, যাহাতে জ্বর ত্যাগ ও বন্ধ হয় ও জরঘটিত তাবতীয় পীড়ার শান্তি হয়। ২।৪ মাস ঐরূপ করিতে করিতে ঔষধটী সর্ব্বাংশে ফলপ্রদরূপে সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন উহা 'নবীনবাবুর লৌহসার' নামকরণ করিয়া ব্যবস্থাপত্র ও বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিলাম। এইরূপে লৌহসার আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। এইরূপে এই মহৌষধ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া,

মালদহ প্রভৃতি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়া আমার আর্থিক অভাবের সম্যক্ নিরাকরণ করিয়াছে।"

২৮ আগস্ট ১৯২২ (১১ ভাদ্র ১৩২৯) তারিখে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

রচনাবলী

স্বভাবের নিকেতন নসীপুরে অবস্থানকালেই নবীনচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি স্ফুরিত হয়। এখান হইতে লিখিত তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র 'সাধারণী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার "অকৃতজ্ঞ শুক" কবিতাটি সর্ব্বপ্রথম ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ তারিখের 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়; ইহাতে লেখকের নাম ছিল না। ইহার পর তাঁহার দুইটি কবিতা—"কাঁদ কেন?" ও "কিবা দেখিলাম," "শ্রীঃ—নসীপুর" স্বাক্ষরে যথাক্রমে ৮ই ও ১৫ই নবেম্বর (১৮৭৪) তারিখের 'সাধারণী'তে মুদ্রিত হয়। অতঃপর তিনি "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী" এই ছদ্ম নামে 'সাধারণী'তে কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন; তন্মধ্যে প্রথম কবিতা—"পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী" প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল ১৮৭৫ তারিখে। নসীপুর হইতে লিখিত তাঁহার শেষ কবিতা—"নীলাম্বরে কাল মেঘ" প্রকাশিত হয় ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ তারিখে। 'বঙ্গদর্শনে'ও "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী"র "দরিদ্র যুবক" নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল (শ্রাবণ ১২৮২)।

কেন তিনি কবিতায় "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিতেন, সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এই স্থান হইতে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই-একটি মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমে সম্পাদক মহাশয় ঐ সকল কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিলেন যে, এই দুইটি কবিতা কবিতাই হয় নাই, সুতরাং প্রকাশ করা গেল না। তৎপরে আর একটি কবিতা ভুবনমোহিনী দেবী,—স্বাক্ষর করিয়া পাঠানতে সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদে অধীর হইয়া ভূয়সী প্রশংসাবাদ সহকারে মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। এই কবিতা লইয়া নসীপুরে আমার বন্ধুদের মধ্যে খুব একটা বাহাবা পড়িয়া গেল। এইরূপে—ভুবনমোহিনী দেবী স্বাক্ষরে কবিতাসকল বাহির হইতে লাগিল।"

'বিনোদিনী'ঃ নবীনচন্দ্রের নসীপুরে অবস্থানকালে তথা হইতে 'বিনোদিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধারণী-যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকার সহিত নবীনচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ছদ্ম নামে তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

আমার এই সাহিত্যালোচনার পরিপোষক হইয়া বান্ধববর জগন্নাথপ্রসাদবাবু বিনোদিনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন, এই কাগজ ২ বৎসর চলিয়া—নানা কারণে বন্ধ হইয়া যায়।

'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়—১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে (৩০ এপ্রিল ১৮৭৫)। পত্রিকা-প্রচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে—২২ চৈত্র ১২৮১ তারিখে চুঁচুড়ার 'সাধারণী'তে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ঃ—

বিনোদিনী।—সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় (ভ্রমরের অবয়বের) মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

হইয়া সাধারণী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গদর্শনে ইতিহাস লেখক বাবু রামদাস সেন ও অন্যান্য কয়েক জন প্রসিদ্ধ লেখক ইহার সহায়তা করিবেন। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১৷৵০, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়েরা নিম্নলিখিত স্থানে স্বাক্ষরিত পত্র ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে আগামী মাস হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদ নসীপুর রাজবাটীতে বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের নিকট

'বিনোদিনী'-সম্পাদিকা ভুবনমোহিনী দেবী সম্বন্ধে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন :—

ইনি নবীনচন্দ্রের সম্পর্কিত আত্মীয় পোষ্টাল ইন্‌সপেক্টার রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। ইনি 'রত্নবতী' নামে একখানি কবিতার বই ও 'আমোদিনী' নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ভুবনমোহিনী দেবী সম্পাদিকা ছিলেন নামে মাত্র।* প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুদলই সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। ('সোনার বাংলা,' ২৫ মাঘ ১৩৫৩)

---

* শ্রীরাধারাণী দেবীর মতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী'ই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা এবং উহা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ("আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নারীর স্থান" : ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ)। 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং সম্পাদিকা হিসাবে পত্রিকায় ভুবনমোহিনী দেবীর নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা চলে না। আমার মনে হয়, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (শ্রাবণ ১২৮২) প্রকাশিত থাকমণি দেবী-সম্পাদিত 'অনাথিনী'ই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা।

ভুবনমোহিনী দেবীর 'রত্নবতী' কাব্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়; তিনি "দক্ষিণগ্রাম-নিবাসিনী"; এই গ্রামেই নবীনচন্দ্রের শ্বশুরালয় ছিল।

গ্রন্থাবলীঃ নবীনচন্দ্র যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। ভুবনমোহিনী প্রতিভা ঃ

১ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক (২৮ ডিসেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ১১৩+১।

২য় ভাগ। ভাদ্র ১৭৯৯ শক (১৮ নবেম্বর ১৮৭৭)। পৃ. ১৩০+১।

সূচী, ১ম ভাগ ঃ—পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, অকৃতজ্ঞ যুবক, হিমালয় বিলাপ, অলস-যুবক, দরিদ্র-যুবক, জন্ম-ভূমি, শৈশব-স্বপন, কেন এত ভালবাসি?, ১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫, দুঃখিনী মহিষী, আর্য্যসঙ্গীত, বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক, উন্মাদিনী, নীলাম্বরে কাল মেঘ, বঙ্গ-দম্পতির পরিণাম, শারদীয় প্রদোষ, ভারতে গোলাপ।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে (ইং ১৮৮০) "আর্য্যসঙ্গীত" পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং পাঁচটি নূতন কবিতা—কিবা দেখিলাম, আকাশ, রাণী অন্নপূর্ণা, হৃদয়োচ্ছ্বাস ও উপসংহার—সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সূচী, ২য় ভাগ ঃ—অসুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মী, ভারত-রাজলক্ষ্মী, লক্ষ্মীরাণীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, ইন্দ্রালয়-দর্শনে, পরাধীনের প্রণয়, কে তুমি?, মহাপ্রলাপ, দার্শনিক সংস্কার, সরস্বতী পূজা, শ্মশান-দর্শনে, পিতৃতর্পণ, অবনী-বৈচিত্র্য, আশা-মরীচিকা, উপহার।

নসীপুর হইতে নিজবাটী বুড়ার গ্রামে ফিরিয়া নবীনচন্দ্র 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভা' প্রকাশ করেন। ১ম ও ২য় ভাগ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম ছিল না; ছিল কেবল "Edited and Published by Nobinchandra Mookhopadhya." প্রকৃতপক্ষে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই যে গ্রন্থকার এবং "শ্রীমতী ভুবন-মোহিনী দেবী" যে তাঁহারই ছদ্ম নাম, তাহার আর একটি প্রমাণ—১ম ভাগ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র ২য় সংস্করণের পুস্তকের (ইং ১৮৮০) আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত আছে—"শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত"।

২। **আর্য্যসঙ্গীত** (কাব্য):

> ১ম-২য় খণ্ড (দ্রৌপদী নিগ্রহ)। ১৫ পৌষ ১২৮৬ (১৫ মে ১৮৮০)।
> পৃ. ২২৫+১।
> উত্তর ভাগ (জাতীয়নিগ্রহ)। ১৫ আশ্বিন ১৩০৯ (১৪ ডিসেম্বর ১৯০২)।
> পৃ ২৯৮।

৩। **সিন্ধু-দূত** (কাব্য)। ইং ১৮৮৩ (২২ জুন)। পৃ. ৩০।

ইহার আখ্যা-পত্রে লেখক-হিসাবে নবীনচন্দ্রের নাম আছে এবং তিনি যে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র রচয়িতা, তাহারও উল্লেখ আছে। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ:—

> 'সিন্ধু-দূতে'র প্রথম হইতে তৃতীয় স্তবক পর্য্যন্ত 'আর্য্যদর্শনে' মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা পাঁচটী স্তবকে সম্পূর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

নবীনচন্দ্র শেষ-জীবনে 'শিবাজী-বিজয়' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই অপ্রকাশিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে তাঁহার পৌত্রগণের নিকট রক্ষিত আছে।

নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এক সময় (১৮৭৫-৭৬) বাংলা-সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ; ইহার প্রধান কারণ, কাবতাগুলি তখন "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী" এই বেনামীতে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইত, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে পুস্তকাকারেও বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> তখন 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।*

---

* 'সাধারণী,' ১৬ ফাল্গুন ১২৮২ :—"ভুবনমোহিনী প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বোধ হয় সাধারণীর পাঠক আমাদের কথায় অন্যমত হইবেন না। তবে আমরা ভুবনমোহিনী দেবী সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রকে যেরূপ গোপনে বলিয়াছি, এবার প্রকাশ্য সমালোচকরূপে সেইরূপ বলিতেছি যে, ভুবনমোহিনী যদি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার প্রতিভার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন ও শোভা বর্দ্ধন করেন, তবে সত্য সত্যই তাঁহার প্রতিভা ভুবনমোহন করিবে।"

'এডুকেশন গেজেট,' ২৬ চৈত্র ১২৮২ :—"গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই এরূপ যে, এইক্ষণকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বঙ্গকবিরাও এতাদৃশী কবিতা প্রণয়নে আত্মগৌরব স্বীকার করিতে পারেন। যিনি পাঠ করিবেন, তিনি যেন একটু চিন্তা করিয়াই পাঠ করেন এবং একবার মাত্র পড়িয়াই সব বুঝিয়াছেন, মনে না করেন।...পুস্তকখানি যথার্থই প্রতিভা নামের উপযুক্ত হইয়াছে।"

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তিউপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে [কার্ত্তিক ১২৮৩] এক সমালোচনা লিখিলাম। (১ম সং, পৃ. ৯৬)।

মোটের উপর বেনামেই হউক, স্বনামেই হউক, নবীনচন্দ্রের কবিতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার প্রধান কারণ স্বদেশপ্রীতি এবং ভারতের পরাধীনতাজনিত ধিক্কারবোধ অধিকাংশ কবিতারই প্রেরণা ছিল। কবি-হিসাবে নবীনচন্দ্রকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া না গেলেও সে-যুগের তুলনায় তিনি ভাল লিখিতেন, ইহা বলা চলে। তাঁহার কবিতার দুই-একটি নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল :—

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' :—

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী

পিঞ্জরেতে রব, পিঞ্জরেতে খাব, পিঞ্জরেতে বসি গাইব গান
কখন হাসিব, কখন কাঁদিব, কখন থাকিব, করিয়া মান !

কথন সরস সুধার লহরী প্রণয়-সাগরে ঢালিয়া দেহ,
—গাইব সুরুচি মধুর মধুর, মাতাব তাহাতে বিরহ বিধুর,
মাতাব তাহাতে প্রণয় বাউর,—অথবা যদিও না মাতে কেহ—
নাই বা মাতিল। নিজেই মাতিব,
নিজেই সুখের সাগরে ভাসিব,
দিব না অপরে সুখের ভাগ।
এই কণ্ঠরব, হবে না নীরব, নাই বা হইল বীণা বেণু রব,
নাই বা হইল ললিত, ভৈরব, নাই বা হইল বেহাগ রাগ।
হাসিবে বঙ্গ? হাসুক! তাহাতে হইবে না মোর হৃদয়ে দাগ!
ভারতের দুখে কাঁদিলে হৃদয়, "গাইব করুণ" শুনিবে নিদয়—
—বধির ভারতী (১) অলস বাঙ্গালি,
কাজেই এখন পথের কাঙ্গালি!
কাজেই এখন দাসের দাস!
অকৃত সাহস, অতুল গৌরব, অটুট বিক্রম, অমূল বৈভব,
কিছুমাত্র নাই হারায়েছে সব;
শিখেছে কেবল লঘুতা, ভীরুতা,
বেড়েছে কেবল হৃদয়ে ত্রাস।
শুনিয়া সে গান, কাহার কি প্রাণ
কাঁদিবে না'ক? যদিই কাঁদিল—
এক বিন্দু অশ্রু যদিই পড়িল—
নক্ষত্র বিশেষে ভেকের মাথে,
যদি দৈবযোগে, পদার্থ সংযোগে,
একটিও মতি জনমে তাতে!

---

(১) ভারতবর্ষীয়।

যদিও বিহঙ্গী দুর্ব্বলা অবলা, বিহীন প্রতিভা, অবোধ সরলা,
পরের আহারে পোষিছে উদর।
শৃঙ্খল পীড়নে, ব্যথিত জীবনে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িছে সঘনে,
তথাপ যখন শুনিবে শ্রবণে "ভীষ্ম কর্ণার্জ্জুন বীরবৃকোদর।
আর্য্যবংশচ্ছবি—কল্পনা কবির,
পাণ্ডব রাঘব, মহা মহাবীর।"
শুনিবে যখন, যোদ্ধবিবরণ, দেখিবে যখন সুদূর স্বপন,
দেখিবে যখন মানস নয়নে,
নীল কাদম্বিনী আকাশ আসনে।
(গাইবে তখন—)
"অসুরে নাশিতে, অমরে তুষিতে,
রসাতলে দিতে মরত মেদিনী ;
করে কাল অসি, খল খল হাসি,
চপলা রূপসী, কপালমালিনী,
করে হুহুংকার, বলে মার মার,
মার রে অসুরে, পলায়! পলায়!
চেড়ীগণ সব, ঢালিছে আসব, ঠমকে চমকে নাচিছে তায়।
রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধিরপ্রবাহে দিতেছে সাঁতার ;
ছিন্নশীর্ষ শব, ভেসে যায় সব,
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
সস্বনে নিস্বনে মলয় পবন, আহরি সুরভি নন্দন রতন,
—মন্দার সৌরভ অমৃতরাশি,—
মর্ম্মরিছে তরু অটল ভূধর, দমিছে দাপেতে, কাঁপিছে শিখর।

কাঁপিছে মেদিনী, রণ কুশলিনী,
অরণ্য রঙ্গিণী বিকট হাসি—
ঘোরে রণমাঝে, ঘোর রণ সাজে !
ঘোর ঘন মাঝে চপলা খেলে।
ঘোর ঘন নাদে, মুহুর্মুহু "দে, দে,
সুধা দে সুধা দে সুধা দে" বলে !
উন্মত্তা উলঙ্গী, ভয়দা ভীমাঙ্গী খর্পরে রুধির করিছে পান ;
বদনে না ধরে, ধারা বেয়ে পড়ে,
কপোলে হৃদয়ে যেতেছে বান !"
বীরের সঙ্গীত, বীরের মত, গাইব তখন পারিব যত,
এই পক্ষপুট তুলিয়া উল্লাসে।
হবে প্রতিধ্বনি, প্রান্তর সাগরে, নদ নদী হ্রদ ভূধর গহ্বরে,
পবনে বহিয়া সে ধ্বনি সত্বরে,
বিলয় করিবে অনন্ত আকাশে !
নিবিড় তিমির হিমাদ্রিগুহায়, কদাচিৎ যদি কেশরী ঘুমায়,
কদাচিৎ যদি সে সঙ্গীত শুনে
ভাঙ্গে তার ঘুম, উঠে বা জাগিয়া,
তল্লাসে শিকার ক্ষুধার্ত্ত হইয়া,
(মুখের আহার খেতেছে কাড়িয়া
শৃগাল বায়সে, দেখিছে নয়নে !)
তা হ'লেই হবে, তা হলেই যাবে
সঙ্গীত পিপাসা জনমের তরে
মিটিবে আমার, গাব না'ক আর,
রহিব বিহঙ্গী নীরবে পিঞ্জরে।

রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" এই কবিতার ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছিল কি না, সমালোচকেরা বিচার করিবেন।

ভারত-রাজলক্ষ্মী

... ...

তিমিরে ত্রৈলোক্য গভীর আবৃত !
গভীর ভীষণ শ্মশান ভুবন !
গভীর ভাবের আধার যেন রে,
গভীর হৃদয়ে আনন্দ-কানন !

গভীর গর্জ্জনে জ্বলিতেছে চিতা,
পুড়ি'ছে অনন্ত কোটী প্রাণী তায় !
শৃগাল কুক্কুরে করে গণ্ডগোল ;
কবন্ধ দানাতে নাচিয়া বেড়ায়।

শাঁখিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচী,
চিৎকার 'চিক্রাহি' ছাড়ি'ছে সঘনে !
চিতা মাংস লয়ে করে লোফালুফি,
কড়মড় অস্থি চিবায় দশনে !

কাড়াকাড়ি করে, ছুটে উভরড়ে,
হাসে, নাচে, গায় আনন্দ অপার।
মুখে রক্ত-ধারা, হাতে সুরা-পাত্র
দাঁড়া'য়ে ভৈরবী কাতারে কাতার !

লক্ষ লক্ষ ভীম জটাজূটধারী
কাপালিক বসি' ছিন্ন-শীর্ষ শবে

করিতেছে ধ্যান ;—ভয়ঙ্কর দৃশ্য !
খায় চিতা মাংস—প্রমত্ত আসবে !

অদূরে ভীষণদর্শন এ হ'তে
ওই দেখ, হেন দেখ নাই আর,
বসি' ব্যাঘ্রচর্ম্মে উলঙ্গ পুরুষ
ঘোরকৃষ্ণতনু প্রকাণ্ড ব্যাপার !

আসব-আলস্যে আরো ভয়ঙ্কর,
রক্ত লোল-চক্ষু ঘুরি'ছে কপালে !
করে সুরাপাত্র, মুখে রক্তধারা,
প্রতি কটাক্ষেতে বিদ্যুৎ বিজলে !

বিকট দুর্গন্ধ উঠি'ছে সর্ব্বাঙ্গে !
প্রতি লোমকূপে জীবন্ত নরক !
প্রতি শ্বাসে ক্ষরে অনল-স্ফুলিঙ্গ,
রক্তলোলজিহ্বা করে লক্ লক্ !

দীর্ঘ জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ্রু-রাশি,
দীর্ঘ বপুঃ স্পর্শ করি'ছে গগন ;
সম্মুখে হ'তেছে লক্ষ নরবলি,
লক্ষ রমণীর সতীত্বহরণ !

এ কি ভয়ঙ্কর ! এ কি নিষ্ঠুরতা !
এ কি পাপাচার, পৈশাচিক রীতি !
গেল যে জগৎ, রসাতল গেল,
গেল এইবার, গেল সৃষ্টি স্থিতি !

কে ও ভীমকায় বসি' প্রেতভূমে ?
চেন কি উহারে—চেন কি মানব ?
নহে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা,
নহে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব।

নিষ্ঠুর তান্ত্রিক রীতি ওর নাম,
বড়ই নির্ম্মম—বড় পাপাচার!
ওরি অত্যাচারে হ'য়ে উৎপীড়িতা
উন্মত্ত প্রকৃতি ছাড়ি'ছে হুঙ্কার!

ওই দেখ দূরে অপূর্ব্ব ষোড়শী,
ভারতের রাজলক্ষ্মী উঁর নাম!
ওরি উৎপীড়নে হ'য়ে উৎপীড়িতা
ছাড়িয়া যেতেছে আর্য্যদের ধাম!

বহুদিন হ'তে ছিল আর্য্য-গৃহে
মমতা-বন্ধন কাটিতে কি পারে ?
যায় যায় আর চলে না চরণ,
স্নেহের আবেগে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে!

রাজগৃহ হ'তে রাজ-লক্ষ্মী যায়,
দেখিয়া শোকেতে কান্দি'ছে প্রকৃতি,
ঝরে অশ্রুধারা, ক্ষরে শিলাবৃষ্টি,
আঁধারিয়া পথ রুধিতেছে গতি!

চমকি' বিদ্যুৎ প্রদর্শি'ছে শঙ্কা,
হুঙ্কারি' জলদ, হুঙ্কারি' পবন

জাগাই'ছে আর্য্যে কিন্তু কে তা' শুনে ?
ভক্তির কুহকে মুগ্ধ আর্য্যগণ !

মুক্তির মোহেতে নিদ্রাগত আর্য্য,
কোথা' কি হ'তেছে কে দেখে চাহিয়া ?
দুর্দ্দশা-সাগরে ডুবা'য়ে সংসার
রাজ-লক্ষ্মী যায় ভারত ছাড়িয়া !

ঘোর পাপাচার, ঘোর নিষ্ঠুরতা,
কোমল হৃদয়ে সহিতে কি পারে ?
নিরুপায় ভাবি' আর্য্যরাজলক্ষ্মী
আত্ম সমর্পিল যবনের করে !

'আর্য্যসঙ্গীত' ঃ—

দ্রৌপদী নিগ্রহ

... ...

বিধি এ দুর্য্যোগ হতে, আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন ? এ বিপদ কত দিন রহিবে ?
জান কত দিন পরে, ঘন জাল মুক্ত ক'রে
আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্বমত উঠিবে ?
এ ভীম দুর্য্যোগ ঘোর— কাল রাতি হবে ভোর
কতক্ষণে ? আমাদের দশায় কি হইবে ?
মুহুর্মুহু বজ্রপাত, অসহ্য হয়েছে, নাথ !
দারিদ্র্য-দুর্ব্বল প্রাণে আর কত সহিবে ?

সে কালে প্রভাত হ'লে, পূরব গগন মূলে,
হেমাম্বুদ কিরীটিনী উষা মৃদু হাসিত !

নির্ম্মল ভারতাকাশে, স্বাধীনতা হাসি হেসে
রাগ রক্তছটা ভানু আদরেতে ভাসিত!
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে, মকরন্দ অলিকুলে,
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পিত আর বিলাত,
পুষ্পবন কাঁপাইয়া স্বাধীনতা বিতরিয়া,
সুগন্ধি মলয়ানিল মৃদু মন্দ বহিত!

* * *

বহু যুগ ব্যবধানে, কালের তরঙ্গ রণে,
ডুবিয়াছে আর্য্য, মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই, কিরূপে প্রমাণ দেই?
নাই আর্য্য—নাই বীর্য্য—সমস্তই গিয়েছে!

সমস্ত হয়েছে নাশ, ভারতের ইতিহাস,
কি আছে? গিয়াছে সব আর্য্যদের সনেতে,
সে যুগের কথা সব, সমস্তই অনুভব,
অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে?

যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে, কারে কথা সুধাই কে বলিবে?
স্বাধীন ভারতে যবে বিজয় পতাকা শোভে,
কে তখন দেখেছিল, এবে সাক্ষী হইবে?

'সিন্ধু-দূত' ঃ—

এ কি এ? আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত

প্রভাত হইতে ব'সে রয়েছি এখানে, বাহ্য জগৎ পাশ'রে।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহার কিছু নাই মোর ; সব ত্যজেছে আমারে।

সাগর ! শুনিলে নাকি মিনতি আমার, তাই হয়েছ সুস্থির ?
উত্তাল তরঙ্গমালা কম্পিত করে না বেলা,
অনন্ত নীলাম্বুরাশি নীলাম্বর-সম এবে প্রশান্ত গম্ভীর !
নীরব প্রকৃতি, ধীরে বহিছে সুগন্ধসিক্ত প্রদোষ-সমীর।

শুভ্র ফেন-পুষ্প-স্তূপে সজ্জিত সৈকত-বেলা দেখাই বা কায় ?
দূর নীলাম্বর পরে এক দুই তিন ক'রে
অসংখ্য তারকা-রাজি ফুটিছে নীরবে ! ঐ গগনসীমায়—
উঠিতেছে পূর্ণচন্দ্র আহা মরি মরি ! শোভা কহা নাহি যায় ;

লুটায়ে প'ড়েছে নীল সাগরের জলে নীলাম্বর-পটলেখা ;
উপান্তে উঠিছে শশী নাশিয়া তিমির-রাশি,
জলনিধি হ'তে যেন উঠে কলানিধি চারু কৌমুদীর সখা।
লুটায়ে প'ড়েছে নীল সাগরের জলে নীলাম্বর-পটলেখা।

ভাতিছে শুধাংশু-করে সাগর-সৈকত-বেলা, দ্বীপ-তরু-চয়,
নারিকেল-বৃক্ষাবলী সায়াহ্ন-সমীরে দুলি
চন্দ্র-করে চকমক্ চাহি মোর পানে কিবা কহে সদাশয় ?
বুঝেছি বুঝেছি আর বলিতে হবে না, ধন্য তুমি সহৃদয় !

* * *

গভীর রজনী, স্থির নীরব প্রকৃতি, বিশ্ব ঘুমে অচেতন ;
ঘুমায় গগন, পৃথ্বী, সিন্ধু, সমীরণ।

নৈশ নীলাম্বর-তলে প্রেয়সী-কৌমুদী-কোলে
ঘুমায় সুধাংশু চারু শর্ব্বরী-রঞ্জন
ফেন-পুষ্প-হার-কণ্ঠ সাগর-সৈকত-বেলা ঘুমায় এখন।

ঘুমায় পাদপ-লতা, পশু-পক্ষী-আদি—মাত্র আমিই জাগ্রত,
সবাই ত্যজেছে দীনে জনমের মত।
অভাগা ভাবিয়া মোরে, নিদ্রাও অশ্রদ্ধা করে'—
সম্ভাষে না, হায়! যদি ভ্রমে কদাচিৎ
আসে নিদ্রা, স্বপ্ন আসি বসিয়া শিওরে স্মৃতি ক'রে উদ্বোধিত

—শত শত সুখ-চিত্র ধরিয়া সম্মুখে মোরে ভুলায় কুহকী,
যুগপৎ সম্পদ্-সৌভাগ্যে করে সুখী!
পরক্ষণে হায় হায়! নিদ্রা যবে ছেড়ে যায়,
শূন্য প্রায় সকল সংসার চক্ষে দেখি!
আশাভঙ্গে সুখভঙ্গে মর্ম্ম ভেঙ্গে যায়, মৃতপ্রায় প'ড়ে থাকি!

হায়! সে কথায় কার্য্য কি আছে এখন এই? গভীর নিশীথে
একাকী বসিয়া আমি সাগর সৈকতে;
অই বাড়বাগ্নি-প্রায় কেন জ'লে মরি হায়?
চিন্তানলে আত্ম-ভস্ম করি কি জন্যেতে?
যা হবার হইয়াছে, কে পারে সংসারে স্বীয় অদৃষ্ট লঙ্ঘিতে?

পারে না লঙ্ঘিতে? তবে চিন্তা করিব না? না না শুনি না সে কথা;
উহা ন্যায়-দর্শনের প্রবোধ-বারতা।

কার্য্যে অপারগ যেই অদৃষ্টের দাস সেই,
কার্য্যের জীবন চিন্তা, চিন্তা শান্তি হেথা !
চিন্তা প্রাণসখী যদি না র'ত সংসারে, তবে দাঁড়া'তাম কোথা ?

এস চিন্তে প্রিয়তমে ! স্বদেশের সুখস্বপ্ন করি হে স্মরণ,
যদিও স্বদেশ মোরে ত্যজেছে এখন ।
যদিও স্বদেশি-গণে বারম্বার অকারণে
ক'রেছে আমারে ঘোরতর নির্য্যাতন,
তথাপি আমার তারা স্বদেশীয়, এ কারণে নিতান্ত আপন ।

সবাই যে দোষী তাহা নহে ত, অনেকে মম বন্ধু প্রিয়তম,
অনেকে মানস-শিষ্য প্রিয় প্রাণোপম,
অনেকে সত্যের লাগি, যথার্থই অনুরাগী
ছিল মোর, কিন্তু তারা ভীরু ফেরু-সম—
প্রাণভয়ে অপ্রকাশ থাকুক তথাপি তারা স্নেহাস্পদ মম ।

স্বদেশীয় শত্রু মিত্র সমান সকলে, অহো প্রিয় ভ্রাতৃগণ !
গত কর্ম্ম কত আর করিব স্মরণ ?
স্বদেশ-উদ্ধার তরে কহি পুনঃ সকাতরে
কহি নাই আপনার উদ্ধার কারণ ;
আমার যা হইবার গেছে হ'য়ে ব'য়ে ইহ জন্মের মতন !

স্বদেশে সমান স্বত্ব-স্বার্থ সকলের, বুঝে দেখ মনে মনে,
ধর্ম্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় থাকুক এখানে !

যারা একদেশবাসী, সুখ দুঃখে একভাষী,
এক রাজনীতি-সূত্রে আবদ্ধ জীবনে,
জন্ম-মৃত্যু-জীবিকার একই মৃত্তিকা, দেহ এক উপাদানে—

তাহারা স্বতন্ত্র নহে এক পরস্পরে ইহা অভ্রান্ত বচন।
স্বদেশের তরে সমদায়ী সর্ব্বজন,
বৃদ্ধ, যোষা, শিশু, জরা, পীড়িত আতুর যারা,
তারা ছাড়া স্বদেশীয় প্রৌঢ়-যুবা-জন,
সকলে জাতীয় স্বত্ব-রক্ষার কারণে কর আত্মসমর্পণ।

ধর্ম্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ত্যজি পুনর্ব্বার কর উত্থান সকলে।
জয় পরাজয় ইহা আছে সর্ব্বকালে।
হও যদি পরাজয়, তাতেই কি আছে ভয়?
পরাজয়ে কঠোরতা শিখাবে সকলে,
পরাজয়ি, তোমাদিগে জয়ের দুন্দুভি-শব্দ শুনাইবে কালে।

আমার এ নির্ব্বাসনে হ'ও না হতাশ, ইথে আমিই গিয়েছি।
প্রকৃতির অণু আমি খসিয়া এসেছি।
আমার অভাবে ভাই কারো কিছু ক্ষতি নাই,
সকলি তাহাই আছে দেখিতে পেতেছি।
আমার এ নির্ব্বাসনে হ'ও না হতাশ, ইথে আমিই গিয়েছি।

তাতেই কি ক্ষতি ভাই? ইহাই ত বীরত্বের দিব্য পুরস্কার।
রণে নির্য্যাতনে মৃত্যু বাঞ্ছাই আমার।
তাহে কৃতকার্য্য হলে পুরুষত্ব বীর ব'লে,
বিজয়ীর সুখোন্মাদ কহে সাধ্য কার?
অভাগার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, এই দুঃখ রহিল এবার।

———

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৫

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১৭—১৯০৫

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩
তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৬৪

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১—২০।৫।৫৭

পিতৃ-পরিচয় ও জন্ম

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-সকল গণ্যমান্য বাঙালী প্রগতিশীল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পরই কলিকাতা—যোড়াসাঁকোনিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থান। রামমোহনের সহিত দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব ছিল, এবং রামমোহনের জীবিতকালে যে-সকল জনহিতকর আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরেও, এ দেশে যে সব জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাহারও অধিকাংশের মূলে ছিলেন দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথ স্বাধীন ব্যবসাকার্য্যেও বাঙালীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। উচ্চ বেতনের মানমর্য্যাদাপূর্ণ সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসা পরিচালনের জন্য তিনি 'কার ঠাকুর কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্য ছিল যেমন বিপুল, দানও ছিল তেমনি বিরাট্‌। স্বদেশবাসীদের দুঃখ-লাঘব এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কল্পেও তাঁহার দান ও প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিতে তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি দুই বার বিলাত গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার বিলাতে অবস্থানকালে ১৮৪৬, ১লা আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা—যোড়াসাঁকোয় ১৫ই মে ১৮১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

ছাত্র-জীবন

দেবেন্দ্রনাথের যখন আট কি নয় বৎসর বয়স, তখন পিতা দ্বারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কলেজও ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত।*

রামমোহন রায়ের স্কুল 'এংলো-হিন্দু স্কুল' বা 'হিন্দু স্কুল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের কৈশোরের শিক্ষা এখানে পরিসমাপ্ত হয়। এখানকার শিক্ষার প্রভাব তাঁহাতে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। সে যুগের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জর্ন্যালে'র সহকারী সম্পাদক এবং বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রায়ের সেক্রেটরী স্যাণ্ডফোর্ট আর্নট এই স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইংরেজী-বাংলা দুই-ই এখানে বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম; বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি একাধিক বার পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এংলো-হিন্দু স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণ পর পর দুই বৎসর 'বেঙ্গল ক্রনিকল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল ক্রনিকল' ১৮২৮, ১০ জানুয়ারী তারিখে লেখেন :

"At the close of the examination several prizes consisting of appropriate books were awarded to deserving boys. They had

---

* পৃঃ ৫৬। বর্ত্তমান পুস্তকে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত সমুদয় অংশই বিশ্বভারতী সংস্করণ হইতে গৃহীত।

been presented for the purpose by Mr. (David) Hare, Mr. Holcroft and the gentlemen composing the committee of Unitarian Association. The boys thus singled out for efficiency were... Debendernauth Takoor,...and those rewarded for the regularity of their attendance were Ramapersaud Roy....*

ছাত্রদের পরবর্ত্তী বাৎসরিক পরীক্ষা হয় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ বৎসর (১৮২৮) দেবেন্দ্রনাথ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮২৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পরীক্ষার এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করেন :

"The following are the names of the pupils who most distinguished themselves and who received the prizes both as rewards for proficiency and regularity of attendance :—

Third Class—Ramapersaud Roy and Debendranauth Tagore...†

এই দুই বৎসরের পরীক্ষার বিবরণে দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ ছাড়াও কয়েকজন কৃতী ছাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, মথুরানাথ ঠাকুর, শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত, নবীনমাধব দে, রাজা বাবু [রাজারাম] প্রভৃতির নামও পাইতেছি।

এংলো-হিন্দু স্কুল চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৮২৭ সালে চতুর্থ ও ১৮২৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ১৮৩০, নবেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার উপস্থিতিতে তাঁহারই স্কুলে দেবেন্দ্রনাথ বাকী দুই শ্রেণীতেও যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন পরোক্ষ প্রমাণে তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

---

* Ram Mohun Roy and the Progressive Movements in India.—J. K. Majumdar. p. 264-5.

† *Ibid.*, p. 270.

১৮২৬, মে মাস হইতে হিন্দু কলেজের যুব-ছাত্রগণ ডিরোজিওর নিকটে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৯-৩০ সন নাগাদ এই সব ছাত্র সকল ধর্ম্মের প্রতিই অনাস্থা জ্ঞাপন করিতে থাকেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যে স্বদেশের উন্নতির পথে অন্তরায়, এ কথাও তাঁহারা এই সময়ে ঘোষণা করিতে সুরু করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যদি ১৯২৯ ও ৩০ এই দুই বৎসরও হিন্দু কলেজে পড়িতেন, তাহা হইলে নব্যশিক্ষার ছোঁয়াচ নিশ্চয়ই তাঁহাতে লাগিত। তখনকার নব্যশিক্ষা দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি উগ্রপন্থী ছাত্রদের মত হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ, রামমোহন রায়ের স্কুলেও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল স্ব-দেশ, স্ব-ধর্ম্ম ও স্ব-সংস্কৃতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন, কখনও বিলোপসাধন নহে। দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই উক্ত আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

সে-যুগে পটলডাঙ্গা স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মত এংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রবৃন্দও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিবেটিং সোসাইটি বা বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া এই স্কুলের ছাত্রগণ ঐ সনে এংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব দিকে কৃষ্ণচন্দ্র বসুর গৃহে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার সন্ধ্যাকালে এই সভার অধিবেশন হইত। এখানে ধর্ম্ম ব্যতীত সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইত।*

* *Cf.* Ram Mohun Roy and the Progressive Movements in India, p. 271.

দেবেন্দ্রনাথ কোন্ তারিখে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, কতদিন এখানে অধ্যয়ন করেন—এ-সব বিষয়ে তাঁহার আত্মজীবনীতে কোন উল্লেখ নাই। তবে তিনি যে কিছুকাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টারে' হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্ত রেজিষ্টার (পৃ. ৪১৭) লেখেন:

"Tagore Debendranath, Maharshi:

Entered Hindu College, shortly after the resignation of Derozio, 1831; left while in the 2nd class..."

'রেজিষ্টারে'র উক্তিই মোটামুটি ঠিক বলিয়া মনে নয়। ১৮৩০ সনে এংলো-হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, পর-বৎসরের আরম্ভেই দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া থাকিবেন। এই বৎসর ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কর্ম্মে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। ইহার পর কিছুকাল যাবৎ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন মত-উদ্দীপক শিক্ষা যাহাতে ছাত্রদের না দেওয়া হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন। মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ তিন বৎসর হইতে চারি বৎসর কাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেজের উন্নতিকল্পে পিতা দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা সুবিদিত। তিনি শুধু পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না, নিজেও ইহার ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার সদস্য-পদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩, মার্চ মাসে কমিটির অন্যতম সদস্য লাড্লিমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হেতু যে পদ শূন্য হয়, তাহাতেই তিনি সদস্য নিযুক্ত হন।* দ্বারকানাথ মৃত্যুকাল পর্যান্ত (আগষ্ট ১৮৪৬) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

* রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৩৩, ১৪ মে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ কথার উল্লেখ আছে।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এংলো-হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজ উভয়ত্রই দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেন। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা ও তত্ত্ববোধিনী সভায় তাঁহাদের সহযোগিতা বিশেষ লক্ষণীয়।

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা

এংলো-হিন্দু স্কুলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাপারে সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আরম্ভেই নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেন তাঁহারা যে-সকল সভা-সমিতি বা বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন, তাহাতে যে শুধু নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতেছিলেন তাহা নহে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই এ সমস্ত মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং মাতৃভাষারই ভিতর দিয়া আলাপ-আলোচনা চালানো কম সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে। এংলো-হিন্দু স্কুলের তৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ১৮৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ একটি সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সভা-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানপত্রখানি প্রচারিত হয়ঃ

> আমাদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চ্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৭ই পৌষ [১৭৫৪ শক] রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত রাজা

রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সভার অধিবেশন হইল। সভার নাম ধার্য্য হইল 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা', এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় যথাক্রমে ইহার সম্পাদক ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের তখন বয়স মাত্র পনর বৎসর। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ছাত্রমহলে নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই সকলেই একবাক্যে তাঁহার উপরে সম্পাদকীয় গুরু ভার অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার ও উন্নতি বিষয়ে সভায় একটি বক্তৃতা করেন। বঙ্গভাষার অনুশীলন-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই সভার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। ইহার প্রথম অধিবেশনের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা।—১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুল নামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।

প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানন্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই। অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমাদিগের অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহারদিগের সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা

হইতে পারিবেক এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুত জয়গোপাল বসু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে উত্তমরূপে ইহার নির্ব্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা রাখা আমার ন্যায্য বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন যে প্রতি রবিবারে দুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্য-গণের অনুমতি হইল, অপর সভাপতি কহিলেন যে বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোন কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতিমাসে সভাপতি পরিবর্ত্ত হইবেক কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্য না করিয়া সম্পাদন কর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া

সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন তবে তাঁহার সম্পাদন কর্ম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে ঐ পদাভিষিক্ত করিতে হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক এক মাসের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্ত হইবে না। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে···শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে প্রকার সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার সভার তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য··· কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বসু।*

এই সময়কার বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' এই সভার উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। পরবর্ত্তী অধিবেশনাদি সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১২৪-৫।

বিষয়-কর্ম্ম

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী চারি-পাঁচ বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭-৮) প্রকাশিত 'নববার্ষিকী' সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন :

> হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর ইহাঁর পিতা ইহঁকে নিজ স্থাপিত 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি' এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে ইহাঁর দুইটি শ্রেষ্ঠ বিষয়ে অনুরাগ জন্মে ; ইনি সঙ্গীত এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে, ১৭৬০ শকে সঙ্গীত শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতেও প্রবৃত্ত হন এবং অবিলম্বে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেন। (পৃ. ২২১)

দ্বারকানাথ ঠাকুর সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বাধীন-ভাবে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময়ে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ব্যবসা-কর্ম্মের উপযোগী শিক্ষা দানের জন্য হিন্দু কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া দ্বারকানাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরের অধীন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে* শিক্ষানবিশি কর্ম্মে লিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রমানাথ ঠাকুরের সহকারীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।†

---

* ১৮২৯, ২৬ মে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম সভা হয় এবং ঐ বৎসর ১৭ আগষ্ট ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৮।

† আত্মজীবনী, পৃঃ ৫৯।

দ্বারকানাথের তখন বিষয়-আশয় বিপুল। তিনি স্বতঃই চাহিয়াছিলেন' তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিচালনায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়া তাঁহার গুরু ভার কিয়দংশ লাঘব করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুত্রের মনের গতি অন্য দিকে, বিশেষতঃ তত্ত্বকথা আলোচনায় তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ, তখন তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে পিতৃদেবের দুর্ভাবনার কথা সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭৮-৮০)। দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার ইউরোপ ভ্রমণকালে বিলাত হইতে দেবেন্দ্রনাথকে বিষয় সম্পর্কে ২২ মে ১৮৪৬ তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতেও এই দুর্ভাবনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। (পত্রাবলী, পৃ. ২২৩-৪)

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়-কার্য্যে কোন সময়েই তিনি আদৌ মনোযোগ দেন নাই—এ কথাও ঠিক নয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী'র আট আনার অংশীদার ছিলেন। বাকী আট আনার মধ্যে এক আনা ছিল দেবেন্দ্রনাথের এবং সাত আনা ইউরোপীয় অংশীদারদের। দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার পূর্ব্বে দ্বারকানাথ যে উইল করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর নিজ আট আনার মালিকানা স্বত্বও দেবেন্দ্রনাথকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। তিনি যদি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মপরিচালন শক্তিতে একেবারেই সন্দিহান হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তির উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল—এ কার্য্য দ্বারা তাহাই সূচিত হয়।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী'র নিজ ও পিতৃদত্ত অংশ ভ্রাতাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লন।

ইহার পর দেড় বৎসরের মধ্যেই 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী'র ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। সর্ব্বত্র বাজার মন্দা হেতু স্বদেশে ও বিদেশে বহু কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া যায়। কোম্পানীর দাদনি টাকা আদায়ের সম্ভাবনা রহিল না, পাওনাদারদের দাবি মেটান কঠিন হইয়া পড়িল। 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী', 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'* প্রভৃতি টলটলায়মান হইল এবং তাহারা একে একে কারবার গুটাইতে বাধ্য হইল। 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী' ১৮৪৭, ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া দিবার অঙ্গীকারে ঐ তারিখে কারবার বন্ধ করিয়া দিলেন, সংবাদপত্রসমূহে এই সংবাদ যথারীতি ঘোষিত হইল। ২০ জানুয়ারী ১৮৪৮ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পাঠে জানা যায়:

> The papers announce that Major Herdenson's term of partnership in the firm of Carr, Tagore and Co. having expired, and Baboo Debendernath and Greendernath Tagore being desirous of

---

* ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রকৃত প্রস্তাবে ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়। এই তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীদারদের ষাণ্মাসিক সভায় স্থির হয়:

That a Committee be appointed to recommend a plan for the immediate winding up the Bank with reference to the rights and interests of the creditors and Proprietors; and in the meantime, that all business of the Bank be suspended and that the Committee be requested to make their report within a week.

That this Meeting be adjourned until Saturday, at 10 o' clock, and that the creditors be requested to suspend all proceedings in the meantime, and be invited to attend on that day to receive the Report and Scheme of the Committee and such definite Proposition to be founded thereon as the Meeting may adopt.

২০ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে এটি সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পাদক মন্তব্যে লেখেন, "The bank is therefore at an end," অর্থাৎ এইখানেই ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

retiring from commercial business the accounts of that Firm have been closed to the 31st of the December last, to which date the two baboos will collect all debts and discharge all liabilities. Thus, the Family of Dwarkanath Tagore, has at length ceased to have any interest in the Firm which he established. (W. Ep. of News Jan, 13)

ইহার পর জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য একটি ঘরোয়া ব্যবস্থা হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কার বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ১৪৬-৯, ১৫২) দিয়াছেন। কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী সম্পর্কে সমসময়ে প্রকাশিত তথ্যাদি এবং বহু পরে দেবেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত এই বিবরণে ঘটনার তারিখ ও পারম্পর্য্য বর্ণনায় কিঞ্চিৎ গরমিল লক্ষিত হয়। ১৮৪৮, ৩১ মার্চ্চ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজ অংশীদারদের স্বাক্ষরে প্রচারিত একখানি পত্রে দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে কোম্পানীর দেনা, দেউলিয়া হইবার সময়ে এই দেনার পরিমাণ, দেউলিয়া হইবার কারণ, দেউলিয়া হইবার পর ১৮৪৮, জানুয়ারি মাসে দেনা পরিশোধের উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থা, তিন মাসের মধ্যেও সম্ভাবিত উপায়ে দেনা শোধে অপারগতা প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। গুরুত্ব বোধে পত্রখানি ৬ এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল:

MESSRS. CARR TAGORE & CO.

Calcutta, March 31, 1848.

It is with much regret that we have to inform you, that we have been compelled to suspend our payments, it not being in our power to meet several liabilities immediately falling due. We have, therefore, deemed it advisable at once to call our creditors together, to lay before them the state of our affairs, and consult with them on what is best to be done.

We beg to assure you that the necessity for this step has come upon us most unexpectedly, and arises solely, from the disappointment we have experienced in carrying out the plan of liquidation under the arrangements made in January last. We then considered that we might realize rapidly a portion of the large amount due to us by others, but in this we have entirely failed, and in three months we have not recovered more than one per cent of the amount, at which at so late a date as November 1846, the debts due to us were valued by ourselves and partners for a settlement of accounts. So unexpected has it been to us, that our late partner Major Henderson left India only two months ago, in full belief that the liquidation would go on successfully, and that there would be no necessity for a suspension of payments.

Though we have for some years past been engaged in no speculative business, beyond the carrying on of our own Indigo, silk and sugar concerns (our shipments having been confined almost entirely to their produce) still our actual losses in the last two years have been upwards of 23 lacks of rupees, arising chiefly from depreciation in the value of property. Indigo, Silk, Sugar and Saltpetre factories, Union Bank and other Joint Stock Shares ; and losses on personal debts from individuals, who within the last year have themselves been ruined, and losses in carrying on the factories.

Notwithstanding this loss, we have no hesitation in stating our confident expectation of still being able to pay in full every rupee we owe. Our liabilites, which when our late father went to Europe amounted to ninety-eight lacks of rupees have been reduced to little more than one-fourth of that amount ; and of this considerably more than one-half is on special ample security, leaving less than 11 lacks of rupees of open accounts. Our assets, even at present valuation, shew more than sufficient when realized to cover the liabilities, independent of the property in trust for ourselves, and families, our life interest in which will be available to meet any unexpected deficiency.

Full details are being made out, and will be laid before the

Meeting, which we propose to hold on Tuesday next, the 4th proximo at 4 o'clock, when we request your attendance.

Debendernauth Tagore.
Greendernauth Tagore.

P. S.—As parties jointly liable for the debts of Carr Tagore & Co. we concur in the above letter.

D. M. Gorden
Jas. Stuart.
—*Englishman, April 4.*

এই পত্র পাঠে আরও জানা যায় যে, দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে কোম্পানীর যে দেনা ছিল, কোম্পানী দেউলিয়া হইবার সময়ে তাহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র শোধ হইতে বাকী ছিল। এই এক-চতুর্থাংশের অর্দ্ধেকেরও উপর ছিল বন্ধকী ; কাজেই পাওনা যথাযথ আদায় হইলে বক্রী এগার লক্ষেরও কম টাকা পরিশোধ করিতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ট্রাষ্ট সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না।

পত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪ঠা এপ্রিল পাওনাদারদের সভা হইল। সভায় স্থির হইল যে, ট্রাষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে যোড়াসাঁকোর বসতবাটী ও তথাকার যাবতীয় সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হইবে। এই সভাতেই রবার্ট ক্যাস্‌ল জেঙ্কিন্স, এফ. আর. হ্যাম্পটন এবং রমানাথ ঠাকুর 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ইন্ লিকুইডেশন'-এর ইন্সপেক্টর ও ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় (১৩ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশিত উক্ত সভার বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ইন্ লিকুইডেশন'-এর কাজকর্ম্ম চালাইতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবেন। অতঃপর তাঁহারা নিজ ভবনে আপিস উঠাইয়া আনিলেন। কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ার আট বৎসরের মধ্যে কার্য্য সুপরিচালনার ফলে ঋণ অনেকটা পরিশোধ হইয়া যায়। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের

কৃতিত্ব অনেকখানি ছিল। ঋণ পরিশোধের সুব্যবস্থায় ঠাকুর-পরিবারের যাবতীয় ভূসম্পত্তিই বাঁচিয়া গেল।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা

১৮৩৮ সনের ১৬ই মে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র (The Society for the Aquisition of General Knowledge) কার্য্যারম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ বরাবর এই সভার এক জন সাধারণ সভ্য মাত্র ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, সহকারী সভাপতি ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রাজকৃষ্ণ মিত্র। পরিচালনা-কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি। এখানে ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই স্বদেশের হিতকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। ১৮৪৩ সালে এই সভার অধ্যক্ষগণ 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার বহু সভ্য পরে তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্য হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী সভা

১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর [১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন] তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারকানাথ ঠাকুরের যোড়াসাঁকোর বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য্য রামচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে এই সভার উক্ত নাম রাখা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা' উভয়েরই কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে 'বাংলার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগে তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :

> ইংরেজী লেখাপড়ার ফলও ঐ সময় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একটি সভা করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী, সামাজিক প্রণালী এবং শাসন প্রণালীর বিষয়ে যে সকল রচনাবলী এবং বক্তৃতা প্রচারিত করেন তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, ইউরোপীয় মত সকল ক্রমশঃ এদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।...কিন্তু আর একটি সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন —ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্য্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্ত্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে। (পৃ. ২৪-৫)

বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইহা তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরও একটি মস্ত বড় অধ্যায়। আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে তিনি এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য সমসাময়িক অন্য কতকগুলি ব্যাপারও সমধিক দায়ী ছিল। তখনকার

শিক্ষিত সমাজের স্ব-ধর্ম্মে অনাস্থা, স্ব-সংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্ষা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ছিল ইহার ঠিক বিপরীত। হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অনাস্থা, অশ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিলেন এবং পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলোচনা ও প্রচারের জন্য যত্নপর হইলেন। পরোপকার পরম ধর্ম্ম—দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ইহা ছিল মূলমন্ত্র। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্বোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ ৬৫) তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" ইহারও মূল কথা পরোপকার। নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র দশ জনকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সভার প্রথম তিন বৎসরের এবং 'প্রথম ও শেষ' সাম্বৎসরিক সভার বিবরণ তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ৬৫-৭০) বিশদভাবে দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৪ শকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহারই আগ্রহে ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা অল্পকাল মধ্যেই ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ১৭৬২ শক হইতে পরবর্ত্তী তিন বৎসরে ইহার সভ্যসংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ দাঁড়ায়: ১০৫, ১১৫, ৮৩ ও ১৩৮। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সভ্যসংখ্যা অতিদ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই আট শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালিগণের মধ্যেও তত্ত্ববোধিনী সভা কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে ভূদেববাবু উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন:

"তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষায় প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? (পৃ. ৪০-১)

তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ এই কয়টি উপায় পর পর অবলম্বন করিলেন—(১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩) শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে বারাণসীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নার্থ চারি জন ছাত্র প্রেরণ। যতই দিন যাইতে লাগিল, শিক্ষিত সমাজে সভা ততই প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরীরা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। শিক্ষিত বহু বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা খ্রীষ্টান হইলেন না, তাঁহারাও কতকগুলি বাহ্যিক দূষণীয় লক্ষণ দেখিয়া মূল হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থাই দূষিত মনে করিতেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা নিজ কৃতিত্ববলে এই উভয়বিধ স্রোতেরই গতিরোধ করিয়া দিল।

খ্রীষ্টান মিশনরীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা-প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেবকে প্রধান সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ১১৮) লিখিয়াছেন—"রাজা রাধাকান্ত দেব আমাকে বড় ভালবাসিতেন।" রাধাকান্ত দেব তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন না বটে, তবে ইহার

আদর্শের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইত, এবং প্রতি খণ্ডই তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে উপহার দিতেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা সৎকর্ম্মাদির দ্বারা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল, প্রগতিশীল উভয় শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে আত্মস্থ করিতে এবং বঙ্গ-সন্তানদের মন স্বাজাতিকতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে তত্ত্ববোধিনী সভার কৃতিত্ব অসামান্য। সভার কার্য্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'ব্যবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্মসরকার, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ স্মরণীয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার উপায়ত্রয়

(১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। ইহার বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র হইতে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, তাহার ফল,—আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি

তাঁহার পুত্র ;—এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।

এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয় অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না ; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর ; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস

আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।

ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ;—আকাশ পাতাল প্রভেদ!

ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। (আত্মজীবনী পৃ. ৭৫-৬)

এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞদের লইয়া গ্রন্থ-কমিটি গঠন করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক হইলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনস্বী সাহিত্যিকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ-কমিটির সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে যাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত বা পুস্তকাকারে ছাপা হইত। ধর্ম্ম-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, শাস্ত্রানুবাদ,

সমাজনীতি এবং কখন কখন রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনাদিও প্রকাশিত হইত। সহজ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় গুরু বিষয়ের আলোচনার পথপ্রদর্শক এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

এক হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে-যুগের চিন্তানয়ক বলা চলে। লোকহিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল আমরা ইহার আলোচনার মধ্যে প্রাপ্ত হই। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনরীদের আক্রমণ হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মীদের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষে, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দিয়াছিল।

(৩) পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যার চর্চ্চা খুবই সামান্য ছিল। বঙ্গদেশে যাহাতে বেদচর্চ্চা সুষ্ঠুরূপে আরম্ভ হয়, সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ অবহিত হইলেন। ১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৪৪-৪৫) আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং পর বৎসর তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রমানাথ ভট্টাচার্য্য বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে প্রেরিত হন। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যের মধ্যে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রমানাথ ঋগ্বেদ, বাণেশ্বর যজুর্ব্বেদ, তারকনাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্দ্র অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। টীকাসমেত উপনিষদ-সাহিত্যও ইঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কাশীধামের বেদাধ্যয়ন ও বেদ-চর্চ্চা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে একবার তথায় গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে আনন্দচন্দ্র বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানীর পতন হইলে দেবেন্দ্রনাথ ব্যয়সংকোচ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ১৮৪৮ সালে অপর তিন জনকেও কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ইহাদিগকে স্বমত-পরিপোষক শাস্ত্রাদি গ্রন্থের সার-সংগ্রহের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারকল্পে দেবেন্দ্রনাথ আরও যে একটি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও এখানে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজ হইতে সদ্য-উত্তীর্ণ (১৮৪৫) রাজনারায়ণ বসুকে দিয়া তিনি ১৮৪৬ সাল হইতে উপনিষদের ইংরেজী তর্জ্জমা করাইতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে উচ্চাঙ্গের হিন্দুশাস্ত্রের মূলসমেত তর্জ্জমা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করিয়া দেশ-বিদেশে ইহার চর্চ্চা সম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়েও অগ্রণীদের মধ্যেই তাঁহার স্থান।

এ প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে বেদ-প্রচারে বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পুথিসমূহের পাঠ মিলাইয়া ঋগ্‌বেদের একটি প্রাথমিক সংস্করণ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বিলাতে এই সময়ে কোম্পানীর আনুকূল্যে ঋগ্‌বেদ-প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হইলে সোসাইটি এ সংকল্প পরিত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৪৮ সনের আগষ্ট মাস হইতে ঋগ্‌বেদের সূক্তের মূলসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশে রত হন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

ধর্ম্মমত বিবর্ত্তন ও তত্ত্ববোধিনী সভা

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত বিবর্ত্তনের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ার বিশেষ সম্পর্ক আছে। রামমোহন রায়ের সহিত শৈশব হইতেই দেবেন্দ্রনাথের সংস্রব ছিল। তাঁহার স্কুলের শিক্ষায় দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যৌবনের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইবার পর তিনি রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ কি ভাবে বেদ-বেদান্তের অনুরাগী হইয়াও ১৮৪৩, ২১ ডিসেম্বর (১৭৬৫ শক, ৭ই পৌষ) ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর তিনি পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় রত হইলেন।

পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াও প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ *India and India Missions* পুস্তক প্রকাশ দ্বারা পৌত্তলিক অপৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের সকল অঙ্গের উপরই আক্রমণ চালান। ওদিকে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্ম্মপ্রচার পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন।* ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলিই ১৮৪৫ সনের শেষ ভাগে *Vedantic Doctrines Vindicated* নামে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

---

* "The Transition-States of the Hindu Mind"—*The Calcutta Review* for January-March, 1845.

> In our endeavours to spread a knowledge of our ancient theological doctrines, we declare our firm conviction in them to be the only inciting principle by which our exertions are guided. We will not deny that the Reviewer is correct in remarking that we "consider the Vaids and Vaids alone, as the authorized rule of Hindu theology." They are the foundation of all our belief, and the truths of all other Shasters must be judged of, according to their agreement with them. Even the Smrities which are almost entirely founded on the principles inculcated in the Vaids, must bow to their authority, wherever there is the slightest possibllity of mistake or misconstruction ; and for this reason, that the Shrooties were uttered by inspiration. while the Smrities contain only an exposition of their precepts. Durshuns are no more than philosophical systems, and do not come within the proper sense of religion. What we consider as revelation is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy Scripture treating of the final dispensation of Hinduism, from what is called the Vaidant.

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :

> ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কি না, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ ছিল বলিয়া তাহা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। (পৃ. ৬৫)

১৮৪৬ সনের শেষার্দ্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বাদানুবাদ, অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বিতর্ক ও বিচার এবং বেদের ভিতরকার বিষয়বস্তু সম্যক্ অবগতির ফলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস টলিয়া

যায়। তবে এই বেদ ও ইহার শিরোভাগ উপনিষদ্ হইতেই আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ উদ্ধার করিয়া তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলন করিলেন। ইহা সত্ত্বেও সমগ্র বেদ ও উপনিষদের প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, নিম্নের উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ঃ

ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদ্‌কে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্রশাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ ; তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তর খণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি-নিহিত সকল স্বর্ণ ই যে বাহির হইয়াছে, তাহাও নহে। বেদ-উপনিষদ্-রূপ খনির মধ্যে এখনও কত সত্য কত স্থানে গভীর রূপে নিহিত আছে। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সত্যকাম ধীরেরা যখনই অনুসন্ধান করিবেন, তখনই ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং তাঁহারা সেই খনি হইতে

সেই সকল উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন। (আত্ম-জীবনী, পৃ. ১৮০-১)

"ব্রাহ্মধর্ম্ম" ২য় খণ্ডও প্রকাশিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের দুই অঙ্গ, একটি উপনিষদ্ আর দ্বিতীয়টি অনুশাসন।" অর্থাৎ, "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে তিনি উপনিষদ্ আর দ্বিতীয় খণ্ডকে অনুশাসন বলিতেছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ড মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। দেবেন্দ্রনাথের কথায় "এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের ভার তত্ত্ববোধিনী সভার উপর ছিল। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন। সমাজে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথ যে-ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিতেছেন, তত্ত্ববোধিনী সভা সে-ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও দেবেন্দ্রনাথের মনোমত ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ প্রকাশে বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাদির বিচারক গ্রন্থাধ্যক্ষসভার উপর চটিয়া গিয়া তিনি ১৭৭৫ শক, ২৬এ ফাল্গুন (১৮৫৪, মার্চ্চ) রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লেখেন ঃ

গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধবমণ্ডলী মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। ইহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, ভক্তির প্রগাঢ়তা, উৎসাহের প্রবলতা, ভাবের সরলতা দীপ্যমান রহিয়াছে। এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ

হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই। (পত্রাবলী, পৃ. ১০-১)

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রভাবশালী সভ্যেরা 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়া হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, "যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।" দেবেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে আরও লেখেন:

> এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। (আত্মজীবনী, পৃ. ২২০)

এইরূপ মনোভাব লইয়া নীরবে ও নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মসাধনোদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৬, ৩রা অক্টোবর হিমালয় যাত্রা করিলেন। এখানে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া তিনি ১৮৫৮, ১৫ই নবেম্বর নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তখনকার তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দেবেন্দ্রনাথ-অবলম্বিত উপায়সমূহ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ-নির্দ্দেশিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তত্ত্ববোধিনী সভা কিছুকাল যাবৎ বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই সভা ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫০, মে) তুলিয়া দিলেন। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন:

দেবেন্দ্র বাবু স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের নিমিত্ত আর তত্ত্ববোধিনী সভা রাখিয়া লোকদিগের মতামত লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন যে কার্য্যতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণকে পাওয়া যাইতেছে ইহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের মতামতের জন্য বিবাদের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, কারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজে মতামতের জন্য বিরোধ রাখিয়া যান নাই। এই সময় অর্থাভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্র বাবুর পরামর্শ ক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে ১৬৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভা লীন করিয়া দিলেন। উক্ত ১৭৮১ শকে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি হইয়া প্রকাশিত হইল। (প্রবাসী—পৌষ, ১৩৩৪)

এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশ বৎসর যাবৎ স্বকার্য্য সগৌরবে সম্পাদন করিয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইল।*

---

* সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরিত নিম্নের বিজ্ঞপ্তিতে যে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের উল্লেখ আছে, ইহাই ইহার শেষ সাম্বৎসরিক সভা। এই সভাতেই তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত করার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া থাকিবে :—

"সাম্বৎসরিক সভা।

"আগামী ২৬ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক। তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদয় কার্য্যবিবরণ সাধারণরূপে সভ্যগণকে অবগত করা যাইবেক এবং ১২ নিয়মানুসারে তৎকালে অন্য যে কোন কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক,

শিক্ষা-বিস্তারে

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

স্ব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য স্থরু করিয়া দেন। ইহা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ইহার আনুকূল্যে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। নানা দিক্ হইতেই এই পাঠশালাটির বৈশিষ্ট্য ছিল। পাঠশালা স্থাপনের আয়োজনের কথা অবগত হইয়া 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' ১৮৪০, ৩রা জুন তারিখে লেখেন :

> *A New Sohool.* We have been given to understand that a new school having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country, is about to be established in Calcutta, under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala. The boys will further receive religious education which is a new feature in the system of native instruction. It is said that new books suited to the capacities of youth are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendranauth Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore.

এই উদ্ধৃতির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে তৎকালীন শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৩৫

তাহাও যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইবেক অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

সম্পাদক"।

সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই বিধান দিয়া যান যে, সরকার-পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর মাধ্যমেই এদেশবাসীকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। আবার, সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান। এসব কারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই অতঃপর সাধারণের বেশী ঝোঁক পড়িল। সরকারী বিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে ইংরেজীর চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এদেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও কলিকাতায় এবং মফস্বলে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলা পাঠশালা এবং বাংলা শিক্ষা, দুইয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। শিক্ষার এই ত্রুটি কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দুকলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন (১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারি)। উপরের উদ্ধৃতিতে যে 'new College Patsala'র কথা আছে তাহাই এই বাংলা পাঠশালা। বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য।* দেবেন্দ্রনাথও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন।

কিন্তু হিন্দুকলেজ পাঠশালা হইতে ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকতর। ঐ সময়ে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজী শিক্ষায় ভারতবাসীদের আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ লইলেন এবং

---

* The primary objects contemplated in the establishment of the Patsala were to "provide a system of National Education, and to instruct Hindoo youths in Literature and in the Science of India and Europe, through the medinm of the Bengalee Language."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1843-44.* p. 19.

ইংরেজী শিক্ষার ছলে তাহাদের সন্তানদের খ্রীষ্টতত্ত্বই বেশী করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি সরকারী, কি দেশীয়, কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়েই ধর্ম্ম-শিক্ষার রেওয়াজ ছিল না। এজন্য মিশনরীদের প্রদত্ত শিক্ষার বিধর্ম্মিপ্রভাব প্রতিরোধের কোন উপায়ই রহিল না। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া এক দিকে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিতে এবং অন্য দিকে খ্রীষ্টানী শিক্ষার কিয়ৎ-পরিমাণে গতিরোধ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

১৮৪০, ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বৎসরের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কলিকাতার শিমলা পল্লীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া লইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা উভয়েরই কার্য্য তথায় সমাধা হইতে থাকে। সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন বাংলা শিক্ষার অনাদর হেতু কলিকাতার স্কুল-বুক সোসাইটি সংস্কৃত পদ্ধতিতে নূতন করিয়া বাংলা পুস্তক রচনা করাইতে তেমন আগ্রহশীল ছিলেন না। হিন্দুকলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ নিজ পাঠশালার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাও সরকারী শিক্ষা-কমিটির প্রতিবন্ধকতায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাবধারার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাবধারা যাহাতে পাঠ্য পুস্তকে স্থান না পায়, সে-দিকে শিক্ষা-কমিটির শ্যেনদৃষ্টি ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঠ্য পুস্তক রচনার ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-কমিটি এইরূপ নিয়ম

করিলেন যে, অগ্রে সকল পাঠ্য পুস্তকই ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, এবং তাহা অনুমোদিত হইলে তবে বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করাইয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করা চলিবে।* সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহারোপযোগী সকল পুস্তকই তখন এইরূপে 'সেন্সর' (censor) করিয়া লওয়া হইত। দেবেন্দ্রনাথ কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পাঠ্য পুস্তক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি বাংলা ভাষায় একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলাতেই পাঠ্য পুস্তক লিখিলেন। পাঠশালায় এই সব পুস্তকই অধীত হইতে লাগিল; বলা বাহুল্য, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মতত্ত্বও পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতায় তিন বৎসর (১৮৪০ জুন—১৮৪৩ এপ্রিল) প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উদ্দেশ্য, কার্য্যক্রম এবং কি কারণে কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে কলিকাতা হইতে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন, সবই তত্ত্ববোধিনী সভার ১৮৪৩-৪৪ সালের ইংরেজী কার্য্য-বিবরণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশের মর্ম্ম এখানে দিলাম :

> তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ থাকায়, এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন যেখানে কোমলমতি বালকদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক তথ্যাদিও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।...

---

* *General Report on Public Instruction* etc., for 1842-43, pp. 26-27; and *Ibid.* for 1843.44. pp. 2-3.

সভা-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে ১৮৩০ সালেই কলিকাতায় একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। সভ্যগণের মতানুযায়ী প্রথম দিকে বাংলা ও সংস্কৃতের মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রদের উপস্থিতির সময় এরূপভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল যে, তাহারা নগরীর অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষারও সুবিধা পাইত। পাঠশালা প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। ইহাতে কিন্তু ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল না। কারণ, অতটা পরিশ্রম ছাত্রদের শরীরে কুলাইত না। পাঠশালার শ্রেণীগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল। সুতরাং এ ব্যবস্থার সংশোধন উদ্দেশ্যে স্থির হইল যে, বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্যও কিছু সময় দেওয়া হইবে, অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইবে। সভার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সাধারণের নিকট হইতে যেরূপ অতিরিক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া গেল, তাহাতে সভ্যগণ সত্বর তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইলেন। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৬৬ শক, পৃ. ১০৩-৪)

কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিবরণে আরও বলেন যে, কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় যথেষ্ট; এরূপ ক্ষেত্রে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠার মত অর্থ-সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে, পল্লী অঞ্চলে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সে স্থলের একটি সত্যকার অভাব পূরণ হয়, এবং পল্লীবাসীদের প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাও কথঞ্চিৎ সাধিত হইবার সুযোগ মিলে। এইজন্য তাঁহারা হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটি গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত করাই সাব্যস্ত করেন।

পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭৬৫ শক, ১৮ই বৈশাখ (১৮৪৩, ৩০ এপ্রিল) হুগলী জেলার বংশবাটি গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় 'উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা'র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতা ত্যাগে অসমর্থ হওয়ায় ঐ স্থানেরই অধিবাসী শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বংশবাটী তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা-দিবসে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। এই সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন ঃ

> তত্ত্ববোধিনী…সভার প্রতিজ্ঞা যে আমারদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রচলিতা হয়, এই উদ্দেশ্যে বিবিধ উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে…,
>
> কেবল শাস্ত্রের দৃষ্টি অভাব জন্যই অনেকে এই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেছে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে যাহারা এইক্ষণে শাস্ত্র মানিতেছেন না তাঁহারদিগের শাস্ত্র জানা থাকিলে অবশ্য মানিতেন। এইক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার দ্বারা চতুর্দ্দিকে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, অতএব জ্ঞানিরদিগের শাস্ত্র আমারদিগের চিরকালের যে বেদান্ত শাস্ত্র, যাহা গুপ্ত থাকা জন্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তাহাই এইক্ষণে প্রকাশ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ না হইয়া নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি এইক্ষণে অবলম্বন

করিতেছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে ?

স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।…(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৬৫ শক, পৃ. ৫-৬)

অক্ষয়কুমার দত্ত অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন ঃ

আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না*—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে

* এ স্থলে ১৪ই কার্ত্তিক ১২৮০ সংখ্যক "সাধারণী"তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি বৈর' শীর্ষক প্রবন্ধ স্মরণীয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।*

বংশবাটিস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘ ১৭৬৬ এবং মাঘ ১৭৬৭ শকে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, "এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে,…।" পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণীতে কতজন ছাত্র কি কি বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করিত, তাহাও আমাদের জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এই বৎসরের বিবরণ হইতে তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

প্রথম শ্রেণী ॥ ৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ : কঠোপনিষৎ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক। তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ব্যাকরণ। পদার্থবিদ্যা। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ : Reader No. 4. Poetical Reader No. 2. Grammar. History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী ॥ ১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ : ব্যাকরণ। জ্ঞানার্ণব। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ : Reader No. 3. Poetical Reader No. 1. Grammar. History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী ॥ ২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ : বর্ণমালা ২য় ভাগ। মনোরঞ্জন ইতিহাস। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ : Reader No. 2. Spelling No. 2.

চতুর্থ শ্রেণী। ২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ : নীতিকথা ২য়

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন ১৭৬৫ শক, পৃ. ১১-২।

ভাগ। বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No 1. Spelling No. 2.

পঞ্চম শ্রেণী॥ ২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: নীতিকথা ১ম ভাগ। বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী। ৩৬ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ: Easy Primer.

পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপকারিতা সম্বন্ধে এই বিবরণে নিম্নরূপ লিখিত হইয়াছে:

এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপনা করা যাইতে পারিবেক।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি এবং ছাত্রদের শিক্ষার উৎকর্ষ সে-যুগে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন কি, সরকারী শিক্ষা-কমিটিও (Council of Education) ১৮৪৫-৬ সনের কার্য্যবিবরণে এই পাঠশালার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কমিটি 'হুগলী কলেজ' প্রসঙ্গে (পৃ. ৭৭) লেখেন:

Native education in the district. There is an English school at Bansberia, an ancient seat of Hindoo learning, supported

by Baboos Debendronath Tagore and Ramaprasaud Roy, the sons of distinguished fathers.

It is established for the diffusion of Vedantic principles, but is conducted by an ex-student of this [Hoogly] College, who is himself not of that persuasion.

ইহার পরও প্রায় তিন বৎসর কাল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা অতিশয় কৃতিত্বের সহিত চলিয়াছিল। কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করিয়া দিলে পাঠশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দ্বারা পাঠশালা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। এই সুযোগে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ফ্রি চার্চ্চ মিশনের পক্ষে ঐ একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপনে লাগিয়া গেলেন। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' (৬ এপ্রিল ১৮৪৮) লেখেন :

The Chundrika informs us that the school of the Tattwabodhini Sabha, that is of the Vedanta Association, having been closed at Bansberiya, the Free Church Mission is about immediately to open a seminary there for instruction in English and Bengalee. We believe it has already been commenced.

ইহার মাসখানেক পরে, ৪ঠা মে দিবসের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'য় এ সম্পর্কে ২০এ এপ্রিলের একখানা পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক জানান যে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার স্থানে একটি মিশনরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে মহদুপকারক একটি স্বদেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবসান হইল।

বারাকপুর পাঠশালা ও সুখসাগর স্কুল

দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয়ে বারাকপুরেও একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহার সম্বন্ধে ২ এপ্রিল ১৮৪৬ দিবসের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'য় নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

Lately at Barrackpore a *patshalla*, exactly in the system and the rules observed in the Government *patshalla* of Calcutta, has been established under the immediate munificent auspices of Baboo Debendranauth Tagore and other liberal native gentlemen. Children from villages adjacent have flocked to this institution, the more because they shall receive both their instruction, and books and papers, etc., without any charge whatsoever. It is placed under the superintendency of Baboo Gooroodass Chatterjee, master of a private English school there. With the sincerest wishes for the prosperity and long duration of this infant *patshalla* (*W. Ept. of News.* Wednesday, April 1.)

এই বৎসরে সুখসাগরেও (নদীয়া) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার মুন্সেফ, দেবেন্দ্রনাথের মতানুবর্ত্তী কাশীশ্বর মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়টিরও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টিত হন :

Every year prizes of valuable books were awarded to the best students of the English school, who were previously examined of the Secretary, when Baboo Debendranath Tagore was good enough to come up from Calcutta, to preside on the occasion, and to make some presents of valuable books to the best of the pupils. He was wont to make monthly contribution in support of the school. The noble and divine principle of Baboo Debendranath Tagore has all along been to do good by stealth and blush to find it fame.—*The late Govindram Mitter's family* by Kasiswar Mitra, 1869, p. 53.

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়

কলিকাতাস্থ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ইহাকে শুধু একটি বিদ্যালয় বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে সে

সময়ের একটি আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনেরই প্রতীক। গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা নানা ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জয়গান করিতে থাকেন। ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া তাঁহারা হিন্দুসন্তানদের খ্রীষ্টান করিতেও লাগিয়া গেলেন। আর এ সব বিষয়ে অগ্রণী হইলেন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত ডাফ প্রমুখ মিশনরীদের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে আরম্ভ করেন। একটি বিশেষ ঘটনায় তিনি এই সব প্রতিরোধকল্পে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মজীবনীতে এই ঘটনা এবং উক্ত অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১০২-৬)।

দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী যাইয়া, এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু মিশনরীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই ছেলেদের খ্রীষ্টানী শিক্ষার ও খ্রীষ্টান করিবার কেন্দ্র, সে হেতু হিন্দুদের পক্ষে এমন সব অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যাহাতে দরিদ্র ছাত্রগণ অক্লেশে সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টা-যত্নে প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব এবং নব্যপন্থী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি এই একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দকে লইয়া ঘরোয়া আলোচনার জন্য ১৮৪৫, ১৮ই মে জোড়াসাঁকোতে একটি বিশেষ বৈঠক হয়।* পরবর্ত্তী ২৫এ মে শিমলাস্থ রাজাবাবুর (মতিলাল শীলের) ভবনে রাজা রাধাকান্ত

* *The Friend of India* for May 22, 1845. "Contemporary Selections." P. 327.

দেবের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইল। সভার বিস্তৃত বিবরণ এ সময়কার ইংরেজী বাংলা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (আষাঢ় ১৭৬৭ শক) এই সভার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এই মন্তব্য হইতে তথ্যাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে বিদ্যালয়ের পরিচালন-কমিটির পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে :

> আমরা গত মাসের পত্রিকাতে এদেশীয় দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে এতন্নগরস্থ সাধারণ হিন্দুবর্গের তাহাতে পূর্ণ উৎসাহ ও সম্যক্ প্রযত্ন যে হইয়াছে, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এবিষয়ের বিবেচনার জন্য গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ [২৫ মে] রবিবারে শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল; তাহাতে এই নগরস্থ ধনি নির্দ্ধন, মধ্যবর্ত্তি প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক, এবং তাহার কর্ম্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব সভাতি হইলেন; শ্রীধুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন; শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন।

এই পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক। এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা মূলধন, এবং চারি শত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রচুর ধন্যবাদ যোগ্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ সহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং প্রতীক্ষা করি, যে সাধারণের উৎসাহ ও যত্নক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য-দ্বারা মাসিক সহস্র টাকা অবিলম্বে সংগৃহীত হইবেক। বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাতশূন্য হইয়া এবিষয়ের সুসিদ্ধি জন্য যে প্রকার যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।

মাত্র পক্ষকালের মধ্যেই চল্লিশ সহস্র টাকা এককালীন দান এবং চারি শত টাকা মাসিক চাঁদর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। দশ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে কিছু বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য মতিলাল শীল মহাশয় উক্ত সাধারণ সভাতেই ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজেই সত্বর একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, এবং এতদর্থে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। পরবর্ত্তী ২রা জুন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও যে দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন ছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর মাসখানেকের মধ্যেই হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে ২৫৭৫৩্ টাকা সংগৃহীত

হইল।* এই আন্দোলনের তরঙ্গ মফঃস্বলেও গিয়া পৌছিল। মেদিনীপুরবাসীরা কলিকাতার এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর উদ্যোগ আয়োজনের পর ১৮৪৬, ১ মার্চ্চ তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় বা "Hindu Charitable Institution" প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (৫ মার্চ্চ ১৮৪৬) নিম্নরূপ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটির মধ্যেও কিঞ্চিৎ শ্লেষ রহিয়াছে:

> The Hindoo Charitable Institution, which was set on foot with the view of emptying the Missonary Seminaries, after ten months of gestation, happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March. During this long period of talk and inaction the Missionary Seminary has been revived. and now includes 800 scholars. A number of respectable natives assembled last Sunday; Baboo Asootosh Dey was called to the chair. Baboo Debendranauth Tagore stated that the object of the Institutien was to give the benefits of a sound and liberal education to the natives which might benefit them in after life. The Missionary institutions, he observed, have in view the object exclusively of conversion to Christianity, and do not contribute to the beneficial end which the meeting aimed at. Baboo Okhoy Koomar Dutt offered an excuse for the small subscription of forty thousand Rupees made to this object. He did not remember to say, that a sum of Three Lakhs was promised on the first outbreak of opposition, and that the rich Hindoos of Calcutta, since this plan was proposed, have spent twice Three Lakhs in poojahs and festivities, (*W. Ept. of News*, March 3.)

ইহার এক মাস পরে ৭ এপ্রিল ১৮৪৬ সংখ্যায় 'সম্বাদভাস্কর' লেখেন:

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ : ১৬৭ শক, পৃ, ২০২।

হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়।—বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের যে বৈঠকখানাতে জালরাজার বাসা ছিল ঐ বৈঠকখানা আপাতত হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয় হইয়াছে, তথায় ৫৫০ বালক বিদ্যাশিক্ষা করেন, সম্প্রতি ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানার্থ এতদ্দেশীয় পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দুই জন পণ্ডিত বঙ্গ ভাষা শিক্ষাদান করেন, শুনিলাম শিক্ষকেরা উত্তমরূপে পরিশ্রম করিতেছেন, এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু হরিমোহন সেন প্রায় সর্ব্বদা বিদ্যাগারে গিয়া শিক্ষাদানের অনুসন্ধান করেন, ইহাতে সুরব হইয়াছে—শিক্ষা ভাল হইতেছে অতএব আমরা ভরসা করি যাহাতে এই সুরব চিরকাল থাকে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ রূপে তাহার চেষ্টা করিবেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইলেন, তাঁহার বেতন হইল যাট টাকা। তিনি তখন যুবক। তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৫ সালে কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া বাহির হন। রাজনারায়ণ বসুও এই বৎসর উক্ত কলেজের পাঠ সমাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের দুই জন ভিজিটর বা পরিদর্শকও নিযুক্ত হইলেন যথাক্রমে স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূদেববাবু এক বৎসরের কিছু অধিক কাল এখানে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে আরও দুই জনের নাম পাওয়া যায়—বৃন্দাবনচন্দ্র বসু এবং তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইহার পরিচালনা সম্পর্কে মতান্তর হওয়ায় এই তিন জনই একই সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।*

* ভূদেব-চরিত, প্রথম ভাগ, পৃ, ১১৯-২১।

ভূদেব বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিবার পরও দুই বৎসর যাবৎ ইহার কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের জানুয়ারিতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হইলে ইহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নামে এই ব্যাঙ্কে ইহার যাবতীয় অর্থ গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্ক পতনের পর ইহা ফিরিয়া পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। ও দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান উৎসাহী পৃষ্টপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি তো তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা একেবারে তুলিয়াই দিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা, এই সময় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের পরও কয়েক বৎসর বিদ্যালয়টি চলিয়াছিল। ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদও দেখা যাইতেছে, ইহার মূলধন ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু তখন বিদ্যালয়টির অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল।*

* "*The Hindu Charitable Institution*—When our countrymen with a show of unanimity and national spirit got up a charitable institution for the express purpose of affording means of English education to the children of indigent and helpless Hindus, in order to deliver them from the necessity of sending them to the Missionary schools, it raised in us a thrilling hope that would be an efficient means of imparting English education to hundreds of boys, without their incurring the risk of a loss of caste and religion, in asmuch as we were assured that in the existence of an English school under Hindu management pauper Hindus but of respectabillty will no longer look to the Missionary schools as the only means for the education of their children. And these, we concluded as a matter of course, will gradually decline. and so will the propagators of the Gospel be deprived of one of the most powerful agencies of conversion. But from what we see of the state of the Hindu School at present, we have not the remotest hope of its

১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী বিবরণে (Appendix A, p. 84) দেখিতেছি, ১৮৬০, ডিসেম্বর মাসে গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দু চেরিটেব্‌ল ইনষ্টিটিউশন হইতে এক জন ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পাণিহাটীস্থ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়টির সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল। ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ 'সম্বাদ ভাস্করে' (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯) প্রেরিত একখানি পত্রের মধ্যে পাইয়াছি। উহাতে আছে :

> গত ২৭ জানুয়ারি বেলা দুই ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরি মহাশয়ের পানিহাটীস্থ নূতন উদ্যানের অট্টালিকাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রথম সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আত্মীয়বর্গ বিদ্যালয় হিতৈষী বহু ভদ্রব্যক্তি এবং কলিকাতাস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত মহাশয় এবং অন্যূন চত্বারিংশৎ সংখ্যক মান্য ইংরাজ ও বিবি লোকের সমাগম হয়…বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি মহাশয়েরা সকল শ্রেণীর বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন সকলের আশু উত্তর

efficiency as to the purpose for which it was established. It is in existence but in name, its only resource is a paltry sum of thirty thousand rupees, which yields a monthly interest of one hundred and thirty rupees. This sum barely suffices to entertain a few native masters and to educate a handful of pupils....Ever since its institution it was never subjected to a general examination, or the pupils rewarded publicly, hence in its present state the little good that it is capable of doing, is lost for want ot proper care and superintendence."—*Bengal Hurkaru*, September 1851. ('সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে অনূদিত)

পাইয়া পরম সন্তোষের সহিত ছাত্রগণের এবং তাহারদিগের শিক্ষকদিগের প্রচুর প্রশংসা করিলেন…তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল শ্রেণীর যোগ্য পাত্র ছাত্রগণকে বহুমূল্য অনেক পুস্তক প্রদান করেন উক্ত বিদ্যালয়ে শতাধিক ছাত্র পাঠ করিতেন তন্মধ্যে ৩৪ জন ছাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন একাদশ মাস হইল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে—বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বাবু জগচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রমাদির বিশেষ ধন্যবাদপূর্ব্বক পানিহাটীস্থ ও তন্নিকটস্থ ভদ্রলোক সকল যাঁহারা ঐ পরীক্ষোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসাহ পূর্ব্বক সযত্ন হইতে কহিলেন এবং ছাত্রদিগকে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া সুচারুরূপে বক্তৃতা দিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

বিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতার মূল-প্রতিষ্ঠানটি সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ না হইলেও হিন্দুসমাজ ইহাদ্বারা আত্মস্থ হইতে যে শিক্ষালাভ করেন, তাহা অতুলনীয়। ইহার ফলেই সর্ব্বত্র খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ১০৬) বলিয়াছেন,—"সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরীদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

হিন্দুকলেজ ও সরকারী শিক্ষা-নীতি

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৩ সন হইতে ১৮৪৬ সন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর

এবং রামকমল সেনের মৃত্যুতে কলেজের অধ্যক্ষ-সভায় দুইটি সদস্য-পদ শূন্য হয়। এই পদে যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আশুতোষ দেব সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বিষয়, ১৮৪৭-৪৮ সালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ. ৩৪) নিম্নোক্তরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ;—

> "Baboos Debendranath Tagore and Ashutosh Dev, have also been elected Members of the Committee, in succession to Baboos Dwarkanauth Tagore and Ram Comul Sen deceased."

১৮৫৪, ১০ই মে হিন্দু কলেজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তখন কলেজের স্কুল-বিভাগ হিন্দু স্কুল এবং কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ শেষ দিন পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন।

১৮৪০-৪১ সালে গভর্ণমেণ্ট. হিন্দু কলেজ ও শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সরকারী শিক্ষা-কমিটির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া দেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুকলেজ পরিচালনায় সরকারী কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথ যত দিন সদস্য বা অধ্যক্ষ ছিলেন, তত দিন শিক্ষা-কমিটি ও কলেজের অধ্যক্ষ-সভা উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে বিরোধ ও মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, খ্রীষ্টান মিশনরী ও হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৪৮ সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের অষ্টম শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে স্বভাবতঃই হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁহাদের প্রতিভূস্বরূপ কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং যাহাতে কৈলাসচন্দ্রকে শিক্ষকতা-কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয়, সেই মর্ম্মে শিক্ষা-কমিটির নিকট দাবি করিলেন। শিক্ষা-কমিটি প্রথমে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত

তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল।

ইহার পর-বৎসরই (১৮৪৯) এইরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটে। এবারে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ পত্র দ্বারা কলেজ-সম্পাদক রসময় দত্তকে জানাইলেন যে, গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক জন ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মূল নিয়মানুসারে কোন খ্রীষ্টান ছাত্রকে যে কলেজে রাখা চলিতে পারে না, সম্পাদক একটি সার্কুলার দ্বারা অধ্যক্ষ-সভার ভারতীয় ও ইউরোপীয় সকল সদস্যেরই সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গুরুচরণ সিংহ কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু এ বিষয় লইয়া শিক্ষা-কমিটি ও অধ্যক্ষ-সভা উভয়েরই সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্‌ন এবং অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম প্রাচীন সভ্য রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। শেষ পর্য্যন্ত রাধাকান্ত দেব বিরক্ত হইয়া অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ করিলেন (জুন ১৮৫০)।

শিক্ষা-কমিটি ও কলেজের অধ্যক্ষ-সভা, তথা হিন্দুসমাজের মধ্যে এইরূপ আর একবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় ১৮৫৩ সালের প্রথমে। এই সময় কলেজে হীরাবুলবুলনাম্নী এক জন পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভর্ত্তি করা হয়। ইহাতে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাহাদের পক্ষে অধ্যক্ষ-সভাও ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তখন সরকারী শিক্ষা-কমিটিই হিন্দুকলেজের সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। তাঁহারা এ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন হিন্দুসমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ১৮৫৩, ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ-সভার অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যকে যখন এই নূতন কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত

হইতে দেখি, তখন উভয়ের মধ্যে আন্দোলন কিরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। রাধাকান্ত দেব ইহার পূর্ব্বেই হিন্দুকলেজের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তিনি নূতন কলেজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি হইলেন। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেবপ্রমুখ নেতৃবর্গ হিন্দুকলেজ-কমিটির সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই কলেজেরও অধ্যক্ষ-সভায় আসন গ্রহণ করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠায় ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি এবং মতিলাল শীলের শীলস্ ফ্রি কলেজ, সমুদয় ছাত্র ও সরঞ্জাম সহ এই প্রচেষ্টায় যোগদান করায় অতি সত্বর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্য্য আরম্ভ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া এই কলেজে যোগ দিল।

সরকারী শিক্ষা-নীতি, তথা হিন্দুকলেজ পরিচালনা সম্পর্কে যখনই জনস্বার্থ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তখনই দেবেন্দ্রনাথ সকল শক্তি দিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি যে কখনও সরকারের বা শিক্ষা-কমিটির সহযোগিতা করেন নাই, এমন নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান, এ কথা শিক্ষিত-সমাজে সকলেই অবগত ছিলেন। শিক্ষা-কমিটি ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার ভার যাঁহাদের উপর দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এক জন। রাধাকান্ত দেব ও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় ঐ বৎসর দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন।

সরকারের অন্য কোন কোন শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের

যোগ ছিল। ১৮৪৪, ১৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৮) সমগ্র বঙ্গে (তখন বিহার, উড়িষ্যাও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এক শত একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। বাংলা অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি হার্ডিঞ্জ সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। বাংলা শিক্ষা ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের আত্যন্তিক অনুরাগ ও তদনুযায়ী কার্য্যের কথা আগেই বলিয়াছি। ত্রিপুরা জেলায় তাঁহার জমিদারি ছিল। এই জমিদারির অন্তর্গত বরকাম্‌তা (না, বরকান্তা?) নামক স্থানে তিনি নিজ ব্যয়ে এইরূপ একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শিক্ষা-কমিটির ১৮৪৭-৮ সালের রিপোর্টে এই সব বিদ্যালয়সম্পৃক্ত বিবরণে (পৃ. ১৬২-১৮৭) দেবেন্দ্রনাথের কৃত কর্ম্মের এইরূপ উল্লেখ পাই:

> Burkumpta (Tipperah District). The Collector speaks well of this school, but I fear it must shortly be closed. It is situated in a valuable pergunnah, the property of Baboo Debendernath Tagore, who erected the School house. The whole pergunnah is now leased to Mr. Delaney, who positively refuses to afford any assistance to the school. Sufficient for the repairs this year was obtained from Debendernath Tagore, but it cannot be expected that he will now continue his support.

জনশিক্ষা

জনশিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার প্রতিই দেবেন্দ্রনাথের বরাবর ঝোঁক ছিল, এবং আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নিজ শক্তি যথাযথ প্রয়োগ করিতে প্রতিনিয়ত তৎপর ছিলেন।

সরকারের শিক্ষা-নীতির ফলে বাংলা শিক্ষা, তথা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ১৮৫৪ সালে বিলাত হইতে এই মর্ম্মে একটি শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচ বা নির্দ্দেশ আসে যে, ইংরেজী শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন এবং স্থানীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা দানের উপায় করিতে হইবে। ইহার ফলেই বাংলা-সরকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া স্থানে স্থানে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান। বলা বাহুল্য, হার্ডিঞ্জ সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই ইহার পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু জনশিক্ষা ইহাতেও তেমন ব্যাপকতর হইল না। ইহা দৃষ্টে পুনরায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার জনশিক্ষা ব্যাপকতর করার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৯, ১৭ই মে প্রদত্ত ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে বঙ্গের ছোটলাট জন পিটার গ্রাণ্ট, শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী ছাড়াও, কয়েক জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিদ্যোৎসাহী বেসরকারী ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের জনশিক্ষা, তথা বাংলা শিক্ষার বহুল প্রচারের উপায় সম্পর্কে মতামত আহ্বান করেন। বেসরকারী ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন—রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার, শিবচন্দ্র দেব, মুন্সী আমীর আলী প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথ ৮ই আগষ্ট (১৮৫৯) সরকারের নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রে জনশিক্ষা, তথা বাংলা-শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা নানা দিক্ হইতেই স্মরণীয়। তিনি লিখিলেন যে, পূর্ব্বে জনশিক্ষা প্রচারকল্পে কলিকাতার স্কুল সোসাইটি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পাঠশালাসমূহে ব্যবহারোপযোগী পাঠ্য

পুস্তক স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক যেরূপ রচিত হইয়াছিল, সমগ্র দেশে স্বল্পব্যয়ে জনশিক্ষা ব্যাপকতর করিতে হইলে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে তৎকালীন পাঠশালাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে জনশিক্ষা ব্যাপকতর করা সহজসাধ্য হইবে। তিনি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহে সময়োপযোগী বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনার কথাও লেখেন।

পত্রোক্ত একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সাধারণ পাঠশালা-সমূহে কোন বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষার বিরুদ্ধেই ইহাতে মত প্রকাশ করেন। তবে নীতি-শিক্ষার উপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বলেন, পুরুষের অজ্ঞতাই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। পুরুষরা শিক্ষিত হইলে, নারীদের শিক্ষার কোন বাধা থাকিবে না।*

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি

দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হেয়ার মেমোরিয়াল কমিটি, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, বীটন সোসাইটি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতির সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ লক্ষণীয়। ১৮৫৩, ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরস্থ ভবনে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমাবধি এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রথম দিনের সভাতেই কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে ইহার উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জ্জন এবং বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করা

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সুহৃদ্ সমিতির প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইল। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং 'হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন,' এবং 'নগরের উপকণ্ঠে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা'র জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভার সভ্যদের মধ্যে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।*

রাজনীতি

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক নহে। তাঁহার সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে যোগদান স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রেরণা দিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। দেবেন্দ্র-নাথের আত্মজীবনীতে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইলেও রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ নীরব। তবে ইহার মধ্যেই এক স্থলে ঐ বিষয়ের সূত্র পাইতেছি। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন:

> যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্ব্বেকার বিক্রম

* কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। পৃ, ৯৯-১১১ দ্রষ্টব্য।

ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে— আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল। (আত্মজীবনী, পৃ ১০৭)

ইহা ইংরেজী ১৮৪৫-৪৬ সালের কথা। ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভিত্তিতে মিলিত হইলে ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন যে সম্ভব, এ বিশ্বাস তিনি এই সময়ে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। প্রয়োজন অনুভব করিবামাত্র ইহাতে শুধু যোগদান নয়, দেবেন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

মহর্ষির রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মধারা অনেকটা পৈতৃক। ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যোগদান করেন নাই। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বেদান্ত-প্রতিবাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দু ধর্ম্ম যাহাতে সমাজমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সে দিকেই বিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহারা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে তাঁহার কার্য্যে সহায় হইলেন।

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে ভূম্যধিকারী সভা, ভারতবর্ষীয় সভা (বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) উভয়ই নির্জীব হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষে ১৮৪৯ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই বৎসরে ভারতসরকারের ব্যবস্থা-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন শাসন-সৌকর্য্যার্থ চারিটি আইনের খসড়া রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। এ খসড়া আইন চারিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল—ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মফস্বলস্থ সরকারী আদালতসমূহের অধীনে আনা এবং

ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে বিচার-বৈষম্য দেখা দিতেছিল, তাহা কথঞ্চিৎ দূরীভূত করা। খসড়াগুলি প্রকাশে ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, এবং আইন যেন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভান করিয়া ইহার নাম দেয় "Black Acts" বা কাল আইন! তাহারা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের জিদই বজায় রহিল, ভারত-সরকার প্রস্তাবিত আইনের খসড়াগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা বা মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ স্মরণীয়। ইহার পরই, ইউরোপীয় সার্থক ঐক্যমত দৃষ্টে ভারতবর্ষের প্রবীণ নবীন, রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা ও ভূম্যধিকারী সভা যাহাতে একযোগে কাজ করিতে অগ্রসর হন, সেই উদ্দেশ্যে রামগোপাল ঘোষ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর একটি কারণেও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৮৫৩ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন করিয়া সনন্দ পাইবার কথা। সুতরাং নূতন সনন্দ যাহাতে ভারতবর্ষের অধিকতর হিতকর হয়, সেজন্য ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নিজেদের মত জ্ঞাপন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সব প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানটিও বাংলায় ভারতবর্ষীয় সভা নামে অভিহিত হইত।

কিন্তু এই সভা প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় একই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বেকার ভূম্যধিকারী সভা পুনরুজ্জীবনের আশায় আর একটি রাজনৈতিক সভারও অনুষ্ঠান হয়। সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, মনে হয়, এই রাজনৈতিক সভাটিই পরে ভারতবর্ষীয় সভায়

রূপান্তরিত হয় এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নেতৃবৃন্দও ইহার সঙ্গে যোগদান করেন। প্রথম সভাটির কথাই আগে কিছু বলিব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক জন। ইহার উদ্বোধন অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই মর্মে লেখেন, "প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কোন কাজের সঙ্গে তাঁহাদের নাম যুক্ত হইতে দিবেন না যাহাতে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিবার আশা না রাখেন।...এবারে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনচেতা মান্যগণ্য লোকই আমরা পাইয়াছি।"* এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হইল—"The National Association"। 'দেশহিতার্থী সভা' নামে "সমাচার দর্পণে" ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। 'বেঙ্গল হরকরা' উক্ত তারিখে এই সভা সম্পর্কেও আরও লেখেন ঃ

> Revival of the Landholders' Society—
>
> ......A meeting of the respectable native Zemindars, resident in and about Calcutta, was called last Sunday [Sept. 14] at the house of Raja Protap Narayan (?) Sing, at Paukparrah. It was composed of about fifty native gentlemen, amongst whom the following names may be mentioned, namely, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Debendernauth Tagore, Raja Protap Narayan (?) Sing, and Babco Kally Coomar Roy. The Society was christened the 'National Association.' Amongst other things it was resolved that the meeting take into their consideration some effective means to ensure the permanency of the Association,......

---

* We have assurance, that such men as Baboo Prosunno Coomar Tagore and Debenderanath Tagore will never associate their names with an undertaking which they do not hope to carry out...This time we have independent and honourable men for leaders and prime movers.

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতার্থী সভার এই অধিবেশনেই ইহার উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রণালীও কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে নির্ণীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি পরবর্ত্তী ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশ করেন। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক আলোচনায় ইহার গুরুত্ব কম নহে। এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথও যে এই প্রস্তাব-সমূহের সমর্থক ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

Whereas it having appeared that some of the laws which have emanated for the last few years from the Legislative Council of the British Indian Empire, militate against the rights and possessions of the subjects of this empire, and whereas the proceedings of some of the officers connected with the judicial administration of the country in applying a departure from the resolutions as to the manner in which the country is to be governed, and thereby frustrating the expectation entertained as to the nature of the administration of this empire, it is resolved that a Society be formed under the designation of the "National Association" for the purpose of adopting measures which may contribute to the welfare of the country. The Society to be composed of members of all classes of the subjects of this empire, without any distinction of creed, caste or colour That by the help of this Association we may be able to assert our legal rights by legitimate means, it is resolved to apply for any amendment or reform, as the case may be, either to the Local Government or to the authorities in England.

That in order to carry out the views of the Society a fund be raised by subscription, such fund to defray the expenses of a local office and to support an agent in England to act for this association before the Imperial Parliament of Great Britain.

Agreeably to this resolution we subscribe the sums

affixed against our names, and bind ourselves and our heirs and representatives to pay the same at least for the three following years. as that period embraces the most important of the operations of the Association, since it is expected that the East India Company's Charter will be renewed during that time in England to lay before the Imperial Parliament our wants and grievances when that question comes on for discnssion before that body.

In order to carry out the objects proposed by this Association, we do hereby most solemnly declare that we will do all that lies within the sphere of our respective means and abilities, for the furtherance of these objects.

দেশহিতার্থী সভার কর্ম্মকর্তৃ-সভা গঠিত হইল ; সম্পাদক হইলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ। ইহার কার্য্যও যথারীতি আরম্ভ হইল।*

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার দেড় মাসের মধ্যেই ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শেষোক্ত সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সভার মত ইহারও প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ২৭ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'সিটিজেন' হইতে সভা-প্রতিষ্ঠার সংবাদটি এইরূপ উদ্ধৃত করেন :

British Indiau Association ;—The *Citisen* of the 8th instant informs us, that a meeting of the most worthy and

---

* ২৩ অক্টোবর ১৮৫১ সালের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লেখেন—

A native paper, translated in the *Hurkaru*, mentions that the native National Association have appointed Baboo Debendranath Tagore, as their Secretary, with an establishment to assist him, at the head of which will be Mr. Kirkpatrick. We understand that funds for the uses of this Association have been contributed rather more than is customary in Bengal. (*W. E. Neus.* Tuesday, October 21)

influential native gentlemen of Calcutta was held on the 29th of the last month, when it was resolved that 'a Society be formed for a period of not less than three years under the denomination of the British Indian Association, and that the object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interests of Great Britain and India and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject territory.' The rules have been drawn up with the most elaborate care, and amount to no fewer than 47.

এই উদ্ধৃতি হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ২৯এ অক্টোবর পাইতেছি। প্রচলিত পুস্তকাদিতে প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৮৫১, ৩১এ অক্টোবর। রাজা রাধাকান্ত দেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই সভা সম্পর্কে তিনখানি পত্রের পাণ্ডুলিপি পাইয়া ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র* প্রকাশিত করিয়াছি। তাহাতেও ইহার উদ্দেশ্য এবং প্রথম দিক্‌কার কার্য্যাবলীর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানাদির পর দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদকরূপে সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। উপরে যে তিনখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে চৌকিদারি ব্যবস্থা ও লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কে আবেদনের কথা আছে। এই সময়ে গ্রামে গ্রামবাসীদের ব্যয়ে চৌকিদার নিয়োগের প্রস্তাব হয়। চৌকিদার নিয়োগের ব্যয়ভার বহন করা গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য ; কারণ, দেশ-শাসনের জন্য ও শান্তিরক্ষাকল্পে তাঁহারা নানা ভাবে কর আদায় করিয়া লইতেছেন। এ সবের স্পষ্ট উল্লেখ এই আবেদনে ছিল। সভা-প্রতিষ্ঠার পক্ষকাল মধ্যেই ১১

* *The Calcutta Municipal Gazette.* July 11 1942. পৃ. ২৩৫-৩৬।

ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য একখানি লিপি প্রেরণ করেন। এ সময়ে বোম্বাইয়েও একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই মর্ম্মে লিখিলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়, এ সময় একযোগে কাজ করিলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা হইবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বতন্ত্র এজেণ্ট নিয়োগের জন্য অর্থ ব্যয় হইবে প্রচুর। সমগ্র দেশের পক্ষে এক জন এজেণ্ট নিযুক্ত হইলে শুধু ব্যয়ভারই লাঘব হইবে না, পরন্তু ভাবী শাসনসংস্কার বিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর ঐকমত্য প্রকাশেও সুবিধা হইবে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আরও জানান যে, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষীয় সভা এইজন্য ষোল হাজার টাকা তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।* এই লিপিখানিতে যে সমগ্র-ভারতীয় মনোভাব প্রকট তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে।

দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বসাকল্যে দুই বৎসর দেড় মাস কাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা-যত্নে এই সভা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজে ইহার একটি শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে অন্যত্রও ইহার আদর্শে সভা-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য গঠিত হইলেও ভারতবর্ষীয় সভা যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, তাহার মূলেও দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যথেষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকা কালে চৌকিদারি আইন, লাখেরাজ

* সি. এফ্. এণ্ড্রুজ ও গিরিজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত *The Rise and Growth of the Congress* পুস্তক (পৃ. ১৫৬-৫৭) দ্রষ্টব্য।

ভূমি সম্পর্কীয় আইন, গবর্ণমেণ্ট লবণ উৎপাদন একচেটিয়া করায় জমিদার ও প্রজার অসুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা আলোচনা করেন এবং প্রতিবাদলিপিও সরকারে পেশ করেন। কিন্তু এই সময়কার সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল—ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে স্মারকলিপি প্রেরণ। এই স্মারক লিপি রচনায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল বলিয়া জানা যায়। হরিশ্চন্দ্র পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই স্মারক-লিপিতে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের শাসন-নীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও স্ব-শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞাপিত হয়, এবং ইহার প্রথম ধাপ-স্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যপদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদনও জানান হয়। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ যে এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথ কখন সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন, তাহা এত দিন অনেকেরই জানা ছিল না। সম-সময়ের সংবাদপত্র হইতে দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদক-পদ ত্যাগের সঠিক সংবাদ ও সময় জানা যায়। ১৬ জানুয়ারি, ১৮৫৪ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' ১৪ই জানুয়ারির 'সিটিজেন' পত্রিকা হইতে এই সংবাদটি উদ্ধৃত করেন :

The British Indian Association.—

Yesterday was held the Third (?) Annual Meeting of that flourishing Institution, the British Indian Associatiou.

Baboo Debendernath Tagore tendered his resignation of the post of Secretary, which he has very ably filled since the first formation of the Society, and has been succeeded in the honorary but onerous appointment by Isser Chunder Singh, brother of Rajah Protaub Chunder Singh.

We understand it to be the intention of several of the members of the movement (?) party among the Natives to

releive one another in succession as Secretaries to the Association at intervals of two years or there-abouts in order that the acceptance of the office may not be considered so arduous an undertaking as to deter applicants.

এই উদ্ধৃতিতে একটি ভুল রহিয়াছে। এই অধিবেশন ভারতবর্ষীয় সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন নহে, দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। দেবেন্দ্রনাথ ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। উপরের উদ্ধৃতিতে দেবেন্দ্রনাথের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধেও কিছু জানা যাইতেছে। সভার সদস্যদের মধ্যে এক দল এই মত পোষণ করিতে লাগিলেন যে, দুই বৎসরের অধিক কাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তি অধিষ্ঠিত না থাকিয়া অন্যদের এই ভার বহনের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দেবেন্দ্রনাথও সানন্দে এই গুরু ভার অন্যের স্কন্দে ছাড়িয়া দিলেন।

পদবর্ত্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এই দ্বিতীয় বার্ষিক সভার একটি পূর্ণতর বিবরণ প্রকাশিত হয়। একটি প্রস্তাবে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ও সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্রের কার্য্যের প্রশংসাবাদ করা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অতঃপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে দেখি না। তবে সুপ্রসিদ্ধ নবগোপল মিত্রের হিন্দু মেলার পশ্চাতে (১৮৬৭ সাল) যে তাঁহার মহতী প্রেরণা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তীকালের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিও তিনি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বহু বার কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া স্বদেশসেবায় উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই বিশেষরূপে স্মরণীয়।

পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ

তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়া প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে কার্য্যতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই বৎসরের শেষ দিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনকে সঙ্গে লইয়া সিংহল ভ্রমণে গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার যে-সব কার্য্যভার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদনের জন্য একটি কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভা গঠন করিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর ভাষায়,

> অনন্তর দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীর ক্ষমতা অবলম্বনপূর্ব্বক ১১ই পৌষ ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা করেন।*...সেই সভায় দেবেন্দ্রবাবু নিম্নলিখিত পদ সৃজনপূর্ব্বক তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
>
> সভাপতি—শ্রীরমাপ্রসাদ রায়
>
> অধ্যক্ষ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্রিকাধ্যক্ষ)
>
> শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত (যন্ত্রাধ্যক্ষ)
>
> শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন (ধনাধ্যক্ষ)
>
> সম্পাদক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
>
> সহকারী সম্পাদক—শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

---

* মাঘ ১৭৮১ (শক) সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও এই সভার বিবরণ দিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিদর্শক—শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

ইহার পর পাঁচ বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ গৌরবময় যুগ। দেবেন্দ্রনাথ অনন্যমনা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল (১৭৮১ শক, ২৬ বৈশাখ—ইং ১৮৫৯, ৮ই মে)। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এখানে প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাংলায় যেমন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ইংরাজীতেও তেমনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৬১, ১লা আগষ্ট প্রকাশিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে ব্রাহ্মবন্ধু সভা, সঙ্গত সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টা, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যেও কার্য্য স্বুরু হইল। শেষোক্ত উদ্দেশ্য স্বষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য 'বামাবোধিনী পত্রিকা'ও এই সময় প্রকাশিত হয়। এ সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত না থাকিলেও ইহার প্রত্যেকটির মূলেই যে তাঁহার প্রেরণা রস যোগাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও অন্যত্র দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের যে-সব ব্যাখ্যান প্রদান করেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ক্রমশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেবেন্দ্র-নাথ এখন আর কলিকাতায় নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না। এ কারণ তিনি নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কেশবচন্দ্র সেনকে। ১৭৮৪, ১লা বৈশাখ (১৮৬২, ১২ই এপ্রিল) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার নিজের উপাধি হইল 'প্রধান

আচার্য্য'। কেশবচন্দ্রকে অভিষেককালে অন্য কথার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বলেন :

ক্রমে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে; এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্ম্মেতে উন্নত হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্য বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদূরের ব্রাহ্ম-সমাজসকল সুপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে সকল সমাজের সম্যক্‌রূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলি-কাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটি আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে···ইত্যাদি। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৮৪ শক)

ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মোপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথকে প্রায়ই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমনাগমন করিতে হইত। কলিকাতার কার্য্যভার ছিল প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের উপর। কেশবচন্দ্র প্রগতিশীল যুবকদের অধিনায়ক। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের প্রগতিমূলক মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত আর কোন অ-ব্রাহ্মণ উপাসনা করিবার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু প্রগতিশীল দল জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপাসনা পরিচালনার অধিকারের কথা উত্থাপিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথও কতক দূর অগ্রসর হইয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণ উপাসনাকারীর পার্শ্বে জাতিভেদবিরোধী প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও স্থান

করিয়া দিলেন। কিন্তু শেষোক্ত দল এ ব্যবস্থায়ও বেশী দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রগতিশীল দলের পক্ষ হইতে সাধারণ উপাসনার দিন ব্যতিরেকে তাঁহাদের উপাসনার জন্য একই ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অন্য এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ-পত্র লেখেন। রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্ট ডিডে লিখিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ট্রষ্টী দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। অগত্যা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল দল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ তথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই বিচ্ছেদের সূচনা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পৌষ ১৭৮৬ শক (১৮৬৪, ডিসেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নের বিজ্ঞাপন দুইটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

(১)

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার তাহার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমারদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
অধ্যক্ষ।

১ পৌষ ১৭৮৬ শক }
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। সম্পাদক।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার। সহকারী সম্পাদক।

(২)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড অনুযায়ী উপাসনা কার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কেশবচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কৌশলে হস্তগত করিয়া স্বেচ্ছামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ঔদার্য্যবশতঃ ইহার স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইহার অল্প দিন পরে দেবেন্দ্রনাথেরই অর্থে ও প্রেরণায় নবগোপাল মিত্রের সম্পাদকত্বে ইংরেজী 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র স্বমতানুবর্ত্তীদের লইয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হইল।

বিচ্ছেদ যখন পূর্ণ হইল, তখন কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচারের মধ্যে সমাজ-সংস্কারকে একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিলেন। 'ব্রাহ্মরা কি হিন্দু?' 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ কি না?' 'ব্রাহ্মের উত্তরাধিকার কোন্ আইন-বলে সিদ্ধ?' প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচনার জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ উপস্থাপিত করিলেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বক্তৃতায় খ্রীষ্টপ্রীতি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ রক্ষণশীল হইলেও সমাজ-সংস্কার যে একেবারেই

পছন্দ করিতেন না বা ইহার কোন কোন প্রচেষ্টা যে মোটেই সমর্থন করিতেন না, এমত নহে। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন, প্রচলিত জাতিভেদপ্রথা যে এককালে উঠিয়া যাইবে, এ বিষয়েও তিনি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। যখনই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ও সাধারণগ্রাহ্য করিবার পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে বা করিবে, তখনই তিনি তাহা বর্জ্জন করিয়া মূল উদ্দেশ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। তাই তিনি কেশব-মণ্ডলীর সংস্কার প্রচেষ্টা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কার্য্য যাহাতে মূল উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন না ঘটায়, সেজন্য তাঁহার নির্দ্দেশে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' ও 'ন্যাশনাল পেপার' আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।* কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহকে বিধিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বিধিমতে বাধা দিয়াছিলেন। আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রস্তাব হইলে, ভারত-সরকার এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত আহ্বান করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মত জ্ঞাপন করিয়া সরকারকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি এই :

---

* অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শকে (নবেম্বর, ১৮৬৬) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার" প্রবন্ধের নিম্ন উক্তিগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

> "চির-সেবা ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কার্য্য এক ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার একাকার হইয়া মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিবে। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা-বর্দ্ধন যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল সংস্কৃত ও সভ্য সমাজেরই ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। বিশ্বজনীন, আধ্যাত্মিক ও উদারতর বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট হানি করা যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য-সেব্য ; যেমন প্রতিদিন অন্ন পান গ্রহণ করিতে হইবে সেইরূপ প্রতিক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে হইবে।"

To

H. L. Dampier, Esq.,

Secy. to the Govt. of Bengal.

Sir,—I have the honour to acknowledge the receipt of your circular No. 3 dated the 14th ultimo requesting me to state my opinion and suggestions with regard to the Bill now pending before the Supreme Council for providing a form of marriages for certain persons who are not Christians and beg to offer the following remarks :—

2. Whether a Civil Marriage law upon the principle of the Bill has, under the present circumstances of Indian Society, become a necessity justifying express legislation. is a question on which more than one opinion might be entertained. For my own part I do not see any such necessity, for having regard to the spirit of modern legislation and the rules of justice, equity and good conscience which the Court of this country are bound to observe, there can, I think, be little, if any, room for doubt as to the validity of marriages that might be celebrated under forms and ceremonies differing from those already existing in India. I concur in the opinion expressed by the learned professor Max Muller "that modern legislation can regard marriage only in the light of a Civil contract leaving the religious ceremonies, if any to be settled by the contracting parties" and that opinion, I am happy to find, has been fully confirmed by the observations that recently fell from so eminent a lawyer as the Honorable Mr. Stephen.

3. Should the Legislature, however, consider it proper to pass an enactment like the one under consideration. I would respectfully urge that in framing a Civil Marriage Law for India the Legislature should not go further than the actual necessity of the case requires, nor should it yield to the temptation of introducing social changes and reforms by the fiat of the Law. In this view I would object to sections 17 and 18 of the proposed Bill. In giving a Civil form of Marriage to a section of the Indian Community I do not see the necessity of bringing them or their children under an entirely new Law of succession and

consanguinity. It would, I think, be sufficient to enact that the Law of succession and the Law of consanguinity and affinity applicable to all persons marrying under the Act shall be the Law which would have governed the husband if he had not so married, and in the case of the issue of such Marriages the Law shall be that which would have applied to the first male ancestor marrying under the Act, such ancestor being traced through the male line.

I have the honour to be,
Sir,
Your most Obdt. Servant,
Debender nauth Tagore*

Calcutta,
The 4th March, 1872.

দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে বিবাহ-আইনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইন নূতন আকারে বিধিবদ্ধ হয়। তিনি ব্রাহ্মদের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক প্রথারই অন্তর্ভুক্ত, মাত্র পৌত্তলিকতা তাহাতে বর্জ্জিত হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ হিন্দু বিবাহ বলিয়াই গণ্য হইল। আর বিবাহ আইন যে আকারে বিধিবদ্ধ হইল এবং কেশবচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত যাহা সমর্থন করিলেন, তাহাতে 'হিন্দু' কথাটি বিসর্জ্জন দিতে হইল। এই হিন্দুত্বকে অস্বীকার করায় দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে কলিকাতায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা ইহারই সার্থক প্রতিবাদ। এই বক্তৃতা লইয়া দেশ-বিদেশে তখন কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মজীবনীতে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের শরীর বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অপটু হইয়া আসিতেছিল। তিনি ১৭৮৬ শকের ১২ই শ্রাবণ (১৮৬৪, জুলাই) এক পত্রে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ, ১৭৯৪। পৃ. ১৫-৬।

আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আর বড় দেখিতে পায় না, কর্ণেন্দ্রিয় আর বড় শুনিতে পায় না, বাক্য আর অধিক কথা কহিতে চায় না। আমার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে অবসর লইবার জন্য আমাকে ব্যস্ত করিতেছে। এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া রহিয়াছি। (পত্রাবলী, পৃ. ৮৫-৬)

১৮৬৯, সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯, সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসতি করেন। এই সময় মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিরূপে তিনি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যভার অনেকাংশে লাঘব করিয়াছিলেন। তবে দেবেন্দ্রনাথ ইহার পরও দীর্ঘকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ছিলেন। ১৮১১ শকের শ্রাবণ মাসে (১৮৮৯, ২৫ জুলাই) দেবেন্দ্রনাথের স্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকীনাথ ঘোষাল এবং দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টী বা বিশ্বস্ত অধিকারী হওয়ার সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৮১১)

দেবেন্দ্রনাথ যখন নিজ কার্য্যভার অপরের হস্তে দিয়া অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই ভ্রমণে কাটাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও তিনি কোন কোন ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিম্নে দেবেন্দ্রনাথের যে পত্রখানি উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে উক্ত বিষয় পরিষ্কাররূপে জানা যাইতেছে :

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রে লিখিয়াছিলাম।

আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটি ধর্ম্মসূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন, তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন তখন তাঁহার এমনি একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটি যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখন কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুভাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটি আমার মন খুলে আমি প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপবাবু সিমলা হইতে ৯ আগষ্ট তারিখে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধ সকল সন্তপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহার সকল উল্লেখ করিয়া বিনীতভাবে বাহুল্য করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্‌গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত

তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব, তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদপত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে, আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পূর্ব্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"Only if I have any wish which I would express before you it is this that you and he should be once more reconciled into that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old bygone days in the infinite possibilities of Divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? What could you not do if you too wished it."

এই কথার সহজ উত্তর এই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার আর নাঙ্গাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপ্‌টাইস্‌টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন— তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে। এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাঙ্গাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময়

প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি, তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল, ইহা লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে "ইহা অতি কষ্টকল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই—ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম তাহা হইলে কত আনন্দ যে আমি লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এই অংশটি গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দোষগুণের এত বাহুল্য চর্চ্চা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে ইহা অতি অপ্রিয় কার্য্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন। ইতি

নিয়ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা*

হিমালয় মসূরী পর্ব্বত
২৮ ভাদ্র ৫২

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন, ১৮০৩। পৃ. ১১৮-৯।

মতভেদ সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের যে গভীর প্রীতি ছিল, তাহা এই পত্র হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে ·(১৮৮৩) দেবেন্দ্রনাথ গভীর শোক অনুভব করেন। পরবর্ত্তী কালে কি নববিধান সমাজ, কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক সমাজই তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। উভয় সমাজেরই নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে নানারূপ উপদেশ লইতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই কিরূপ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।

দানশীলতা

দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবনে বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দান কম ছিল না। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রকৃতিকে মানুষ বিজ্ঞানবলে জয় করিয়া স্বীয় উন্নতি সাধন করিবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। যশোহর-নিবাসী সীতানাথ ঘোষ যখন তড়িৎবিজ্ঞান, তড়িৎবাহিত তাঁত-যন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষণাদি করিবার পর অর্থাভাবে পতিত হন, তখন মহর্ষি তাঁহাকে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁহার দানের একটি সুন্দর নিদর্শন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের ভূমি ক্রয় করেন। নিরালায় ব্রহ্মোপাসনা করার জন্যই তিনি এ স্থানটি বাছাই করিয়া লন। এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ১২৯৪ সালের ২৬এ ফাল্গুন [১৮৮৬, ৮ মার্চ্চ] দেবেন্দ্রনাথ একটি ট্রষ্ট ডীড করেন। দলিলের মধ্যেই আশ্রম-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের নির্দ্দেশ ও আলোচনা আছে। এই জন্য দলিলখানি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল :

ট্রষ্ট ডীড

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং জোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্নেহাস্পদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা জোড়াসাঁকো হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট।

কস্য ট্রষ্ট ডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রীক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিভিসন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরের পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের

উত্তরাংশে প্রথম তপশীলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতপনারায়ণ সিং দিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্ট ডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর-অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টীস্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের সর্ত্তমত স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎ লিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলীকার থাকিবে। আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিক্তিগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্ট ডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎবিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধাম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত

শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবে। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি-সৎকার ও তজ্জন্য

আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির বিধায়ক সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ যত্ন সহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিতে পারিবেন না, কিন্তু আশ্রমধারী তাঁহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পরিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কখন কেহ এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয়-সঙ্কুলান জন্য দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২৲ টাকা। ট্রষ্টীগণ অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ

ও সর্ব্বপ্রকার বিলি-বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন ; উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোনরূপ নিরাপদ মালিকী স্বত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোনরূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোনরূপ দান-বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোনরূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ী হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত গালিম-পুর ও ভত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশতঃ ঐ কুঠীদ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকার

দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া ডিডের সর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্ট ডিড লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্ত্তী কালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মৃত্যু

দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ অষ্টাশী বৎসর বয়সে ১৯০৫, ১৯এ জানুয়ারী ইহলীলা সংবরণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ

রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিরাট্ হিন্দুজাতির উন্নতির জন্যই তাঁহারা ইহার প্রচারে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমগ্র হিন্দুজাতিকে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১৮১০ শক, পৃ, ১২-১৪।

একসূত্রে গ্রথিত করিবে—দেবেন্দ্রনাথের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন :

> যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আমার সঙ্কল্প হইল। (আত্মজীবনী, পৃ: ১০৭)

পরবর্ত্তী কালে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হন। তিনি বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে সার সংগ্রহপূর্ব্বক দুই খণ্ডে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রথিত করেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ছিল তাঁহার স্বদেশবাসী সমগ্র হিন্দুজাতি ও ইহার উপকার সাধন। ১৭৮৯ শকের ১১ই কার্ত্তিক ব্রাহ্ম-সম্মিলন সভার উদ্বোধন-বক্তৃতায় তিনি বলেন :

> ভারতবর্ষের আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মসম্মিলন সভা হইতে তাহাকে প্রাণপণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে তো সজনে কি বিজনে সর্ব্বত্র উন্নত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমারদের প্রতিজ্ঞা, সাধারণ হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইবে—সাধারণ হিন্দুসমাজকে আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই সাক্ষ্যটি স্থির রাখিয়া ব্রাঁহ্মেরা সকলে ঐক্য হইয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশা করিতে পারি যে এই প্রশস্ত ও বিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজে পরিণত হইবে। হিন্দু প্রথা হিন্দু রীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে

হইবে। হিমালয় উন্নত মস্তকে যে সকল পবিত্র তুষাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, না তাহাকে বিগলিত করিয়া হিন্দুস্থানের মঙ্গল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদ-নদী রূপে সহস্র ধারে নিস্যন্দিত করে? সেইরূপ ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণপণে যত্ন করুন। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৭৮৯ শক)

"হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ" সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক) লিখিতেছেন:

বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নহে; প্রত্যুত ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই সার।...

যদি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অংশ আমরা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনারদিগকে যার পর নাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মই সংশোধিত হইতেছে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়-স্থান হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। এক্ষণে আর সে ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই। কেবল, সাধারণ লোককে অসমর্থ ভাবিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, পৌত্তলিকতা রূপ হিন্দুধর্ম্মের যে কনিষ্ঠ প্রণালী প্রচারিত হইয়া

আছে ; তাহার পরিবর্ত্তে সমুদায় হিন্দুসমাজে একেশ্বরবাদ প্রচার করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া অবধারণ করিতেছি। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতি-বিশেষে কখনই আবদ্ধ থাকিবে না ; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবে।...

হিন্দু জাতির মান, সম্ভ্রম ও গৌরব কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে ; ইহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু জাতিরই পুরাতন ধর্ম্ম।

১৭৮৯ শকের মধ্যভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভিতরে হিন্দুজাতির প্রতি তাঁহার মমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপূর্ব্বিক বিবরণও সংক্ষেপে দিয়াছেন। ইহা হইতে এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল :

আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দু জাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মধুর অমৃতরস আস্বাদন করিয়া আমার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্ত মন উৎসুক রহিয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পৌষ ১৭৯১ সংখ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এই কথা কয়টি পাওয়া যাইতেছে :

The Adi Brahmo Samaj maintains that Brahmoism is both universal religion as well as a form of Hindooism. The principal ground of its maintaining this opinion is that Theism is true Hindooism according to a right interpretation of Hindoo Shasters.

১৭৯৩ শকের বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পর্কে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশ্নাবলী ও দেবেন্দ্রনাথের উত্তর প্রকাশিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন ছিল—"ব্রাহ্মেরা সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন কিনা?" দেবেন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে লেখেন :

> সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। ভ্রমর যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কুসুম হইতেই মধুর অংশ গ্রহণ করে, ব্রাহ্মগণও সেইরূপ ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ সহজ জ্ঞানের দৈব আলোকে আপনার পথ প্রদর্শন করিয়া সকল শাস্ত্র হইতেই সত্যের ভাগ সঙ্কলন করেন। ব্রাহ্মদিগের উদার চক্ষুতে কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদায়ই ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অস্তিত্বই এই সত্যের প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তবে এই মাত্র প্রভেদ, যে ইউরোপ ও আমেরিকার অধুনাতন ব্রাহ্মগণ যেমন পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক সত্য সঙ্কলনের নিমিত্ত বাইবলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও সেইরূপ এ দেশের পুরাতন ঋষিদিগের হৃদয়-কন্দর-নিঃসৃত সত্য সুধার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক তৃষিত হন। পিতৃপিতামহাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ফাল্গুন ১৮২৬ শক) মহর্ষির মৃত্যুতে যে শোকসূচক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন তাহার এই অংশও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

> মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কোন দিন বলেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন। সামাজিক প্রথার ভিন্নতা কখনও ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়

সমাজের যে সংস্কার পথে অগ্রসর হন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়া সেই পথেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন সে পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের অনুসরণ করিলেন। যে দিন গুরু শিষ্যের, পিতা পুত্রের প্রধান বন্ধন—ধর্ম্মজীবনের বন্ধন এইরূপে ছিন্ন হইল সেদিন ব্রাহ্মসমাজের ঘোর দুর্দ্দিন, সেই দুর্দ্দিনের মেঘ ব্রাহ্মসমাজাকাশ হইতে আর পরিষ্কার হইল না।

গ্রন্থাবলী ও রচনার নিদর্শন

দেবেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে কয়খানির সন্ধান আমরা পাইয়াছি, রচনার নিদর্শন সহ তাহার অধিকাংশেরই একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ

পুস্তকখানি আমরা দেখি নাই। তবে এখানি যে দেবেন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্বন্ধে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের নববার্ষিকীতে (পৃ. ২২১) সাক্ষ্য দিয়াছেন। এখানি দেবেন্দ্রনাথের রচিত প্রথম পুস্তক।

Vedantic Doctrines Vindicated

এই পুস্তকখানি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয় অন্যত্র বলিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৮ [জুন ১৮৪৬] সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনে সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ পাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য় খণ্ড। ভাদ্র ১৭৭২ [১৮৫০]।

এই গ্রন্থ রচনার বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে বিস্তারিতভাবে দিয়াছেন (পৃ. ১৭৫-৮৪)। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৭৭২ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

ঐ, বাঙ্গলা অনুবাদ সহ। ১৭৭৩ [১৮৫১-২]।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা। ১৭৭৪ শক। অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

"আত্মতত্ত্ববিদ্যা, যাহা ক্রমাগত পত্রিকাতে পাঁচ অধ্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।··· শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—মাঘ, ১৭৭৪। বিজ্ঞাপন)

রচনার নিদর্শন ঃ

লোক সকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিশিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা দেখিতেছে কিন্তু যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ দেখিতেছে, তাহাকে তাহারা ভাবিয়া দেখে না। সর্ব্বদা কেবল বাহ্য বস্তুকে দেখিয়া শুনিয়া স্পর্শ করিয়া লোকদিগের এমত সংস্কার জন্মিয়াছে, যে তাহারা এমত কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তারই অনুভব করিতে পারে না, যাহাতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ-বিশিষ্ট যে বস্তু সেই বস্তু, তাহা ভিন্ন আর বস্তু নাই, এই তাহার-দিগের নিশ্চয় বুদ্ধি। যখন প্রথম ইহা বুঝা যায় যে, যে রূপকে দেখিতেছে, যে রসকে আস্বাদন করিতেছে, যে গন্ধকে আঘ্রাণ করিতেছে, যে ত্বক্‌কে স্পর্শ করিতেছে, তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তখন কি আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সুবোধ ব্যক্তিরা ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন, যে যে সকল বস্তুকে দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, সেই সকল বাহ্য বস্তু ; আর যে দেখে, যে শুনে, যে স্পর্শ করে, যে আঘ্রাণ করে, যে আস্বাদন করে, কিন্তু যাহাকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না, আস্বাদন করা যায় না, সেই আমি—সেই জীবাত্মা। হায়! চতুর্দ্দিকে বাহ্য বস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সর্ব্বদাই বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, লোক সকল কি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কিছুই হইলাম না, কেবল সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সকলই বস্তু হইল। এ বিবেচনা নাই যে আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য্য, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

১৭৮১-২ শকে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশ। ১৭৮২ শক [১৮৬০]।

কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ সিন্দূরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। কেবল প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ৭টার সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিতেন। ঐ শকের পৌষ মাসে বিদ্যালয়টি পূর্ব্বাবাস হইতে চিৎপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের দ্বিতলে স্থানান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ২৬এ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া এখানে দশটি বক্তৃতা করেন। গ্রন্থের দীর্ঘ উপক্রমণিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ

"সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।...ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থারও দাস নহে, ঘটনারও অধীন নহে; কিন্তু সকল কালেই তাহার সমান আধিপত্য।

"এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ ভাব-সকল বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আমার পরম পূজনীয় পিতা মহাশয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকারের জন্য গ্রন্থবদ্ধ করিয়া আমি প্রকাশ করিতেছি;..."

দেবেন্দ্রনাথের সপ্তম বক্তৃতা 'পরলোক' সম্পর্কে। ইহার এক স্থলে তিনি বলেন:

আমি এবং আমার শরীর এ দুইকে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে পরকালের প্রমাণ সহজেই হয়। আমি আমার শরীর হইতে ভিন্ন। আমি যখন দূরবীক্ষণ সহকারে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নিরূপণ করি; তখন সে দূরবীক্ষণও আমি নহি, এবং আমার চক্ষুও আমি নহি, আমার মস্তিষ্ক আমি নহি, আমার হৃদয়ও আমি নহি। অন্ন-পানে শরীরের পুষ্টি হইতেছে, রোগ দ্বারা শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার প্রত্যেক পরমাণু একেবারে পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি যে একই সে একই রহিয়াছি। বিষয় আর বিষয়ী অন্ধকার আর আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব। যাঁহারা ইহাদের মধ্যে সমুদয় প্রভেদ বিলীন করিতে চাহেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র যুক্তিতেও তাহা অতি সামান্য লোককেও বুঝাইতে পারেন না। বিষয় আর বিষয়ী; ইহাদের মধ্যে কিছুতেই ঐক্য নাই—এ দুয়ের কোন এক গুণও সমান নহে। আকৃতি, বিস্তৃতি বিষয়ের গুণ; আর স্মরণ, তুলনা, অনুমান, প্রীতি দয়া, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা; এ বিষয়ীর গুণ; ইহার মধ্যে কিছুতেই

সাদৃশ্য নাই। একজন দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ঘ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা; অপর আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। আকাশ নাই আর জড় বস্তু আছে; এ আমরা মনেই করিতে পারি না। কিন্তু আকাশ বিষয়ীর অবলম্বন নহে।

যখন শরীর আত্মা এত পৃথক্; তখন মৃত্যুর পরেই আত্মার কি প্রকারে বিনাশ হইতে পারে। আমরা কোন বস্তুরই বিনাশ কল্পনা করিতে পারি না। যাঁহার সৃজন শক্তিতে এ সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই সংহার শক্তিতে এ সমুদয়ের ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরের পালনী ইচ্ছার বিরাম ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্র ধ্বংস হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সে ইচ্ছার বিরাম হইয়াছে কি না; এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জড় বস্তু হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। জড় বস্তুর মধ্যে কোন বস্তুরই বিনাশ হইতেছে না। জল বাষ্প রূপে উত্থিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই বাষ্প আবার জল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র সকল ভূমিতলে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু তাহাই আবার বাষ্পীয় পদার্থ বিশেষে পরিণত হইয়া উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। মৃত দেহের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইতেছে; কিন্তু তাহার কিছুই বিনষ্ট হইতেছে না। অতএব কোন্ উপমিতি দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে মৃত্যুর পরে আত্মারই বিনাশ হইবে। যখন একটি জড়ীয় পরমাণু বিনষ্ট হইতে পারে না; তখন কি আত্মারই বিনাশ ইচ্ছা করিবেন।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা। ২৭ চৈত্র ১৭৮২ শক। (১৮৬১)

এই বৎসর ১২ই চৈত্র রবিবার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনান্তর দেবেন্দ্র-

নাথ উক্ত বক্তৃতা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখনও ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালী-প্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহু মূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধহয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।—("পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি" —প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০)

এই বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

যে স্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের প্রিয় ভূমি। সেই স্বদেশই আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মের আকর স্থান। আমারদের ঋষিরা সরস্বতী নদীর তীরে ব্রাহ্মবর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই সকল জীবন্ত মহাবাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখানকার লোকেরা এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। সেই দাবানল নির্ব্বাণের নিমিত্তে আমারদের যাহার যে ক্ষমতা, যৎকিঞ্চিৎ বারি দানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারত ভূমির প্রধান স্থান—সেখানকার সকলে শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে, জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহারদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া

আমরা কি ব্যাকুল হইব না? আমরা কোন্ প্রাণে তাহারদের এই দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মৃতকল্পা মাতার উষ্ণ নিঃশ্বাস এখান পর্য্যন্ত আসিয়া আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এস আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে কেবল আমরা আমারদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমারদের পিতার কার্য্য করা হইবে।...সেই পশ্চিমবাসিগণ, যাহারদের সঙ্গে আমারদের এমন নৈকট্য সম্বন্ধ...ভাষাতে, জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সমুদয় সংসারের কার্য্যেতে যাহারদের সঙ্গে আমারদের ঐক্যতা; তাহারদের সঙ্গে সমদুঃখী হওয়া কি কঠিন? তাহারদের দুঃখ-দাবানলে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিতে কি আমারদের কষ্ট বোধ হইবে? তাহারদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে দিন যাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের কোন স্বাদ পাই? (পৃ. ২-৩)

একবার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দ্দিকে দুঃখ-দাবানল জ্বলিতেছে। তোমার দয়া বৃত্তি কি হৃদয়ে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক শুষ্ক শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা একটী লোক নাই যে তাহারদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ? সাধু দয়া বৃত্তি কি আমারদিগকে বারম্বার এই প্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ, আমারদের দেশের কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া

রহিয়াছে, হরিৎ বর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না। আমারদের এমন ভারতবর্ষ আরব্য দেশের মরু-ভূমি তুল্য জল-শূন্য মরু-ভূমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—এ কি সামান্য শোচনীয় বিষয়?…আমারদের ভ্রাতৃগণের হৃদয় বিদারক দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া তাহারদের রক্ত-শূন্য অস্থি-সার দেহ দেখিয়া কি আমারদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভূমির উপরে মৃত-শরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত দেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা দেখিলে আমারদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না আমারদের নিঃশ্বাস আর বহন হইত? জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনীর সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইত না? (পৃ. ৫-৬)

দেখ! ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলি বলিতেছে, তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ কর। আমরা যৎকিঞ্চিৎ দিব বই নয়। আমরা যদি সর্ব্বস্ব জীবিকা প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে। আমারদের মধ্যে ধনেতে মানেতে সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্ম সমাজের দান নহে। অন্যেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যেরা নামের জন্য দেয়, অন্যেরা না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক, প্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য্য জানিয়া,

তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করিতেছি। আমারদের দানে যদি এক বেলার জন্য একজনেরও ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল।...ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাঁর বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি এক বৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে। যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তাহার এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পারিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই বৃষ্টি, সূর্য্য, যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্য কিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্নপান পাইতেছি, তাঁর কার্য্য কি সমুদয় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিব না? আমারদের প্রতি তাঁহার অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্প মাত্রও পরিশোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে। (পৃ. ৭-৮)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—১লা ভাদ্র, সংবৎ ১৯১৯ (১৮৬২)।

প্রকাশক যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন:

পূজ্যপাদ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমগিরি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে যে কয়েকটি বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই সকল বক্তৃতা সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে অনুমতি করেন; আমি তাঁহার অনুমতি

অনুসারে সেইগুলি প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, তাঁহার মহিমা ও করুণা এবং তাঁহার সহবাস লাভ জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিবার উপায় অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম বক্তৃতা ১৭৮০ শকের ৮ই পৌষ বুধবার প্রদত্ত হয়। এই বক্তৃতামালা ১৭৮২ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহা হইতে দুইটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

কি নিমিত্ত সংসারাসক্ত বিষয়-মদ-মত্ত ব্যক্তি বিষয় লাভ করিয়াও মনের প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না? কি জন্য এ প্রকার ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয় যে যে বস্তুর প্রতি আমাদের অধিক মমতা ও প্রীতি এবং যাহার বিনাশ বা বিচ্ছেদের কল্পনাতেও আমাদের ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই আমরা সর্ব্বাগ্রেই বঞ্চিত হই? কি জন্যই পার্থিব সুখ আমাদিগের বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয় এবং কি জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুখ-ভোগের স্পৃহা আমাদের মনে বলবতী রহিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে জগদীশ্বর দয়া করিয়া এরূপ বিধান করিয়াছেন যে কেবল তাহাতেই আমাদের সুখ। "রসোবৈ সঃ" তিনিই রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু। যতক্ষণ আমরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকি, ততক্ষণ আমরা যথার্থ তৃপ্তি ও যথার্থ শান্তি অনুভব করি, ততক্ষণ আমারদিগের আত্মপ্রসাদের আর পরিসীমা থাকে না, ততক্ষণ আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ ভোগ করি।

আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া ঈশ্বরকে জানিবার যে অধিকারী হইয়াছি, ইহা আমাদের সকল সৌভাগ্যের মধ্যে প্রধান সৌভাগ্য;

কিন্তু এই মহত্তম অধিকারের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আত্মাকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করা উচিত। অন্তরাত্মাকে পবিত্র না করিলে তাহাতে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না। যেমন ভদ্র সমাজের উপযুক্ত হইবার জন্য ভদ্র হইতে হয়, যেমন সাধু সঙ্গে সহবাসের জন্য সাধু হইতে হয়; সেই রূপ পবিত্র স্বরূপের সহবাসের জন্য পবিত্র হইতে হয়। কিন্তু যেমন লোক মধ্যে বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করিতে পারিলেও তাহাদিগের নিকট বিনয় রক্ষা করা হয়, পরমেশ্বরের নিকটে তদ্রূপ নহে। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের নিকট বিনয় রক্ষা করিতে গেলে মনো বাক্ কার্য্য সর্ব্ব প্রকারে পবিত্র রাখিতে হয়। আত্মাকে পবিত্র করিয়া পবিত্র স্বরূপের অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিলে আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয়। প্রীতি সঞ্চার হইলে প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে অসামান্য উৎসাহ জন্মে এবং তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে অনুরাগ হয়। তাঁহার সেই পূর্ণ মঙ্গল ভাবকে আদর্শ রাখিয়া অবশ্যই এই ভয়াবহ সংসারে থাকিয়াও নির্ভয় ও সুখী হইতে পারি।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ। ১৭৮২ শকের ১ জ্যৈষ্ঠ অবধি ১৭৮৯ শকের ৪ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত।

এই পুস্তকে আঠারটি উপদেশ আছে। এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:

আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে এবং ঈশ্বর প্রসাদে যতটুকু উন্নতি লাভ হয়, তাহাতেই আমারদের মঙ্গল। আমরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তো কেবল উন্নতিরই দিকে অগ্রসর হইব। একালও সেই অনন্তকালের অন্তর্ব্বর্ত্তী, এখান হইতেই আমারদের গ্রন্থিবদ্ধ সঙ্কুচিত হৃদয় যত প্রশস্ত হইবে, স্বার্থপরতা যত অবসন্ন হইবে, ততই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে। আমরা এখানে আমারদিগের আত্মাকে যত উন্নত

ও প্রশস্ত করি না কেন, তাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমে আরো উন্নত হইবে, আমারদের জ্ঞান আরো উজ্জ্বল হইবে, আমারদিগের ইচ্ছা আরো স্বাধীন ও বলবতী হইবে, কারণ তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, আমারদিগের আদর্শ। এ আদর্শ আমারদিগকে কে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কাহার উপদেশে আমারদের এই পরম লক্ষ্য স্থান অবধারণ করিয়াছি? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে। এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা যেন এ ধর্ম্মকে অবহেলা না করি। আমরা যেন সমুদায় ভারত ভূমিকে ব্রাহ্মবর্ত্ত নামের উপযোগী করিতে পারি। তৃতীয় উপদেশ। (৭ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।)

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। প্রথম প্রকরণ। শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

ঐ। দ্বিতীয় প্রকরণ। বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট। ১৭৯৭ শকের ৬ বৈশাখ অবধি ১৭৯৮ শকের ৪ ফাল্গুন পর্য্যন্ত। ১৮০৭ শক।

প্রথমোক্ত দুইটি প্রকরণ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলেন:

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নামে দেবেন্দ্র বাবুর যে সকল উপদেশ প্রসিদ্ধি আছে তাহা ১৭৮২ শকের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত পরে পরে প্রদত্ত হয়। এই ব্যাখ্যানের সহিত একটি ঐতিহাসিক বিবরণ সংলগ্ন আছে অতএব তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামমোহন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কেবল ভট্টাচার্য্যগণ উপবেশন করিয়া উপদেশ ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবেন। সেই রীতি দেবেন্দ্র বাবু যথাবৎ পালন করিতেন। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেরও ঐ নিয়ম ছিল। এজন্য কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপাচার্য্যের কার্য্য শিক্ষা করিতেন

এবং তাহা শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। এক্ষণে সে নিয়ম সম্পূর্ণ না হউক এক প্রকার রহিত হইল। পূর্ব্বে যেমন রামমোহন রায় তেমনি দেবেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বরাবর বক্তৃতা করিবার সময় বেদীর নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা প্রস্তাব করিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুকে বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন তাঁহারা উপাচার্য্য পদে বাচ্য হইতেন। আচার্য্যের পদ রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যু অবধি শূন্য ছিল। দেবেন্দ্র বাবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে বসিয়া প্রতি সমাজের দিবস বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তদবধি দুই জন উপাচার্য্য ও আচার্য্য এই তিন জন করিয়া বেদীতে বসিতে লাগিলেন।...

দেবেন্দ্র বাবু বেদীতে বসিয়া যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ষড়বিংশ ব্যাখ্যানে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হয়। পরে ঐ শকের ৬ আষাঢ় হইতে ১০ মাঘ পর্য্যন্ত একাদশ ব্যাখ্যানে তাহার দ্বিতীয় প্রকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থগ্রথিত কতকগুলি শ্লোকের উন্নত পবিত্র ভাব ও তাৎপর্য্য স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।...ইহার এক একটি ব্যাখ্যান পাঠ করিলে এক একটি ধর্ম্মতত্ত্ব জানা যায় এমন নহে; কিন্তু ইহার প্রত্যেক পত্রের এক একটি বাক্য তড়িতের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে নবজীবন প্রদান করে, চমকিত করিয়া তুলে। ("দেবেন্দ্র বাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি"—প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪। পৃ. ৪৬১-২)

'ব্যাখ্যান'গুলি হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল :

ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তুসকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরযুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতি দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমারদের নিকট প্রকাশিত হন। আমারদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমারদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমারদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়।... যখন আপনাকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়-দ্বার মুক্ত করি, সতৃষ্ণ হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি; তখন গিরিগুহা, উদ্যান কানন, নির্জ্জন সজন, সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব দেখি। (দ্বিতীয় ব্যাখ্যান—৩৫ শ্রাবণ, ১৭৮২ শক)

যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ স্বয়ং ব্রহ্ম, সেই ধর্ম্মের বলে আমরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ সৌভাগ্য

লাভ করা অসম্ভব, পরাধীনতাই দুঃখের মূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যে, পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাধীনতা এবং আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা যে কত মঙ্গল সাধন হইবে তাহা যাঁহারা ইঁহাকে একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূর ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও আধিপত্য। যদি তোমারদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যগ্রতা থাকে; তবে তাহা কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল এক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে পাপকে পরাভূত করা যায়। (ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান—২০ বৈশাখ, ১৭৮৩ শক)

মৃত্যুর নিকটে কাহারো বিচার নাই—ধনী-দরিদ্র, পাপী-পুণ্যবান্ সে সকলকেই আক্রমণ করে। এখন যিনি স্বর্ণ পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিতেছেন—যিনি বীণা বেণু মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার সুখের আর বিরাম হইবে না; মৃত্যু এক সময় তাঁহার সুখের শরীর হইতে সমস্ত আভরণ হরণ করিবে। তিনি শ্মশানে শব হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। তিনি যখন দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখেন, তখন আর মনে করিতে পারেন না যে, এই মুখ এক সময় জ্যোতিহীন প্রভাহীন হইয়া যাইবে। যদি কখন মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, মৃত্যুই কি আমার শেষ? না মৃত্যুর পরে আরও কিছু আছে? আপনার মোহ-মেঘাবচ্ছন্ন আত্মা হইতে ইহার কোন উত্তর পান না। দিন দিন অপেক্ষা করেন, মৃত্যুর পরদেশে কি আছে, তথাপি তাহার সংবাদ কেহ তাহাকে আনিয়া দেয় না। যদি কোন লোকের নিকট জানিতে যান, তবে

কেহ বলেন, "চন্দ্রলোকে গিয়া পুণ্যের সমুদায় ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিতে হইবে।" কেহ বলেন, "পুণ্যাত্মাকে তিনি অনন্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন—পাপীকে অনন্ত নরক যাতনায় দগ্ধ করিবেন।" ইহাতে তাঁহার ভয় যায় না। তিনি কোন্ কথা গ্রহণ করিবেন। কাহার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন? আমারদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায়, যদি তাঁহার সঙ্গে ভোগ না করি, তবে এই সংসার অন্ধকার কিছুতে বিমোচন করিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি—যখন তাঁহার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার হৃদয়কে আর আচ্ছন্ন করে না। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ, তাহা চিরকাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হইবেন। (দ্বিতীয় প্রকরণ। একাদশ ব্যাখ্যান। ১০ মাঘ ১৭৮৩ শক)

সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিতেছে। সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিবে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন চিরদিনই আছে, সমুদ্র কখনো নিস্তরঙ্গ হইবে না, তেমনি সুখ দুঃখ চিরদিনই থাকিবে। সুখ-দুঃখ কেবল মনুষ্যের ভাগ্যে নাই, পশু-পক্ষীর মধ্যেও আছে। যেখানে সুখ-দুঃখ দেখিতে পাই, সেইখানে বুঝিতে পারি মন আছে—সুখ-দুঃখের আয়তন মন। পশু-পক্ষীরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া তাহাদের মন আছে; ওষধি বনস্পতিরা সুখ-দুঃখ ভোগে করে না বলিয়া তাহাদের মন নাই। মন কেবল সুখের আয়তন নহে, কেবল দুঃখেরও আয়তন নহে; মন সুখ-দুঃখ উভয়েরই আয়তন। ওষধি বনস্পতির মন নাই প্রাণ আছে;

ইহা মূল দ্বারা ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, অবশেষে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইতেছে। তেমনি শরীর অন্নরস পরিপাক করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার জরাজীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইতেছে। ওষধি বনস্পতির সঙ্গে আমারদের শরীর সমান, ইহাদের সাধারণ লক্ষণ প্রাণ। মনুষ্যে, পশুতে, ওষধি বনস্পতিতে সামান্য-রূপে প্রাণ বর্ত্তমান আছে। ইহার উপর শ্রেণীতে মন। বৃক্ষলতা অতিক্রম করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মনের বিদ্যমানতা বিষয়ে পশুপক্ষী মনুষ্য সমান। যেমন বৃক্ষলতা হইতে পশুপক্ষী মন দ্বারা উন্নত, তেমনি পশুপক্ষী হইতে মনুষ্য আবার আত্মা দ্বারা উন্নত। সূর্য্য, চন্দ্রে প্রাণ নাই, বৃক্ষলতাতে মন নাই, পশুপক্ষীতে আত্মা নাই, ইহারদের হইতে মনুষ্যের বিশেষ এই যে, তাহার আত্মা আছে। মনুষ্য শরীর মন দ্বারা জড় ও উদ্ভিজ্জ ও পশুর সঙ্গে সমান; কেবল আত্মার দ্বারা এই সাধারণ শ্রেণী হইতে সে সমুন্নত হইয়াছে; এ আত্মা অন্নময় জড়েতে নাই, প্রাণময় বৃক্ষলতাতে নাই, মনোময় পশু পক্ষীতে নাই—এ আত্মা কেবল মনুষ্যেতেই আছে, ইহাতেই মনুষ্যের উচ্চতা। ইহাতেই মনুষ্যের মাহাত্ম্য। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা, অস্তিত্ব আছে বলিয়া নহে, প্রাণ আছে বলিয়াও নহে, মন আছে বলিয়াও নহে, আত্মা আছে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। (ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট। ৩য় উপদেশ। ২০ অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক)

ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী। ১৭৮৫ শক [১৮৬৪]

"সম্প্রতি ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী পুস্তক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রস্তুত হইয়া সমাজে সমাজে বিতাড়িত হইয়াছে।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৭৮৫ শক।

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৬ শক, ২৬শে বৈশাখ দিবসে ব্রাহ্ম-বন্ধু সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহাই এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আছে :

আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় এই কলিকাতায় স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপিত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য, বল পূর্ব্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল– আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সঙ্গত নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। সেই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই এই ব্রাহ্ম-বন্ধু সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন; সঙ্গত যেন একটী কল প্রস্তুত হইতেছে, কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। ইহা একটী অবয়বের ন্যায়—ইহাতে মস্তকও আছে, হস্তপদও আছে। যেমন বাষ্পীয় শকট নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও মহাভার বহন করে; সেইরূপ

সঙ্গতের সভ্য যদিও দশ বারো জন, তথাপি আশা হইতেছে যে ইহা প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে। (পৃ. ৩৪-৫)

হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম্ম—ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে স্থান পায় নাই; এই কারণেই মোসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত তরওয়ারের শাসনেও হিন্দুধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই; এজন্যই মায়াবী খ্রীষ্টানেরা শত বৎসর পর্য্যন্ত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই। এক সময় চৈতন্যের উদয়ে সহসা জাতিভেদ উন্মূলিত হইয়া স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের কত গুরুতর অমঙ্গল উৎপন্ন হইল; বৈষ্ণব নাম বঙ্গদেশে যেন অধর্ম্মের অন্বর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমারদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা উচিত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমা কর্ত্তৃক দেশের উন্নতি হইবে—এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমারদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূরপরাহত হইবে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় সহস্র বৎসরে যে লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা এক দিনে করিতে গিয়াছিল; এইজন্য সময়ের ব্যবধান আরো অধিক হইয়া গেল। ইংলণ্ডে ইহার বিপরীত—সেখানে যে সময় যাহা নইলে নয়, তাহার জন্য লোকেরা দণ্ডায়মান

হয় এবং বিনা বিপ্লবেও তাহা সিদ্ধ হয়। এই হেতু ফরাসিস্ দেশ হইতে ইংলণ্ড অধিক স্বাধীন। (পৃ. ৪২-৩)

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। ১৭৮৬ শক [১৮৬৫]।

অনুষ্ঠান পদ্ধতিঃ। জাতকর্ম্ম নামকরণোপনয়ন দীক্ষা বিবাহান্ত্যেষ্টি-শ্রাদ্ধেতি সপ্তবিধ সংস্কারাত্মিকা। "যেরূপে ব্রাহ্মদিগের গৃহধর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, ইহাতে তাহার আদর্শ বিবৃত আছে"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ। ১৭৮৭ শক। (১৮৬৫-৬)। বৈশাখ ১৭৮৮ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আছে :

> শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে কয়েকটি উপদেশ দ্বারা তথাকার ভ্রাতাদিগের অন্তঃকরণে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল সহজরূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত করা হইয়াছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি। বৈশাখ ১৮১৫ শক।

ইহাতে চৌদ্দটি উপদেশ আছে। প্রথমটি ১১ ফাল্গুন ১৮১২ এবং সর্ব্বশেষটি ৮ আষাঢ় ১৮১৩ শকে প্রদত্ত হয়। ভূমিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :

> এই গ্রন্থনিবদ্ধ উপদেশগুলি উপদেষ্টা কর্ত্তৃক বক্তৃতার ভাবেও কথিত হয় নাই কিম্বা রচনার ভাবেও লিখিত হয় নাই। পিতামহ যেমন পৌত্রাদির নিকট রামায়ণ মহাভারতের গল্প করেন, সেইভাবে পূজ্যপাদ কথাচ্ছলে উপদেশ বলিয়া গিয়াছেন, আর আমি সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি।

পুস্তকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জটিল বিষয়গুলি সহজ ভাষায় উপদেশচ্ছলে বলা হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এইরূপ :

এই পৃথিবী অতি পূর্ব্বে একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ছিল। জীব জন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন (crust) পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি—উত্তপ্ত দ্রব ধাতু; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্য্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে বারংবার উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি গোলমাল চলিতেছিল। একদিকে যেমন ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তেমনি আবার আগ্নেয়গিরি জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করত পৃথিবীর আচ্ছাদন ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভয়ানক ভূমিকম্প হইতে লাগিল; কতক স্থান বা উপরে উঠিয়া উচ্চ পর্ব্বত হইল; কতক স্থান বা নিম্নে চলিয়া গিয়া দূর প্রসারিত গভীর গহ্বর হইয়া জলের আধার মহাসমুদ্র হইল। পৃথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়া ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল। ক্রমে কীটাণু শঙ্খ প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহার পরে যখন স্থলভাগ অরণ্যময় হইয়া উঠিল, তখন আবার সেই অরণ্যের উপযুক্ত সুপ্রকাণ্ড হস্তী (mammoth) প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু তখনও অগ্ন্যুৎপাতের বিরাম নাই—ভূগর্ভস্থিত দ্রব ধাতু সমূহের আলোড়নে উচ্চ স্থান নিম্ন হইতে লাগিল, নিম্ন স্থান উচ্চ হইতে লাগিল; পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং সমুদ্রতলস্থ নিম্ন ভূমি পর্ব্বত হইতে লাগিল। সেই যুগপ্রবর্ত্তন কালের ঘোর মহাপ্রলয়কাণ্ডের নিদর্শন বহুশতাব্দী পরে আজও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। হিমালয় সমান অভ্রভেদী পর্ব্বতের উন্নততম চূড়ায় আজও আমরা সমুদ্রজাত

জলজন্তুর অস্থি-আবরণ বিস্তর দেখিতে পাই। এই সময়ে প্রচণ্ড বাত্যার প্রভাবে বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং ভবিষ্যতে পাথুরিয়া কয়লারূপে মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধন করিবার জন্য প্রোথিত রহিল। সমুদ্রস্থিত শঙ্খ প্রবাল স্থানে স্থানে মৃত হইয়া রাশীকৃত হইলে লাগিল ; আবার তাহাদের সন্তান সন্ততি ঐগুলির উপরেই প্রাণত্যাগ করিয়া প্রবালস্তূপ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবাল দ্বীপে পরিণত হইল। ক্রমে ওষধি বনস্পতির জন্ম। জীবজন্তুর আবির্ভাব নূতন শোভায় নূতন সৌন্দর্য্যে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। অগ্নিময় গোলা হইতে এই শোভন সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি। কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য এই মর্ত্ত্যলোককে শোভা সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল। (দ্বিতীয় উপদেশ—"পৃথিবী"। ১৮ ফাল্গুন ১৮১২ শক)

এই সৌর জগৎ সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যদি আর একটু নিকটে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী জ্বলিয়া যাইত ; যদি আরও দূরে যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িত। এই জন্য সূর্য্যের তেজ ঠিক উপযুক্তরূপে আসিতেছে, তাই প্রাণ বাঁচিতেছে।...বাতাসের আবশ্যক, চলাচল না হইলে বাতাস বহে না ; ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাতাস চলিতেছে। জল চাই, মেঘ না হইলে বৃষ্টি হইবে না, ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হইল এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা সরস হইল। ঈশ্বর এক সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে বাতাস বহিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, মৃত্তিকা কার্য্যের উপযুক্ত হইতেছে। আলো যদি না থাকিত, সমস্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এই চারি বস্তুই এক সূর্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সূর্য্য না থাকিলে

কিছুই হয় না। (চতুর্থ উপদেশ—"প্রাণময় কোষ"। ৯ চৈত্র ১৮১২ শক)

আর্য্যেরা বিষয় কর্ম্ম, রাজ ধর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান, তাহাতেও ইহারা কত উন্নতি করিলেন। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র—ইহার জন্য আর্য্যেরা জগদ্বিখ্যাত। ১, ২ প্রভৃতি ১০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা কতদূর বুদ্ধির কার্য্য। ইহা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথম প্রচার হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশি গণনা দেখ, ঐ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশি ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার হইয়াছে। এই স্থান হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিকাশ। আবার চিকিৎসা বিদ্যা—ইহাতেও তাঁহারা কত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা অস্ত্র চিকিৎসা, শারীর বিধান সকলই জানিতেন। এখানকার কবিতা রচনা—এ বিষয়ে সেই পশুপালেরা কত উন্নতি করিলেন। আর্য্যদিগের বর্ণাবলী বিবেচনা করিয়া দেখ, কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। স্বরবর্ণ পৃথক করিলেন, জিহ্বা হইতে যে শব্দ বাহির হইল, তাহাকে পৃথক্ করিয়া হল বর্ণ নাম দিলেন। আবার এই স্বর ও হল উভয়েরই মধ্যে কণ্ঠ্য আছে, তালব্য আছে, দন্ত্য আছে, ওষ্ঠ্য আছে। সংস্কৃত ভাষার যেমন মহত্ত্ব, তেমনি সৌন্দর্য্য। কিন্তু এই সব আপনাদেরই চেষ্টায় হইয়াছে, আপনাদের যত্নেই হইয়াছে, কাহাদেরও আশ্রয়ে হয় নাই। আর্য্যদের মধ্যে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল। আর একটী আর্য্যদের উন্নতির কথা বলিতেছি—তাহা সঙ্গীত বিদ্যা। সাতটা সুর তীব্র কোমলে বিভাগ করিয়া সঙ্গীতের কি মাধুর্য্যই আনয়ন করিয়াছেন। এই সমুদায়ই হইয়াছে স্বাধীনতার বলে। (নবম উপদেশ—"আর্য্যদিগের উন্নতি"। ২১ বৈশাখ ১৮১৩ শক)

পরলোক ও মুক্তি। ১ আগষ্ট ১৮৯৫।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত। ও পরিশিষ্ট। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৯৮। পৃ. ২০২ + ৭৫। দেবেন্দ্রনাথ ইহার গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশককে দিয়া যান। এই সম্পর্কে পুস্তকে তাঁহার যে পত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে আছে :

> ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমার জীবন কাহিনী উনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম ; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না, তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, ইহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবে। তোমার মঙ্গল হউক। ইতি ১১ই মাঘ ১৮১৬ শক।

রচানার নিদর্শন স্বরূপ এখানে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :

> আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকটে যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা, সকলি নূতন, সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতলায় বসিত এবং

তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ স্বর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখনো কখনো তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভালবাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। একজন একদিন আমাকে বারণ করিল,—"অমন করিবেন না, উহারা বড় দুষ্ট। যদি ঠোকর মারে তো একেবারে চোখে ঠোকর মারিবে।" একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবিরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। 'নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা'। এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে।

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধু মাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত নেবুফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল। (দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুজ্মী নামক পর্ব্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বত

শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান, কোন পর্ব্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত আপাদমস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত—একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্য জাতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষা ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায়, অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীতকালে বহু তুষার ভার বহন করে। অথচ ইহার

পত্র সকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণশীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎবর্ণ পরিত্যাগ করে না।...এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

পত্রাবলী। পৃ. ২২৭।

রাজনারায়ণ বসু, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সৌদামিনী দেবী, নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বিভিন্ন সময়ের লিখিত পত্রাবলী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথকে লেখা কেশবচন্দ্রের দশখানি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের একখানি (ইংরেজী) এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলারের একখানি (ইংরেজী) পত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। পত্রগুলির অধিকাংশই ১৭৭২ শক হইতে ১৮০৯ শকের মধ্যে লিখিত। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

আমরা পূর্ব্বপুরুষের নির্দ্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই গ্রহণ করি। পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবেক, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতেও আমরা সম্মত নহি। পূর্ব্বপুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি নির্দ্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। প্রচলিত প্রথাকেই পৌত্তলিক বলা যুক্তি হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে একপ্রকার শোকচিহ্ন অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে। প্রচলিত রীত্যনুসারে পিতার মৃত্যু

হইলে পাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিলে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, ইহা ত আমার মনে হয় না। (১৩ মাঘ ১৭৮৪ শক। পৃ. ৩৮-৯)

এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যে হেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।...যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত। তিনি বলেন যে, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক্ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

জাতিভেদ যে না থাকে তাহা কিছু আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে। আমাদিগের লক্ষ্য যে জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু জাতি সংস্কারের মধ্যে পৌত্তলিকতা থাকাতেই এত অনর্থ হইয়াছে ইতি। ১৫ মাঘ ১৭৭৫ শক।

ইহা ব্যতীত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) এবং 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) দেবেন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমি এই পুস্তকে আরও কয়েকখানি পত্র ব্যবহার করিয়াছি। এগুলি ইতিপূর্ব্বে আর কেহ ব্যবহার করেন নাই মনে হয়।